PART- 18

সাইয়েদ
আবুল আ'লা
মওদূদী
রহ.

www.banglabookpdf.blogspot.com

আল মুল্‌ক্‌

৬৭

নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতাংশ تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ এর আল মুল্‌ক্‌ শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরাটি কোন্‌ সময় নাযিল হয়েছিলো তা কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে জানা যায় না। তবে বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগী থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সূরাটি মক্কী জীবনের প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম।

বিষয়বস্তু

এ সূরাটিতে একদিকে ইসলামী শিক্ষার মূল বিষয়সমূহ তুলে ধরা হয়েছে। অন্যদিকে যেসব লোক বেপরোয়া ও অমনোযোগী ছিল তাদেরকে অত্যন্ত কার্যকরভাবে সজাগ করে দেয়া হয়েছে। মক্কী জীবনের প্রথম দিকে নাযিল হওয়া সূরাসমূহের বৈশিষ্ট হলো, তাতে ইসলামের গোটা শিক্ষা ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী করে পাঠানোর উদ্দেশ্য সবিস্তারে নয় বরং সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ফলে তা ক্রমান্বয়ে মানুষের চিন্তা–ভাবনায় বদ্ধমূল হয়েছে। সেই সাথে মানুষের বেপরোয়া মনোভাব ও অমনোযোগিতা দূর করা, তাকে ভেবে চিন্তে দেখতে বাধ্য করা এবং তার ঘুমন্ত বিবেককে জাগিয়ে তোলার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

প্রথম পাঁচটি আয়াতে মানুষের এ অনুভূতিকে জাগানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, যে বিশ্বলোকে সে বাস করছে তা এক চমৎকার সুশৃঙ্খল ও সুদৃঢ় সাম্রাজ্য। হাজারো তালাশ করেও সেখানে কোন রকম দোষ–ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা কিংবা বিশৃংখলার সন্ধান পাওয়া যাবে না। এক সময় এ সাম্রাজ্যের কোন অস্তিত্ব ছিল না। মহান আল্লাহই একে অস্তিত্ব দান করেছেন, এর পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও শাসনকার্যের সমস্ত ইখতিয়ার নিরংকুশভাবে তাঁরই হাতে। তিনি অসীম কুদরতের অধিকারী। এর সাথে মানুষকে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, এ পরম জ্ঞানগর্ভ ও যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থার মধ্যে তাকে উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করা হয়নি। বরং এখানে তাকে পরীক্ষা করার জন্য পাঠানো হয়েছে। তার শুধু সৎকর্ম দ্বারাই সে এ পরীক্ষায় সফলতা লাভ করতে সক্ষম।

আখেরাতে কুফরীর যে ভয়াবহ পরিণাম দেখা দেবে ৬ থেকে ১১নং আয়াতে তা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে মানুষকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মহান আল্লাহ তাঁর নবীদের পাঠিয়ে এ দুনিয়াতেই সে ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছেন। এখন তোমরা যদি এ পৃথিবীতে নবীদের কথা মেনে নিয়ে নিজেদের আচরণ ও চাল-চলন সংশোধন না করো তাহলে আখেরাতে তোমরা নিজেরাই একথা স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, তোমাদের যে শাস্তি দেয়া হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে তোমরা তার উপযোগী।

১২ থেকে ১৪নং আয়াতে এ পরম সত্যটি বুঝানো হয়েছে যে, স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে বেখবর থাকতে পারেন না। তিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য প্রত্যেকটি কাজ ও কথা এমন কি তোমাদের মনের কল্পনাসমূহ পর্যন্ত অবগত। তাই নৈতিকতার সঠিক ভিত্তি হলো, মন্দ কাজের জন্য দুনিয়াতে পাকড়াও করার মত কোন শক্তি থাক বা না থাক এবং ঐ কাজ দ্বারা দুনিয়াতে কোন ক্ষতি হোক বা না হোক, মানুষ সবসময় অদৃশ্য আল্লাহর সামনে জবাবদিহির ভয়ে সব রকম মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকবে। যারা এ কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করবে আখেরাতে তারাই বিরাট পুরস্কার ও ক্ষমালাভের যোগ্য বলে গণ্য হবে।

১৫ থেকে ২৩নং আয়াতে পরপর কিছু অবহেলিত সত্যের প্রতি ইংগিত দিয়ে সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার আহবান জানানো হয়েছে। এগুলোকে মানুষ দুনিয়ার নিত্য নৈমিত্তিক সাধারণ ব্যাপার মনে করে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে দেখে না। বলা হয়েছে, এ মাটির প্রতি লক্ষ্য করে দেখো। এর ওপর তোমরা নিশ্চিন্তে আরামে চলাফেরা করছো এবং তা থেকে নিজেদের প্রয়োজনীয় রিযিক সংগ্রহ করছো। আল্লাহ তা'আলাই এ যমীনকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন। তা না হলে যে কোন সময় এ যমীনের ওপর ভূমিকম্প সংঘটিত হয়ে তা তোমাদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে পারে। কিংবা এমন ঝড়-ঝঞ্ঝা আসতে পারে যা তোমাদের সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দেবে। মাথার ওপরে উড়ন্ত পাখীগুলোর প্রতি লক্ষ করো। আল্লাহই তো ওগুলোকে শূন্যে ধরে রাখেন। নিজেদের সমস্ত উপায়-উপকরণের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ করে দেখো। আল্লাহ যদি তোমাদের শাস্তি দিতে চান তাহলে এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারে? আর আল্লাহ যদি তোমাদের রিযিকের দরজা বন্ধ করে দেন, তাহলে এমন কে আছে, যে তা খুলে দিতে পারে? তোমাদেরকে প্রকৃত সত্য জানিয়ে দেয়ার জন্য এগুলো সবই প্রস্তুত আছে। কিন্তু এগুলোকে তোমরা পশু ও জীব-জন্তুর দৃষ্টিতে দেখে থাকো। পশুরা এসব দেখে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। মানুষ হিসেবে আল্লাহ তোমাদেরকে যে শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি এবং চিন্তা ও বোধশক্তি সম্পন্ন মস্তিষ্ক দিয়েছেন, তা তোমরা কাজে লাগাও না। আর এ কারণেই তোমরা সঠিক পথ দেখতে পাও না।

২৪ থেকে ২৭নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, অবশেষে একদিন তোমাদেরকে নিশ্চিতভাবে আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে। নবীর কাজ এ নয় যে, তিনি তোমাদেরকে সেদিনটির আগমনের সময় ও তারিখ বলে দেবেন। তার কাজ তো শুধু এতটুকু যে, সেদিনটি আসার আগেই তিনি তোমাদের সাবধান করে দেবেন। আজ তোমরা তার কথা মানছো না। বরং ঐ দিনটি তোমাদের সামনে হাজির করে দেখিয়ে দেয়ার দাবী করছো। কিন্তু যখন তা এসে যাবে এবং তোমরা তা চোখের সামনে হাজির দেখতে পাবে তখন তোমরা সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবে।

২৮ ও ২৯নং আয়াতে মক্কার কাফেরদের কিছু কথার জবাব দেয়া হয়েছে। এসব কথা তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সংগী–সাথীদের বিরুদ্ধে বলতো। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অভিশাপ দিতো এবং তাঁর ও ঈমানদারদের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার জন্য বদ দোয়া করতো। তাই বলা হয়েছে যে, তোমাদেরকে সৎপথের দিকে আহবানকারীরা ধ্বংস হয়ে যাক বা আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করুক তাতে তোমাদের ভাগ্যের পরিবর্তন কি করে হবে? তোমরা নিজের জন্য চিন্তা করো। আল্লাহর আযাব যদি তোমাদের ওপর এসে পড়ে তাহলে কে তোমাদেরকে রক্ষা করবে? যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে এবং যাঁরা তাঁর ওপরে তাওয়াক্‌কুল করেছে তোমরা মনে করেছো তারা গোমরাহ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এমন এক সময় আসবে যখন প্রকৃত গোমরাহ কারা তা প্রকাশ হয়ে পড়বে।

অবশেষে মানুষের সামনে একটি প্রশ্ন রাখা হয়েছে এবং সে সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করে দেখতে বলা হয়েছে ঃ মরুভূমি ও পবর্তময় আরবভূমিতে যেখানে তোমাদের জীবন পুরোটাই পানির ওপর নির্ভরশীল, পানির এসব ঝরণা ভূগর্ভ থেকে বেরিয়ে এসেছে। এসব জায়গায় পানির উৎসগুলো যদি ভূগর্ভের আরো নীচে নেমে উধাও হয়ে যায় তাহলে আর কোন্‌ শক্তি আছে, যে এই সঞ্জীবনী–ধারা তোমাদের কাছে ফিরিয়ে দিতে পারে?

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرُ ﴿١﴾ الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ﴿٢﴾ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ۭ مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ۭ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ﴿٣﴾

অতি মহান ও শ্রেষ্ঠ[১] *তিনি যাঁর হাতে রয়েছে সমগ্র বিশ্ব–জাহানের কর্তৃত্ব।*[২] *তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতা রাখেন।*[৩] *কাজের দিক দিয়ে তোমাদের মধ্যে কে উত্তম তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য তিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন।*[৪] *আর তিনি পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীলও।*[৫] *তিনিই স্তরে স্তরে সাজিয়ে সাতটি আসমান তৈরী করেছেন।*[৬] *তুমি রহমানের সৃষ্টিকর্মে কোন প্রকার অসংগতি দেখতে পাবে না।*[৭] *আবার চোখ ফিরিয়ে দেখ, কোন ত্রুটি*[৮] *দেখতে পাচ্ছ কি?*

১. تَبٰرَكَ – بركة শব্দ থেকে আধিক্য অর্থে গৃহীত। بركت শব্দটি শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব, বৃদ্ধি, আধিক্য, স্থায়িত্ব, দৃঢ়তা এবং অধিক পরিমাণে কল্যাণ ও নেকী অর্থ প্রকাশক। এর থেকে আধিক্য অর্থ প্রকাশক শব্দ গঠন করে تَبٰرَكَ করা হলে তার অর্থ হয় তিনি অত্যধিক সম্মানিত ও মহান, নিজের সত্তা, গুণাবলী ও কাজ–কর্মে অন্য সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তাঁর সত্তা থেকে অশেষ ও অগণিত কল্যাণের ধারা প্রবাহিত হচ্ছে এবং তাঁর পূর্ণতা চিরস্থায়ী। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল আ'রাফ, টীকা ৪৩; আল মু'মিনূন, টীকা ১৪; আল ফুরকান, টীকা ১ ও ১৯)।

২. اَلْمُلْكُ শব্দটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এখানে এর কোন সীমিত অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে না। সুতরাং নিশ্চিতভাবে এর অর্থ দাঁড়ায় গোটা বিশ্ব–জাহানের ওপর রাজকীয় ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর হাতে ক্ষমতা থাকার অর্থ এটা নয় যে, দৈহিক অংগ হিসেবে তাঁর কোন হাত আছে। বরং বাকরীতি অনুসারে শব্দটি অধিকার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষার মত আমাদের ভাষাতেও যখন বলি যে, সব ক্ষমতা

অমুকের হাতে তখন তার অর্থ হয় সে-ই সব ক্ষমতার মালিক, অন্য কারো সেখানে কোন কর্তৃত্ব নেই।

৩. অর্থাৎ তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তিনি কোন কাজ করতে চাইবেন অথচ করতে পারবেন না কোন কিছুই তাকে এরূপ অক্ষম করে দেয়ার মত নেই।

৪. অর্থাৎ তিনি পৃথিবীতে মানুষের জীবন ও মৃত্যুর এ ধারাবাহিকতা চালু করেছেন তাকে পরীক্ষা করার জন্য, কোন্ মানুষটির কাজ বেশী ভাল তা দেখার জন্য। এ সংক্ষিপ্ত বাক্যটিতে বেশ কিছু সত্যের প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছে। প্রথম হলো, মৃত্যু এবং জীবন তাঁরই দেয়া। আর কেউ জীবনও দান করতে পারে না, মৃত্যুও না। দ্বিতীয় হলো, মানুষ একটি সৃষ্টি, তাকে ভাল এবং মন্দ উভয় প্রকার কাজ করার শক্তি দেয়া হয়েছে। তার জীবন বা মৃত্যু কোনটিই উদ্দেশ্যহীন নয়, স্রষ্টা তাকে এখানে সৃষ্টি করেছেন পরীক্ষার জন্য। জীবন তার জন্য পরীক্ষার সময় বা অবকাশ মাত্র। মৃত্যুর অর্থ হলো, তার পরীক্ষার সময় ফুরিয়ে গেছে। তৃতীয় হলো, এ পরীক্ষার জন্য স্রষ্টা সবাইকে কাজের সুযোগ দিয়েছেন। সে ভাল মানুষ না খারাপ মানুষ, এ পৃথিবীতে কাজের মাধ্যমে সে যাতে তার প্রকাশ ঘটাতে পারে সে জন্য সৃষ্টিকর্তা প্রত্যেককে কাজের সুযোগ দিয়েছেন। চতুর্থ হলো, কার কাজ ভাল এবং কার কাজ খারাপ প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টিকর্তাই তার ফায়সালা করবেন। কাজের ভাল-মন্দ বিচার করার মানদণ্ড নির্ধারণ করা পরীক্ষার্থীর কাজ নয়, বরং পরীক্ষা গ্রহণকারীর কাজ। তাই যারাই পরীক্ষায় সফল হতে চাইবে, তাদেরকে জানতে হবে পরীক্ষা গ্রহণকারীর দৃষ্টিতে ভাল কাজ কি? পঞ্চম বিষয়টি পরীক্ষা কথাটির মধ্যেই নিহিত। তা হলো, যার কাজ যেমন হবে তাকে সে অনুপাতেই প্রতিফল দেয়া হবে। কারণ ফলাফলই যদি না থাকে তাহলে পরীক্ষা নেয়ার আদৌ কোন অর্থ হয় না।

৫. এর দু'টি অর্থ এবং দু'টি অর্থই এখানে প্রযোজ্য। একটি হলো, তিনি মহা পরাক্রমশালী এবং সবার ওপর পরিপূর্ণরূপে বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও নিজের সৃষ্টির প্রতি তিনি দয়াবান ও ক্ষমাশীল, তাদের প্রতি জালেম ও কঠোর নন। দ্বিতীয়টি হলো, দুষ্কর্মকারীদের শাস্তি দেয়ার পুরো ক্ষমতা তাঁর আছে। এতো শক্তি কারো নেই যে তাঁর শাস্তি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। কিন্তু যারা লজ্জিত হয়ে দুষ্কর্ম পরিত্যাগ এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে তাদের সাথে তিনি ক্ষমাশীলতার আচরণ করে থাকেন।

৬. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারা, টীকা ৩৪; আর রা'দ, টিকা ২; আল হিজ্‌র টীকা ৮; আল হাজ্জ, টীকা ১১৩; আল মু'মিনূন, টীকা ১৫; আস সাফফাত, টীকা ৫ এবং আল মুমিন, টীকা ৯০।

৭. মূল আয়াতে تَفَاوُت শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ হলো সামঞ্জস্যহীনতা। এক বস্তুর সাথে আরেকটি বস্তুর মিল না হওয়া, অমিল হওয়া বা খাপ না খাওয়া। সুতরাং এ কথাটির অর্থ হলো, গোটা বিশ্ব-জাহানের কোথাও তোমরা বিশৃংখলা, অবিন্যস্ততা ও অসংগতি দেখতে পাবে না। আল্লাহর সৃষ্ট এ পৃথিবীতে কোন জিনিসই সামঞ্জস্যহীন ও খাপছাড়া নয়। এর প্রত্যেকটি অংশ পরস্পর বাঁধা এবং সেগুলোর মধ্যে পুরো মাত্রায় সামঞ্জস্য বিদ্যমান।

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿٤﴾ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ﴿٥﴾ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٦﴾

তুমি বারবার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখ, তোমার দৃষ্টি ক্লান্ত ও ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে।

আমি তোমাদের কাছের আসমানকে[৯] সুবিশাল প্রদীপমালায় সজ্জিত করেছি।[১০] আর সেগুলোকে শয়তানদের মেরে তাড়ানোর উপকরণ বানিয়ে দিয়েছি।[১১] এসব শয়তানের জন্য আমি প্রস্তুত করে রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি।

যেসব লোক তাদের রবকে অস্বীকার করেছে[১২] তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। সেটি অত্যন্ত খারাব জায়গা।

৮. মূল ব্যবহৃত শব্দটি হলো فطور -এর অর্থ ফাটল, ছিদ্র, চিড়, ছেঁড়া, ভাঙা চোরা। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব–জাহানের বাঁধন এতো মজবুত এবং পৃথিবীর একটি অণু থেকে বিশালকায় নীহারিকা মণ্ডলী পর্যন্ত প্রতিটি বস্তু এমন সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ যে, বিশ্ব–জাহানের কোথাও শৃংখলার ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন হয়নি। তোমরা যতই অনুসন্ধান চালাও না কেন এর কোথাও কোন বিশৃংখলা দেখা যাবে না। (বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ক্বাফ, টীকা ৮)।

৯. কাছের আসমান অর্থ সে আসমান যার তারকারাজি এবং গ্রহসমূহকে আমরা খালি চোখে দেখতে পাই। এর চেয়েও দূরে অবস্থিত যেসব বস্তুকে দেখতে যন্ত্রের সাহায্য নিতে হয় তা হলো দূরের আসমান। আর যন্ত্রপাতির সাহায্যেও যা দেখা যায় না তা হলো অধিক দূরবর্তী আসমান।

১০. মূলত مَصَابِيحَ শব্দটি এখানে অনির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং অনির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে এসব প্রদীপের সুবিশাল হওয়ার ধারণা সৃষ্টি হয়। কথাটির অর্থ হলো, আমি এ বিশ্ব–জাহানকে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও জনমানবহীন করে সৃষ্টি করিনি। বরং তারকারাজি দ্বারা খুব সুন্দর করে সাজিয়েছি। রাতের অন্ধকারে মানুষ যার জাঁকজমক ও দীপ্তিময়তা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায়।

১১. এর অর্থ এটা নয় যে, এসব তারকাকেই শয়তানদের দিকে ছুঁড়ে মারা হয়। আবার এ অর্থও নয় যে, শুধু শয়তানদেরকে মারার জন্যই উল্কার পতন ঘটে। বরং এর অর্থ হলো তারকারাজি থেকে যে অসংখ্য উল্কাপিণ্ড নির্গত হয়ে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বিশ্ব–জাহানের সর্বত্র ঘুরে বেড়ায় এবং এরা অগণিত সংখ্যায় প্রতি মুহূর্তে ভূপৃষ্ঠের দিকে ছুটে আসে,

إِذَآ أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ۝ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۖ كُلَّمَآ أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ۝ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَٰلٍ كَبِيرٍ ۝ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيٓ أَصْحَٰبِ السَّعِيرِ ۝

তাদেরকে যখন সেখানে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা তার ভয়ানক গর্জনের শব্দ শুনতে পাবে[১৩] এবং তা টগবগ করে ফুটতে থাকবে। অত্যধিক রোষে তা ফেটে পড়ার উপক্রম হবে। যখনই তার মধ্যে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে তখনই তার ব্যবস্থাপকরা জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের কাছে কি কোন সাবধানকারী আসেনি?[১৪] তারা জবাব দেবে, হাঁ আমাদের কাছে সাবধানকারী এসেছিলো। কিন্তু আমরা তাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেছিলাম এবং বলেছিলাম আল্লাহ কিছুই নাযিল করেননি। তোমরাই বরং বিরাট ভুলের মধ্যে পড়ে আছো।[১৫] তারা আরো বলবে ঃ আহা! আমরা যদি শুনতাম এবং বিবেক–বুদ্ধি দিয়ে বুঝতাম,[১৬] তাহলে আজ এ জ্বলন্ত আগুনে সাজাপ্রাপ্তদের মধ্যে গণ্য হতাম না।

সেগুলো পৃথিবীর শয়তানদের উর্ধ জগতে ওঠার ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে কাজ করে। তারা ওপরে ওঠার চেষ্টা করলেও এ উল্কা পিণ্ডগুলো তাদেরকে মেরে তাড়িয়ে দেয়। এ বিষয়টি বলার প্রয়োজন এ জন্য যে, গণকদের সম্পর্কে আরবের লোকেরা এ ধারণা পোষণ করতো যে, শয়তানরা তাদের অনুগত বা শয়তানদের সাথে তাদের যোগাযোগ আছে। এসব শয়তানের মাধ্যমে তারা গায়েবের খবর পেয়ে থাকে এবং সঠিকভাবে মানুষের ভাগ্য গণনা করতে পারে। গণকরা নিজেরাও এ দাবী করতো। তাই কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে, শয়তানদের উর্ধ জগতে ওঠা এবং সেখান থেকে গায়েবের খবর অবহিত হওয়ার আদৌ কোন সম্ভাবনা নেই। অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন ঃ তাফহীমুল কুরআন, আল হিজর, টীকা ৯ থেকে ১২; আস সাফ্‌ফাত, টীকা ৬–৭।

এখন একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, এ উল্কাগুলো আসলে কি? এ বিষয়ে মানুষের জ্ঞান চূড়ান্ত অনুসন্ধান ও গবেষণালব্ধ কোন সিদ্ধান্ত দিতে এখনো অক্ষম। তা সত্ত্বেও আধুনিককালে যেসব তত্ত্ব ও বাস্তব অবস্থা মানুষের জ্ঞানের আওতায় এসেছে এবং ভূপৃষ্ঠে পতিত উল্কাপিণ্ডসমূহের পর্যবেক্ষণ থেকে যে জ্ঞান অর্জিত হয়েছে তার ভিত্তিতে বিজ্ঞানীদের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় তত্ত্বটি হলো ঃ এসব উল্কাপিণ্ড কোন গ্রহে বিস্ফোরণের কারণে উৎক্ষিপ্ত হয়ে মহাশূন্যে ছুটে বেড়াতে থাকে এবং কোন এক পর্যায়ে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আওতায় এসে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে। (দেখুন ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, ১৯৬৭ইং সংস্করণ, ১৫ খণ্ড, শব্দ—Meteorites)

১২. অর্থাৎ মানুষ হোক কিংবা শয়তান যারাই তাদের রবের সাথে কুফরী করেছে, এটাই হয়েছে তাদের পরিণাম। (রবের সাথে কুফরী করা বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারা, টীকা ১৬১; আন নিসা, টীকা ১৭৮; আল কাহাফ, টীকা ৩৯; আল মু'মিন, টীকা ৩)।

১৩. মূল ইবারতে شَهِيق শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যা গাধার ডাকের মত আওয়াজ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। এ বাক্যের অর্থ এও হতে পারে যে, এটা খোদ জাহান্নামের শব্দ। আবার এও হতে পারে যে, জাহান্নাম থেকে এ শব্দ আসতে থাকবে, ইতিমধ্যেই যেসব লোককে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছে তারা জোরে জোরে চিৎকার করতে থাকবে। সূরা হূদের ১০৬ আয়াত থেকে দ্বিতীয় অর্থটির সমর্থন পাওয়া যায়। উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, এ দোযখীরা দোযখের মধ্যে হাঁপাতে, গোঙ্গাতে এবং হাঁসফাস করতে থাকবে। আর সূরা ফুরকানের ১২ আয়াত থেকে প্রথমোক্ত অর্থটির সমর্থন পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে, দোযখের দিকে যাওয়ার পথে এসব লোক দূরে থেকেই তার ক্রোধ ও প্রচণ্ড উত্তেজনার শব্দ শুনতে পাবে। এসবের প্রেক্ষিতে সঠিক অর্থ দাঁড়ায় এই যে, এটি খোদ জাহান্নামের ক্রোধের শব্দ ও জাহান্নামবাসীদের চিৎকার–ধ্বনিও।

১৪. এ প্রশ্নের ধরন আসলে প্রশ্নের মত হবে না এবং তাদের কাছে কোন সতর্ককারী এসেছিল কিনা জাহান্নামের কর্মচারীরা তাদের কাছে তা জানতেও চাইবে না। বরং এর উদ্দেশ্য হবে তাদের কাছ থেকে এ বিষয়ের স্বীকারোক্তি আদায় করা যে, জাহান্নামে নিক্ষেপ করে তাদের প্রতি কোন বেইনসাফী করা হচ্ছে না। তাই তারা তাদের মুখ থেকেই এ মর্মে স্বীকৃতি আদায় করতে চেষ্টা করবেন যে, মহান আল্লাহ তাদেরকে বেখবর রাখেননি। তিনি তাদের কাছে নবী পাঠিয়েছিলেন, সত্য কি ও সঠিক পথ কোন্‌টি তা তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছিলেন এবং এ সত্য ও সঠিক পথের বিপরীত পথে চলার পরিণাম স্বরূপ যে তাদের এ জাহান্নামের জ্বালানি হতে হবে সে সম্পর্কে তাদেরকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। আজ সে জাহান্নামেই তাদেরকে নিক্ষেপ করা হয়েছে। কিন্তু তারা নবীদের কথা মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। সুতরাং তাদেরকে এখন যে শাস্তি দেয়া হচ্ছে তারা আসলে তার উপযুক্ত।

কুরআন মজীদে এ বিষয়টি বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মহান আল্লাহ একটি পরীক্ষার জন্য মানুষকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। পরীক্ষাটি নেয়ার পদ্ধতি এমন নয় যে, মানুষকে সে সম্পর্কে অজ্ঞ ও অনবহিত রেখে সঠিক পথে সে চলে কিনা তা দেখা হচ্ছে। বরং তাকে সঠিক পথ চিনিয়ে দেয়ার জন্য যে সম্ভাব্য সর্বাধিক যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা ছিল মহান আল্লাহ তা পুরোপুরিভাবে সম্পন্ন করেছেন। সে ব্যবস্থা অনুযায়ী নবী–রসূল পাঠানো হয়েছে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাবসমূহ নাযিল করা হয়েছে। মানুষ আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামকে এবং তাঁরা যেসব কিতাব এনেছেন সেগুলোকে মেনে নিয়ে সঠিক পথে চলবে, না তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজের প্রবৃত্তি ও মনগড়া ধ্যান–ধারণার পেছনে ছুটবে, এখন তাদের সমস্ত পরীক্ষা এ একটিমাত্র বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। নবুওয়াত মহান আল্লাহর একটি প্রমাণ। এভাবে তিনি মানুষের সামনে তাঁর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এটা মানা বা না মানার ওপরে মানুষের ভবিষ্যত নির্ভর করছে। নবী–রসূলদের আগমনের পর কোন ব্যক্তি প্রকৃত অবস্থা না জানার ওজর পেশ করতে পারে

فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ ۚ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١١﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١٢﴾ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ ۖ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٣﴾ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٤﴾

এভাবে তারা নিজেদের অপরাধ[১৭] স্বীকার করবে। এ দোযখবাসীদের ওপর আল্লাহর লানত।

যারা না দেখেও তাদের রবকে ভয় করে,[১৮] নিশ্চয়ই তারা লাভ করবে ক্ষমা এবং বিরাট পুরস্কার।[১৯] তোমরা নীচু স্বরে চুপে চুপে কথা বলো কিংবা উচ্চস্বরে কথা বলো (আল্লাহর কাছে দু'টোই সমান) তিনি তো মনের অবস্থা পর্যন্ত জানেন।[২০] যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই কি জানবেন না?[২১] অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী[২২] ও সব বিষয় ভালভাবে অবগত।

না। তাকে না জানিয়ে অলক্ষেই এতো বড় পরীক্ষা নেয়ার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং এখন বিনা অপরাধেই শাস্তি দেয়া হচ্ছে, এ ওজর তার ধোপে টিকবে না। এ বিষয়টি এতো অধিকবার বিভিন্নভাবে কুরআন মজীদে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তার সংখ্যা নির্ণয় করাও কঠিন। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নবর্ণিত স্থানগুলোর উল্লেখ করা যায় ঃ তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারা, আয়াত ২১৩, টীকা ২৩; আন নিসা, আয়াত ৪১–৪২, টীকা ৬৪, আয়াত ১৬৫, টীকা ২০৮; আল আনআম, আয়াত ১৩০–১৩১, টীকা ৯৮ থেকে ১০০; বনী ইসরাঈল, আয়াত ১৫, টীকা ১৭, ত্বাহা, আয়াত ১৩৪, আল কাসাস, আয়াত ৪৭, টীকা ৬৬, আয়াত ৫৯, টীকা ৮৩, আয়াত ৬৫; ফাতের, আয়াত ৩৭; আল মু'মিন, আয়াত ৫০, টীকা ৬৬।

১৫. অর্থাৎ তোমরা নিজেরাও বিভ্রান্ত আবার যারা তোমাদের ওপর ঈমান এনেছে তারাও চরম বিভ্রান্তিতে ডুবে আছে।

১৬. অর্থাৎ আমরা যদি সত্যানুসন্ধিৎসু হয়ে নবীদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতাম অথবা নবীগণ আমাদের সামনে যা পেশ করেছেন তা আসলে কি বুদ্ধি–বিবেক খাটিয়ে তা বুঝার চেষ্টা করতাম। এখানে শোনার কাজকে বুঝার কাজের আগে উল্লেখ করা হয়েছে। তার কারণ হলো, প্রথমে নবীর শিক্ষা আগ্রহ ও মনযোগ সহকারে শোনা (কিংবা তা যদি লিখিত আকারে থাকে তাহলে সত্যানুসন্ধিৎসু হয়ে তা পড়ে দেখা) হিদায়াত লাভ করার পূর্ব শর্ত। চিন্তা–ভাবনা করে তাৎপর্য উপলব্ধি করার পর্যায় আসে এর পরে। নবীর দিকনির্দেশনা ছাড়া নিজের বিবেক–বুদ্ধি খাটিয়ে সরাসরি সঠিক পথ লাভ করা যায় না।

১৭. অপরাধ কথাটি এক বচনে ব্যবহৃত হয়েছে। তার মানে যে কারণে তারা জাহান্নামের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছে তা হলো রসূলগণকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করা এবং তাঁদেরকে অনুসরণ করতে অস্বীকার করা। অন্যসব অপরাধ এরি ডাল–পালা মাত্র।

১৮. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় এটিই হলো নৈতিকতার মূল। কেউ যদি খারাপ কাজ থেকে শুধু এ জন্য বিরত থাকে যে, তার নিজের বিবেক-বুদ্ধির বিচারে কাজটি খারাপ কিংবা সব মানুষ সেটিকে খারাপ মনে করে কিংবা তা করলে পার্থিব জীবনে কোন ক্ষতি হওয়ার আশংকা আছে কিংবা এ জন্য কোন পার্থিব শক্তির তাকে পাকড়াও করার ভয় আছে তা হলে সেটি হবে নৈতিকতার একটি অস্থায়ী ভিত্তি। মানুষের ব্যক্তিগত বিচার বিবেচনা ভুলও হতে পারে। বিশেষ কোন মানসিক প্রবণতার কারণে সে একটি ভাল জিনিসকে মন্দ এবং একটি মন্দ জিনিসকে ভাল মনে করতে পারে। ভাল ও মন্দ যাচাই করার পার্থিব মানদণ্ড প্রথমত এক রকম নয়। এ ছাড়াও তা সময়ের ব্যবধানে পরিবর্তিত হয়। দুনিয়ার নৈতিক দর্শনে কোন বিশ্বজনীন ও স্থায়ী মানদণ্ড বর্তমানেও নেই অতীতেও ছিল না। পার্থিব ক্ষতির আশংকাও নৈতিকতার কোন স্বতন্ত্র মানদণ্ড নয়। দুনিয়ার জীবনে নিজের কোন ক্ষতি হতে পারে শুধু এ ভয়ে যে ব্যক্তি খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকে, ক্ষতি হওয়ার আশংকা নেই, এমন অবস্থায় সে ঐ কাজ থেকে বিরত থাকতে সক্ষম হবে না। একইভাবে কোন পার্থিব শক্তির কাছে জবাবদিহির আশংকাও এমন কিছু নয় যা একজন মানুষকে ভদ্র ও সৎ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। সবাই জানে, পার্থিব কোন শক্তিই দেখা ও না দেখা বিষয়সমূহ সম্পর্কে জ্ঞানের অধিকারী নয়। তার দৃষ্টিতে বাইরে অসংখ্য অপরাধ সংঘটিত হতে পারে। যে কোন পার্থিব শক্তির পাকড়াও থেকে বাঁচার জন্য অসংখ্য কৌশল ও ফন্দি-ফিকির অবলম্বন সম্ভব। এ ছাড়াও পার্থিব শক্তির রচিত আইন ব্যবস্থা সব রকমের অপরাধকে তার আওতাধীন করতে পারে না। বেশীর ভাগ অপরাধই এমন পর্যায়ের, পার্থিব আইন-কানুন যার ওপর আদৌ কোন হস্তক্ষেপ করে না। অথচ পার্থিব আইন ব্যবস্থা যেসব অপরাধের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে সেগুলোর চেয়ে তা জঘন্য। তাই ইসলামী জীবন বিধান নৈতিকতার প্রাসাদ এমন একটি বুনিয়াদের ওপর নির্মাণ করেছে যার ভিত্তিতে অদৃশ্য আল্লাহর ভয়ে সব খারাপ কাজ বর্জন করতে হয়। যে আল্লাহ সর্বাবস্থায় মানুষকে দেখছেন, যার হস্তক্ষেপ ও পাকড়াও থেকে নিজেকে রক্ষা করে মানুষ কোথাও যেতে সক্ষম নয়। যিনি মানুষকে ভাল ও মন্দ যাচাইয়ের জন্য একটি সার্বিক, বিশ্বজনীন এবং পূর্ণাঙ্গ মানদণ্ড দিয়েছেন, শুধু তাঁর ভয়ে মন্দ ও অকল্যাণকে বর্জন করা এবং ভাল ও কল্যাণকে গ্রহণ করা এমন একটি কল্যাণকর নীতি যা ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত মূল্যবান। এ কারণটি ছাড়া যদি অন্য কোন কারণে কোন মানুষ অন্যায় না করে কিংবা বাহ্যিকভাবে যেসব কাজ নেকীর কাজ বলে গণ্য হয় তা করে তাহলে তার এ নৈতিকতা আখেরাতে কোন মূল্য ও মর্যাদালাভের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে না। কারণ তা হবে বালির স্তূপের ওপর নির্মিত প্রাসাদের মতো।

১৯. অর্থাৎ না দেখে আল্লাহকে ভয় করার দু'টি অনিবার্য ফল আছে। এক, মানবিক দুর্বলতার কারণে মানুষের যে অপরাধ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি হয় তা মাফ করে দেয়া হবে। তবে তা এ শর্তে যে, তার গভীরে ও উৎসমূলে আল্লাহভীতির অনুপস্থিতি যেন কার্যকর না থাকে। দুই, এ আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে মানুষ যেসব নেক আমল করবে তার জন্য সে বিরাট পুরস্কার পাবে।

২০. একথাটি কাফের ও মু'মিন নির্বিশেষে গোটা মানব জাতিকে লক্ষ করে বলা হয়েছে। এতে মু'মিনের জন্য শিক্ষা হলো, দুনিয়ায় জীবন যাপনকালে তাকে তার মন-মগজে এ অনুভূতি কার্যকর রাখতে হবে যে, তার গোপন ও প্রকাশ্য সব কথা ও কাজই

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ؕ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ﴿۱۵﴾ ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَآءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِىَ تَمُوْرُ ﴿۱۶﴾ اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَآءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ؕ فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ ﴿۱۷﴾

২ রুকূ'

তিনিই তো সেই মহান সত্তা যিনি ভূপৃষ্ঠকে তোমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন। তোমরা এর বুকের ওপর চলাফেরা করো এবং আল্লাহর দেয়া রিযিক খাও।[২৩] আবার জীবিত হয়ে তোমাদেরকে তার কাছেই ফিরে যেতে হবে।[২৪] যিনি আসমানে আছেন[২৫] তিনি তোমাদের মাটির মধ্যে ধসিয়ে দেবেন এবং অকস্মাৎ ভূপৃষ্ঠ জোরে ঝাঁকুনি খেতে থাকবে, এ ব্যাপারে কি তোমরা নির্ভয় হয়ে গিয়েছো? যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের ওপর পাথর বর্ষণকারী হাওয়া পাঠাবেন[২৬] —এ ব্যাপারেও কি তোমরা নির্ভয় হয়ে গিয়েছো? তখন তোমরা জানতে পারবে আমার সাবধানবাণী কেমন?[২৭]

শুধু নয় তার নিয়ত ও ধ্যান–ধারণা পর্যন্ত কোন কিছুই আল্লাহর অজানা নয়। আর কাফেরের জন্য এতে সাবধানবাণী হলো এই যে, আল্লাহকে ভয় না করে সে নিজ অবস্থানে থেকে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। কিন্তু তার কোন একটি ব্যাপারও আল্লাহর কর্তৃত্ব ও হস্তক্ষেপের আওতা বহির্ভূত নয়।

২১. এর আরেকটি অনুবাদ হতে পারে—তিনি কি তাঁর সৃষ্টিকেই জানবেন না? মূল ইবারতে مَنْ خَلَقَ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে "যিনি সৃষ্টি করেছেন"ও হতে পারে। আবার "যাকে তিনি সৃষ্টি করেছেন"ও হতে পারে। উভয় অবস্থায় মূল অর্থ একই থাকে। এটি ওপরের আয়াতাংশে উল্লেখিত বক্তব্যের প্রমাণ। অর্থাৎ স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে বেখবর থাকবেন তা কি করে সম্ভব? খোদ সৃষ্টি নিজের সম্পর্কে বেখবর বা অজ্ঞ থাকতে পারে। কিন্তু স্রষ্টা তার সম্পর্কে বেখবর থাকতে পারেন না। তোমাদের প্রতিটি শিরা–উপশিরা তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের হৃদপিণ্ড ও মস্তিষ্কের প্রতিটি স্নায়ুতন্ত্রীও তাঁর সৃষ্টি। তোমাদের প্রতিটি নিশ্বাস–প্রশ্বাস তিনি চালু রেখেছেন বলেই তা চালু আছে। তোমাদের প্রতিটি অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ তাঁর ব্যবস্থাপনার অধীনে কাজ করছে। তাই তোমাদের কোন বিষয় তাঁর অগোচরে কি করে থাকতে পারে?

২২. আয়াতে لطيف শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর একটি অর্থ হলো সূক্ষ্ম ও অনুভবযোগ্য নয় এমন পন্থায় কর্ম সম্পাদনকারী এবং আরেকটি অর্থ হলো গোপন তত্ত্বসমূহ সম্পর্কে জ্ঞানের অধিকারী।

২৩. অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠ নিজে থেকেই তোমাদের অনুগত হয়ে যায়নি। আর যে খাবার তোমরা লাভ করছো তাও আপনা থেকেই এখানে সৃষ্টি হয়নি। বরং আল্লাহ তাঁর হিকমত ও কুদরত দ্বারা এ পৃথিবীকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, এখানে তোমাদের জীবন ধারণ সম্ভব হচ্ছে এবং এ বিশাল গ্রহটি এমন শান্তিময় হয়ে উঠেছে যে, তোমরা নিশ্চিন্তে এখানে চলাফেরা করছো। তোমাদের জন্য এটি এমন একটি নিয়ামতের ভাণ্ডার হয়ে উঠেছে যে, তোমাদের জীবন যাপনের জন্য এখানে অসংখ্য উপকরণ বর্তমান আছে। যদি তোমরা গাফিল না হয়ে থাকো এবং কিছু বিবেক–বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে দেখো তাহলে জানতে পারবে, ভূ পৃষ্ঠকে তোমাদের জীবন ধারণের উপযোগী বানাতে এবং সেখানে রিযিকের অফুরন্ত ভাণ্ডার সৃষ্টি করতে কি পরিমাণ বুদ্ধি ও কৌশল কাজে লাগানো হয়েছে। (দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আন নামল, টীকা ৭৩, ৭৪ ও ৮১; ইয়াসীন, টীকা ২৯, ৩২; আল মু'মিন, টীকা ৯০, ৯১; আয্ যুখরুফ, টীকা ৭; আল জাসিয়া, টীকা ৭; ক্বাফ, টীকা ১৮)

২৪. অর্থাৎ এ পৃথিবীর বুকে বিচরণ করো এবং আল্লাহর দেয়া রিযিক খাও। কিন্তু একথা ভুলে যেও না যে, একদিন তোমাদের আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে।

২৫. এর দ্বারা একথা বুঝায় না যে, আল্লাহ আসমানে থাকেন। বরং কথাটি এভাবে বলার কারণ হলো, মানুষ যখনই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে চায় তখনই সে আসমানের দিকে তাকায়, দোয়া করার সময় আসমানের দিকে হাত উঠায়, কোন বিপদের সময় সব রকম সাহায্য–সহযোগিতা ও অবলম্বন থেকে নিরাশ হয়ে গেলে আসমানের দিকে মুখ তুলে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে। আকস্মিকভাবে কোন বিপদ আপতিত হলে বলে, এটি ওপর থেকে নাযিল হয়েছে। অস্বাভাবিকভাবে পাওয়া কোন জিনিস সম্পর্কে বলে এটি উর্ধ জগত থেকে এসেছে। আল্লাহর প্রেরিত কিতাবসমূহকে আসমানী কিতাব বলা হয়। আবু দাউদে হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি একটি কাল দাসীকে সাথে করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললোঃ একজন ঈমানদার দাসকে মুক্ত করা আমার জন্য ওয়াজিব হয়ে গিয়েছে। আমি কি এই দাসীটিকে মুক্ত করতে পারি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাসীটিকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আল্লাহ কোথায়? সে আংগুল দিয়ে আসমানের দিকে ইশারা করে দেখালো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি কে? সে প্রথমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে এবং পরে আসমানের দিকে ইশারা করলো। এভাবে তার উদ্দেশ্য বুঝা যাচ্ছিল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ একে মুক্ত করে দাও, এ ঈমানদার। (মুয়াত্তা, মুসলিম ও নাসায়ী হাদীসগ্রন্থেও অনুরূপ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে)। হযরত উমর (রা) হযরত খাওলা বিনতে সা'লাবা সম্পর্কে একবার বলেন যে, তিনি এমন এক মহিলা যার আবেদন সাত আসমানের ওপর থেকে কবুল করা হয়েছে। (সূরা মুজাদালার তাফসীরে ২নং টীকায় আমরা এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করেছি।) এসব কথা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মানুষ যখন আল্লাহ সম্পর্কে চিন্তা করে তখন স্বভাবতই তার মন নিচে মাটির দিকে যায় না। বরং ওপরে আসমানের দিকে যায়। এদিকে লক্ষ রেখেই এখানে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে مَنْ فِى السَّمَاءِ (যিনি আসমানে

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿١٨﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ۚ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿١٩﴾ أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ ۚ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴿٢٠﴾ أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۚ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ﴿٢١﴾ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٢﴾

তাদের পূর্বের লোকেরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল। ফলে দেখো, আমার পাকড়াও কত কঠিন হয়েছিল।[২৮] তারা কি মাথার ওপর উড়ন্ত পাখীগুলোকে ডানা মেলতে ও গুটিয়ে নিতে দেখে না? রহমান ছাড়া আর কেউ নেই যিনি তাদেরকে ধরে রাখেন।[২৯] তিনিই সবকিছুর রক্ষক।[৩০] বলো তো, তোমাদের কাছে কি এমন কোন বাহিনী আছে যা রহমানের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে?[৩১] বাস্তব অবস্থা হলো, এসব কাফেররা ধোঁকায় পড়ে আছে মাত্র। অথবা বলো, রহমান যদি তোমাদের রিযিক বন্ধ করে দেন তাহলে এমন কেউ আছে, যে তোমাদের রিযিক দিতে পারে? প্রকৃতপক্ষে এসব লোক বিদ্রোহ ও সত্য বিমুখতায় বদ্ধপরিকর। ভেবে দেখো, যে ব্যক্তি মুখ নিচু করে পথ চলছে[৩২] সে-ই সঠিক পথপ্রাপ্ত, না যে ব্যক্তি মাথা উঁচু করে সোজা হয়ে সমতল পথে হাঁটছে সে-ই সঠিক পথ প্রাপ্ত?

আছেন) কথাটি বলা হয়েছে। তাই এ ক্ষেত্রে এরূপ সন্দেহ পোষণ করার কোন অবকাশ নেই যে, কুরআন আল্লাহ তা'আলাকে আসমানে অবস্থানকারী বলে ঘোষণা করছে। কি করে এ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে? এ সূরা মুল্‌কেরই শুরুতে বলা হয়েছে, الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا (তিনি, স্তরে স্তরে সাজিয়ে সাতটি আসমান সৃষ্টি করেছেন) সূরা আল বাকারায় বলা হয়েছে, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ তোমরা যেদিকেই মুখ ফিরাও না কেন সেটিই আল্লাহর দিক।

২৬. এভাবে বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, এ পৃথিবীতে তোমাদের টিকে থাকা এবং নিরাপত্তা লাভ করা সবসময় মহান আল্লাহর দয়া ও করুণার ওপর নির্ভর করে। তোমরা আপন শক্তির জোরে এ পৃথিবীতে সুখের জীবন যাপন করছো না। তোমাদের জীবনের এক একটি মুহূর্ত, যা এখানে অতিবাহিত হচ্ছে, তার সবই আল্লাহর হিফাযত ও তত্ত্বাবধানের

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ قَلِيلًا
مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٢٣﴾ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٥﴾ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ
وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٦﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا
وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ ﴿٢٧﴾

এদেরকে বলো, আল্লাহই তো তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তোমাদের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও বিবেক–বুদ্ধি দিয়েছেন। তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকো।[৩৩]

এদেরকে বলো, আল্লাহই সেই সত্তা যিনি তোমাদের পৃথিবী ব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর তাঁরই কাছে তোমাদের সমবেত করা হবে।[৩৪] এরা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে বলো এ ওয়াদা কবে বাস্তবায়িত হবে?[৩৫] বলো, এ বিষয়ে জ্ঞান আছে শুধু আল্লাহর নিকট। আমি স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।[৩৬] তারপর এরা যখন ঐ জিনিসকে কাছেই দেখতে পাবে তখন যারা অস্বীকার করেছে তাদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে যাবে।[৩৭] আর তাদেরকে বলা হবে, এতো সেই জিনিস যা তোমরা চাচ্ছিলে।

ফল। অন্যথায় তাঁর ইংগিতে যে কোন সময় এ পৃথিবীতে ভূমিকম্প সংঘটিত হতে পারে এবং এ পৃথিবী তোমাদের জন্য মায়ের স্নেহময় কোল না হয়ে কবরে পরিণত হতো। অথবা যে কোন সময় এমন ঝড় ঝঞ্ঝা আসতে পারে যা তোমাদের জনপদকে ধ্বংস করে ফেলবে।

২৭. সাবধানবাণী মানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে মক্কার কাফেরদেরকে সাবধান করা। তাদেরকে সাবধান করে দেয়া হচ্ছিল, যদি তোমরা কুফরী ও শিরক থেকে বিরত না হও এবং তাওহীদের যে আহবান তোমাদের জানানো হচ্ছে তাতে সাড়া না দাও তাহলে আল্লাহর আযাব তোমাদের পাকড়াও করবে।

২৮. ইতিপূর্বে যেসব কওম তাদের কাছে আসা নবীদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আযাবে নিপতিত হয়েছিলো তাদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

২৯. অর্থাৎ শূন্যে উড়ন্ত প্রতিটি পাখি করুণাময় আল্লাহর হিফাযতে থেকে উড়ে থাকে। তিনি প্রতিটি পাখিকে এমন দৈহিক কাঠামো দান করেছেন যার সাহায্যে তারা উড়ে

বেড়াবার যোগ্যতা লাভ করেছে। তিনিই প্রতিটি পাখিকে উড়তে শিখিয়েছেন। তিনিই বাতাসকে এমন সব নিয়ম-কানুনের অধীন করে দিয়েছেন যে কারণে বাতাসের চেয়ে ভারী দেহের অধিকারী বস্তুসমূহের পক্ষেও বাতাসে ভর দিয়ে উড়া সম্ভব। আর উড়তে সক্ষম প্রতিটি বস্তুকে তিনিই শূন্যে ধরে রাখেন। তা না হলে আল্লাহ তাঁর হিফাযত উঠিয়ে নেয়া মাত্রই তা মাটিতে পড়ে যেতো।

৩০. অর্থাৎ গুটিকয়েক পাখির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং এ পৃথিবীতে যা আছে তা সবই আল্লাহর হিফাযত করার কারণে টিকে আছে। প্রতিটি জিনিসের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যেসব উপকরণ প্রয়োজন তা তিনিই যোগান দিচ্ছেন। তাঁর প্রতিটি সৃষ্টির কাছে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সামগ্রী ঠিকমত পৌছানোর ব্যবস্থা তিনিই করেন।

৩১. আরেকটি অনুবাদ হতে পারে, "রহমান ছাড়া এমন আর কে আছে যে তোমার সৈন্যবাহিনী হয়ে তোমাকে সাহায্য করবে?" আমি যে অনুবাদ করেছি তা পরের আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু দ্বিতীয় অনুবাদটি পূর্বের বক্তব্যগুলোর সাথে সম্পৃক্ত।

৩২. অর্থাৎ জন্তু-জানোয়ারের মতো মুখ নিচু করে ঐ একই পথে চলছে যে পথে কেউ তাদেরকে একবার চালিয়ে দিয়েছে।

৩৩. অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের মানুষ হিসেবে পাঠিয়েছিলেন, জন্তু-জানোয়ার করে পাঠাননি। তোমাদের কাজ তো এ ছিল না যে, দুনিয়ায় যে গোমরাহী বিস্তারলাভ করে আছে তোমরা চোখ বন্ধ করে তাই মেনে চলবে, ভেবেও দেখবে না, যে পথে তোমরা চলছো তা সঠিক কিনা। কেউ যদি তোমাদের সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝাতে চেষ্টা করে, তার কথা তোমরা কানেই তুলবে না এবং তোমাদের মন-মস্তিষ্কে আগে থেকে জেঁকে বসা অসত্য ও অন্যায়কে আঁকড়ে থাকবে এ উদ্দেশ্যে তোমাদেরকে এ কান দেয়া হয়নি। এ চোখ তো এ জন্য দেয়া হয়নি যে, তোমরা অন্ধের মতো অন্যের অনুসরণ করবে। যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা নিদর্শনসমূহ আল্লাহর রসূলের পেশকৃত তাওহীদের সাক্ষ দিচ্ছে কি না এ বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থাপনা খোদাহীন বা বহুখোদার পরিচালনাধীন হওয়ার সাক্ষ্য দিচ্ছে কিনা নিজের দৃষ্টিশক্তিকে কাজে লাগিয়ে তোমরা তা দেখবে না এ জন্য এ চোখ তোমাদেরকে দেয়া হয়নি। এ মন-মস্তিষ্কও তোমাদের এ জন্য দেয়া হয়নি যে, তোমরা চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বিবেচনার কাজ অন্যদের হাতে ছেড়ে দিয়ে দুনিয়াতে এমন সব নিয়ম-কানুন অনুসরণ করে চলবে যা অন্য কেউ চালু করেছে। তোমরা বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে এতোটুকুও ভেবে দেখবে না যে, তা সঠিক না ভ্রান্ত। জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধি এবং শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির এ নিয়ামত আল্লাহ তোমাদের দিয়েছিলেন ন্যায় ও সত্যকে চেনার জন্য। কিন্তু তোমরা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছো। এসব উপকরণের মাধ্যমে তোমরা সব কাজই করছো। কিন্তু যে জন্য তা তোমাদের দেয়া হয়েছিলো সে একটি কাজই মাত্র করছো না। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন; তাফহীমুল কুরআন, আন নাহল, টীকা ৭২-৭৩; আল মু'মিনূন, টীকা ৭৫-৭৬; আস সাজদা, টীকা ১৭-১৮; আল আহকাফ, টীকা ৩১)

৩৪. অর্থাৎ মৃত্যুলাভের পরে পুনরায় তোমাদেরকে জীবিত করে পৃথিবীর সব জায়গা থেকে পরিবেষ্টিত করে আনা হবে এবং আল্লাহর সামনে হাজির করা হবে।

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ ٱللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَٰفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٨﴾ قُلْ هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ءَامَنَّا بِهِۦ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢٩﴾ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءٍ مَّعِينٍۭ ﴿٣٠﴾

তুমি এদেরকে বলো, তোমরা কখনো এ বিষয়টি ভেবে দেখেছো কি যে, আল্লাহ যদি আমাকে ও আমার সংগীদেরকে ধ্বংস করে দেন কিংবা আমাদের ওপর রহম করেন তাতে কাফেরদেরকে কঠিন শাস্তি থেকে কে রক্ষা করবে?[৩৮] *এদেরকে বলো, তিনি অত্যন্ত দয়ালু, আমরা তাঁর ওপর ঈমান এনেছি এবং তাঁরই ওপর নির্ভর করেছি।*[৩৯] *তোমরা অচিরেই জানতে পারবে কে স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে ডুবে আছে? এদেরকে বলো, তোমরা কি এ বিষয়ে কখনো চিন্তা-ভাবনা করে দেখেছো যে, যদি তোমাদের কুয়াগুলোর পানি মাটির গভীরে নেমে যায় তাহলে পানির এ বহমান স্রোত কে তোমাদের ফিরিয়ে এনে দেবে?*[৪০]

৩৫. এভাবে প্রশ্ন করে তারা কিয়ামতের সময় ও তার দিন তারিখ জানতে চাইতো না। তারা এ উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করতো না যে, তাদেরকে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সন, মাস, দিন ও সময় বলে দিলে তারা তা স্বীকার করে নেবে। বরং তারা মনে করতো কিয়ামত সংঘটিত হওয়া অসম্ভব ও অযৌক্তিক। আর তা মিথ্যা সাব্যস্ত করার একটা বাহানা হিসেবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যেই এ প্রশ্ন তারা করতো। তাদের মূল বক্তব্য হলো, তুমি আমাদেরকে কিয়ামতের যে অদ্ভূত কাহিনী শুনাচ্ছো, তা কখন আত্মপ্রকাশ করবে? কোন্ সময়ের জন্য তা সংরক্ষিত রাখা হয়েছে? আমাদের চোখের সামনে এনে তা দেখিয়ে দিচ্ছো না কেন? দেখিয়ে দিলেই তো আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে যেতো। এ বিষয়ে একটি কথা ভালভাবে উপলব্ধি করা দরকার যে, কেউ কিয়ামতের সত্যতা স্বীকার করলে বিবেক-বুদ্ধি ও যুক্তি-প্রমাণ দ্বারাই করতে পারে। কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় এ ধরনের যুক্তি-প্রমাণ সবিস্তারে পেশ করা হয়েছে। এখন থেকে যায় কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার তারিখ সম্পর্কিত বিষয়টি। কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আলোচনায় কোন অকাট্য মূর্খই কেবল এ প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে। কারণ, দিন তারিখ বলে দিলেও তাতে কোন পার্থক্য সূচিত হবে না। অস্বীকারকারী তখন বলবে, যখন তা তোমাদের দেয়া নির্দিষ্ট তারিখে সংঘটিত হবে, তখন মেনে নেবো। আজ আমি কি করে একথা বিশ্বাস করবো যে, তোমার দেয়া নির্দিষ্ট তারিখে তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, লোকমান, টীকা ৬৩; আল আহযাব, টীকা ১১৬; সাবা, টীকা ৫-৪৮; ইয়াসীন, টীকা ৪৫)

৩৬. অর্থাৎ একথা তো আমার জানা যে, কিয়ামত অবশ্যই আসবে। আর তার আসার আগে মানুষকে সাবধান করে দেয়ার জন্য এতোটুকু জানাই যথেষ্ট। তবে কখন আসবে তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। আমি সে সম্পর্কে কিছু জানি না। আর সাবধান করে দেয়ার জন্য সে বিষয়ে জ্ঞান থাকার কোন প্রয়োজন নেই। এ বিষয়টি একটি উদাহরণের মাধ্যমে ভালভাবে বুঝা যেতে পারে। কোন্ ব্যক্তি কখন মারা যাবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কেউ তা জানে না। তবে আমরা এতোটুকু জানি যে, প্রত্যেককেই এক সময় মৃত্যুবরণ করতে হবে। এখন আমাদের এ জ্ঞানটুকু আমাদের কোন অসতর্ক প্রিয়জনকে মৃত্যু সম্পর্কে সতর্কীকরণের জন্য যথেষ্ট। যাতে সে যথাযথভাবে তার স্বার্থের হিফাযত করতে পারে। এতোটুকু সাবধান করে দেয়ার জন্য সে কোন্‌দিন মারা যাবে তা জানা জরুরী নয়।

৩৭. অর্থাৎ কোন অপরাধীকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানোর জন্য নিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে যে অবস্থা হয় তাদের অবস্থাও ঠিক তাই হবে।

৩৮. মক্কা নগরীতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের আন্দোলনের সূচনা হলে কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রভুক্ত ব্যক্তিবর্গ ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করলো। এতে মক্কার প্রতিটি পরিবার থেকে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদেরকে অভিশাপ দেয়া শুরু হলো। তাঁর বিরুদ্ধে যাদুটোনা বা তন্ত্রমন্ত্রের প্রয়োগ শুরু হলো, যাতে তিনি ধ্বংস হয়ে যান। এমনকি হত্যার পরিকল্পনা সম্পর্কেও চিন্তা-ভাবনা চলতে থাকলো। তাই এখানে বলা হয়েছে, এদের বলো, আমরা ধ্বংস হয়ে যাই বা আল্লাহর রহমতে বেঁচে থাকি তাতে তোমাদের কি লাভ? আল্লাহর আযাব এলে তোমরা নিজেরা কিভাবে নিষ্কৃতি পাবে সে চিন্তা করতে থাকো।

৩৯. অর্থাৎ আমরা আল্লাহর ওপরে ঈমান এনেছি আর তোমরা তাঁকে অস্বীকার করে চলেছো। আমরা ভরসা করি একমাত্র আল্লাহর ওপর আর তোমরা ভরসা করো তোমাদের দল, পার্থিব উপায়-উপকরণ এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য সব উপাস্য দেব-দেবীদের ওপর। তাই আমরাই আল্লাহর রহমত লাভের উপযুক্ত, তোমরা নও।

৪০. অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ এমন শক্তির অধিকারী আছে কি; যে এসব ঝর্ণাধারা আবার প্রবাহিত করে দেবে? যদি না থাকে আর তোমরা ভাল করেই জানো যে, নেই। তাহলে ইবাদত লাভের যোগ্য আল্লাহ না তোমাদের উপাস্যরা যাদের ঐ ঝর্ণাধারাগুলো প্রবাহিত করার কোন সামর্থ নেই। এখন তোমরা নিজের বিবেককে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করে দেখো যে, যারা এক আল্লাহকে মানে তারাই গোমরাহ না যারা শিরকে লিপ্ত আছে তারাই গোমরাহ?

আল কলম

৬৮

নামকরণ

এ সূরাটির দু'টি নাম; সূরা 'নূন' এবং সূরা 'আল কলম'। দু'টি শব্দই সূরার শুরুতে আছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এটিও মক্কী জীবনের প্রথম দিকে নাযিল হওয়া সূরাসমূহের অন্যতম। তবে এর বিষয়বস্তু থেকে স্পষ্ট হয় যে, সূরাটি যে সময় নাযিল হয়েছিলো তখন মক্কা নগরীতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা বেশ তীব্র হয়ে উঠেছিলো।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এতে তিনটি মূল বিষয় আলোচিত হয়েছে। বিরোধীদের আপত্তি ও সমালোচনার জবাব দান, তাদেরকে সতর্কীকরণ ও উপদেশ দান এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ধৈর্যধারণ ও অবিচল থাকার উপদেশ দান।

বক্তব্যের শুরুতেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছে, এসব কাফের তোমাকে পাগল বলে অভিহিত করছে। অথচ তুমি যে কিতাব তাদের সামনে পেশ করছো এবং নৈতিকতার যে উচ্চ আসনে তুমি অধিষ্ঠিত আছো তা–ই তাদের এ মিথ্যার মুখোশ উন্মোচনের জন্য যথেষ্ট। শিগগিরই এমন সময় আসবে যখন সবাই দেখতে পাবে, কে পাগল আর কে বুদ্ধিমান। অতএব তোমার বিরুদ্ধে বিরোধিতার যে তাণ্ডব সৃষ্টি করা হচ্ছে তা দ্বারা তুমি কখনো প্রভাবিত হয়ো না। আসলে তুমি যাতে কোন না কোনভাবে প্রভাবিত হয়ে তাদের সাথে সমঝোতা (Compromise) করতে রাজী হয়ে যাও, এ উদ্দেশ্যেই এ কাজ করা হচ্ছে।

অতপর সাধারণ মানুষকে চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়ার জন্য বিরুদ্ধবাদীদের মধ্য থেকে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তির কার্যকলাপ তুলে ধরা হয়েছে। এ ব্যক্তিকে মক্কাবাসীরা খুব ভাল করে জানতো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূত–পবিত্র নৈতিক চরিত্রও তাদের সবার কাছে স্পষ্ট ছিলো। মক্কার যেসব নেতা তাঁর বিরোধিতায় সবার অগ্রগামী তাদের মধ্যে কোন্ ধরনের চরিত্র সম্পন্ন লোক শামিল রয়েছে তা যে কেউ দেখতে পারতো।

এরপর ১৭ থেকে ৩৩ আয়াত পর্যন্ত একটি বাগানের মালিকদের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। আল্লাহর নিয়ামত লাভ করেও তারা সে জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি। বরং তাদের মধ্যকার সর্বোত্তম ব্যক্তিটির কথাও তারা যথাসময়ে মেনে নেয়নি। অবশেষে তারা সে নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়েছে। যখন তাদের সবকিছুই ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গিয়েছে তখনই কেবল তাদের চেতনা ফিরেছে। এ উদাহরণ দ্বারা মক্কাবাসীকে এভাবে সাবধান করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রসূল করে পাঠানোর কারণে তোমরাও ঐ বাগান মালিকদের মতো পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছো। তোমরা যদি তাঁকে না মানো তাহলে দুনিয়াতেও শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। আর এ জন্য আখেরাতে যে শাস্তি ভোগ করবে তাতো এর চেয়েও বেশী কঠোর।

এরপর ২৪ থেকে ৪৭ আয়াত পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে কাফেরদেরকে বুঝানো হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কখনো সরাসরি তাদেরকে লক্ষ করে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। আবার কখনো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। আসলে সাবধান করা হয়েছে তাদেরকেই। এ সম্পর্কে যেসব কথা বলা হয়েছে তার সার সংক্ষেপ হলো, আখেরাতের কল্যাণ তারাই লাভ করবে যারা আল্লাহভীতির ওপর ভিত্তি করে দুনিয়াবী জীবন যাপন করেছে। আল্লাহর বিচারে গোনাহগার ও অপরাধীদের যে পরিণাম হওয়া উচিত আল্লাহর অনুগত বান্দারাও সে একই পরিণাম লাভ করবে এরূপ ধ্যান-ধারণা একেবারেই বুদ্ধি-বিবেক বিরোধী। কাফেরদের এ ভ্রান্ত ধারণা একেবারেই ভিত্তিহীন যে, তারা নিজের সম্পর্কে যা ভেবে বসে আছে আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে অনুরূপ আচরণই করবেন। যদিও এ বিষয়ে তাদের কাছে কোন নিশ্চয়তা বা গ্যারান্টি নেই। আজ এ পৃথিবীতে যাদেরকে আল্লাহর সামনে মাথা নত করার আহবান জানানো হচ্ছে তারা তা করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। কিন্তু কিয়ামতের দিন তারা সিজদা করতে চাইলেও করতে সক্ষম হবে না। সেদিন তাদেরকে লাঞ্ছনাকর পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে। কুরআনকে অস্বীকার করে তারা আল্লাহর আযাব থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে না। তাদেরকে যে অবকাশ দেয়া হচ্ছে তাতে তারা ধোঁকায় পড়ে গেছে। তারা মনে করছে এভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা ও অস্বীকৃতি সত্ত্বেও যখন তাদের ওপর আযাব আসছে না তখন তারা সঠিক পথেই আছে। অথচ নিজের অজান্তেই তারা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তাদের কাছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। কারণ তিনি দীনের একজন নিঃস্বার্থ প্রচারক। নিজের জন্য তিনি তাদের কাছে কিছুই চান না। তারা দাবী করে একথাও বলতে পারছে না যে, তিনি রসূল নন অথবা তাদের কাছে তাঁর বক্তব্য মিথ্যা হওয়ার প্রমাণ আছে।

সবশেষে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছে যে, চূড়ান্ত ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত দীনের প্রচার ও প্রসারের পথে যে দুঃখ-কষ্টই আসুক না কেন, ধৈর্যের সাথে তা বরদাশত করতে থাকুন এবং এমন অধৈর্য হয়ে পড়বেন না যা ইউনুস আলাইহিস সালামের জন্য কঠিন পরীক্ষার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ۝١ مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ۝٢ وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ۝٣ وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ۝٤ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُوْنَ ۝٥ بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُوْنُ ۝٦ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۠ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ۝٧

নূন, শপথ কলমের এবং লেখকরা যা লিখে চলেছে তার।[১] তোমার রবের অনুগ্রহে তুমি পাগল[২] নও। আর নিশ্চিতভাবেই তোমার জন্য এমন পুরস্কার রয়েছে যা কখনো ফুরাবে না।[৩] নিসন্দেহে তুমি নৈতিকতার অতি উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন।[৪] অচিরে তুমিও দেখতে পাবে এবং তারাও দেখতে পাবে যে, তোমাদের উভয়ের মধ্যে কারা পাগলামীতে লিপ্ত। তোমার রব তাদেরকেও ভাল করে জানেন যারা তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। আর তাদেরকেও ভাল করে জানেন যারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়েছে।

১. তাফসীরের ইমাম মুজাহিদ বলেন ঃ কলম মানে যে কলম দিয়ে যিকর অর্থাৎ কুরআন মজীদ লেখা হচ্ছিলো। এ থেকে বুঝা যায়, যা লেখা হচ্ছিলো তা ছিল কুরআন মজীদ।

২. একথাটির জন্যই 'কলম' ও কিতাবের নামে শপথ করা হয়েছে। অর্থাৎ অহী লেখক ফেরেশতাদের হাত দিয়ে কুরআন মজীদ লিপিবদ্ধ হচ্ছে। কুরআন মজীদ ফেরেশতাদের হাতে লিপিবদ্ধ হওয়াই কাফেরদের এ অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট যে, নাউযুবিল্লাহ, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাগল। নবুওয়াত দাবী করার পূর্বে মক্কাবাসীরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কওমের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ মনে করতো। তারা তাঁর দীনদারী, আমানতদারী, বিবেক–বুদ্ধি ও দূরদর্শিতার ওপর আস্থাশীল ছিলো। কিন্তু তিনি তাদের সামনে কুরআন মজীদ পেশ করতে শুরু করলে তারা তাঁকে পাগল বলে অভিহিত করতে লাগলো। এর সোজা অর্থ হলো, রসূলের (সা) প্রতি পাগল হওয়ার যে অপবাদ তারা আরোপ করতো তাদের দৃষ্টিতে তার মূল কারণ ছিলো কুরআন। তাই বলা

হয়েছে, কুরআনই এ অপবাদের অসারতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। নাউযুবিল্লাহ! তিনি পাগল হয়ে গিয়েছেন একথা প্রমাণ করা তো দূরে থাক অতি উচ্চমানের বিশুদ্ধ ও অলংকারপূর্ণ ভাষায় এরূপ উন্নত বিষয়বস্তু পেশ করাই বরং একথা প্রমাণ করে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর আল্লাহর বিশেষ মেহেরবানী বর্ষিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো বাহ্যিকভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বক্তব্য পেশ করা হলেও মূল লক্ষ হলো কাফেরদেরকে তাদের অপবাদের জবাব দেয়া। অতএব, কারো মনে যেন এ সন্দেহ দানা না বাঁধে যে, এ আয়াতটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে পাগল নন এ মর্মে তাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য নাযিল হয়েছে। নবী (স) নিজের সম্পর্কে এমন কোন সন্দেহ পোষণ করতেন না যা নিরসনের জন্য তাঁকে এরূপ সান্ত্বনা দেয়ার প্রয়োজন ছিলো। বরং এর লক্ষ কাফেরদেরকে এতোটুকু জানিয়ে দেয়া যে, কুরআনের কারণে তোমরা কুরআন পেশকারীকে পাগল বলে আখ্যায়িত করছো। তোমাদের এ অভিযোগ যে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন খোদ কুরআনই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। (আরো বেশী জানতে হলে দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা তূর, টীকা ২২)

৩. অর্থাৎ এ জন্য তাঁকে দেয়া হবে অগণিত ও চিরস্থায়ী নিয়ামত। কারণ আল্লাহর বান্দাদের হিদায়াতের জন্য তিনি চেষ্টা–সাধনা করছেন। বিনিময়ে তাঁকে নানা রকম কষ্টদায়ক কথা শুনতে হচ্ছে। এসব সত্ত্বেও তিনি তাঁর এ কর্তব্য পালন করে চলেছেন।

৪. এখানে এ আয়াতটির দু'টি অর্থ। একটি হলো, আপনি নৈতিক চরিত্রের সর্বোচ্চ মানের ওপর অধিষ্ঠিত। তাই আপনি আল্লাহর বান্দাদের হিদায়াতের কাজে এতো দুঃখ–কষ্ট বরদাশত করছেন। একজন দুর্বল নৈতিক চরিত্রের মানুষ এ কাজ করতে সক্ষম হতো না। অন্যটি হলো, কাফেররা আপনার প্রতি পাগল হওয়ার যে অপবাদ আরোপ করছে তা মিথ্যা হওয়ার আরেকটি সুস্পষ্ট প্রমাণ আপনার উন্নত নৈতিক চরিত্র। কারণ উন্নত নৈতিক চরিত্র ও মস্তিষ্ক বিকৃতি একসাথে একই ব্যক্তির মধ্যে থাকতে পারে না। যার বুদ্ধি–বিবেক ও চিন্তার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে এবং মেজাজে সমতা নেই সে–ই পাগল। পক্ষান্তরে মানুষের উন্নত নৈতিক চরিত্র প্রমাণ করে যে, তার মস্তিষ্ক ও বিবেক–বুদ্ধি ঠিক আছে এবং সে সুস্থ ও স্বাভাবিক। তার মন–মানস ও মেজাজ অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নৈতিক চরিত্র কেমন তা মক্কার লোকদের অজানা ছিল না। তাই এদিকে শুধু একটু ইংগিত দেয়াই যথেষ্ট। এতেই মক্কার প্রতিটি বিবেকসম্পন্ন মানুষ চিন্তা করতে বাধ্য হবে যে, তারা কতই নির্লজ্জ! নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে এতো উন্নত একজন মানুষকে তারা পাগল বলে আখ্যায়িত করছে। তাদের এ অর্থহীন কথাবার্তা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য নয় বরং তাদের নিজেদের জন্যই ক্ষতিকর। কারণ শত্রুতার আক্রোশে উন্মত্ত হয়ে তারা তাঁর সম্পর্কে এমন কথা বলছিলো, যা কোন বিবেকবান ব্যক্তি কল্পনাও করতে পারে না। এ যুগের জ্ঞান–গবেষণার দাবীদারদের ব্যাপারও ঠিক তাই। তারাও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মৃগী রোগগ্রস্ত ও বিকৃত মস্তিষ্ক হওয়ার অপবাদ আরোপ করছে। দুনিয়ার সব জায়গায় কুরআন শরীফ পাওয়া যায় এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন বৃত্তান্তও সবিস্তারে লিপিবদ্ধ আছে। যে কোন লোক তা অধ্যয়ন করলেই বুঝতে পারবে যে, এ অনুপম গ্রন্থ পেশকারী এবং এরূপ উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী

فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ ۝٨ وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ ۝٩ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ ۝١٠ هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۢ بِنَمِيْمٍ ۝١١ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ۝١٢ عُتُلٍّۢ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ ۝١٣ اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَّبَنِيْنَ ۝١٤ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝١٥ سَنَسِمُهٗ عَلَى الْخُرْطُوْمِ ۝١٦

কাজেই তুমি মিথ্যাচারীদের অনুসরণ করো না। তারা তো চায় তুমি নমনীয়তা দেখালে তারাও নমনীয়তা দেখাবে।[৫] তুমি অবদমিত হয়ো না তার দ্বারা যে কথায় কথায় শপথ করে, যে মর্যাদাহীন,[৬] যে গীবত করে, চোগল খোরী করে বেড়ায়, কল্যাণের কাজে বাধা দেয়,[৭] জুলুম ও বাড়াবাড়িতে সীমালংঘন করে, চরম পাপিষ্ঠ ঝগড়াটে ও হিংস্র[৮] এবং সর্বোপরি বজ্জাত।[৯] কারণ সে সম্পদশালী ও অনেক সন্তানের পিতা[১০] তাকে যখন আমার আয়াতসমূহ শোনানো হয় তখন সে বলে এ তো প্রাচীনকালের কিস্‌সা–কাহিনী। শিগগীরই আমি তার শুঁড় দাগিয়ে দেবো।[১১]

মানুষটিকে মানসিক রোগী বলে আখ্যায়িত করে তারা শত্রুতার অন্ধ আবেগে আক্রান্ত হয়ে কি ধরনের অর্থহীন ও হাস্যকর প্রলাপ বকে চলেছে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নৈতিক চরিত্রের সর্বোত্তম সংজ্ঞা দিয়েছেন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা। তিনি বলেছেন ঃ كان خلقها القران কুরআনই ছিলো তাঁর চরিত্র। ইমাম আহমাদ, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, দারেমী ও ইবনে জারীর সামান্য কিছু শাব্দিক তারতম্যসহ তাঁর এ বাণীটি বিভিন্ন সনদে বর্ণনা করেছেন। এর মানে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়ার সামনে শুধু কুরআনের শিক্ষাই পেশ করেননি। বরং তিনি নিজেকে তার জীবন্ত নমুনা হিসেবে পেশ করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। কুরআনে যেসব নির্দেশ দেয়া হয়েছে সবার আগে তিনি নিজে সে মোতাবেক কাজ করেছেন। এতে যেসব বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছে তিনি নিজে তা সবার আগে বর্জন করেছেন। কুরআন মজীদে যে নৈতিক গুণাবলীকে মর্যাদার কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে সেসব গুণে তিনি ছিলেন সবার চেয়ে বেশী গুণান্বিত। আর কুরআন মজীদে যেসব বিষয়কে অপছন্দনীয় আখ্যায়িত করা হয়েছে তিনি নিজে ছিলেন তা থেকে সবচেয়ে বেশী মুক্ত। আরেকটি বর্ণনায় হযরত আয়েশা বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কোন খাদেমকে মারেননি, কোন নারীর গায়ে হাত তোলেননি, জিহাদের ক্ষেত্র ছাড়া নিজ হাতে কখনো কাউকে হত্যা করেননি।[১] তাঁকে কেউ কষ্ট দিয়ে থাকলে তিনি কখনো তার প্রতিশোধ নেননি। কেবল আল্লাহর হারাম করা বিষয়ে সীমালংঘন করলে

১. সীরাতে ইবনে হিশাম সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বাংলা অনুবাদ পৃষ্ঠা–১৯২ দেখুন। (অনুবাদক)

তিনি তার শাস্তি দিয়েছেন। তাঁর নীতি ছিলো, কোন দু'টি বিষয়ের একটি গ্রহণ করতে হলে তা যদি গোনাহর কাজ না হতো তাহলে তিনি সহজতর বিষয়টি গ্রহণ করতেন। গোনাহর কাজ থেকে তিনি সবচেয়ে বেশী দূরে থাকতেন। (মুসনাদে আহমাদ) হযরত আনাস বর্ণনা করেছেন, আমি দশ বছর যাবত রসূলুল্লাহর খেদমতে নিয়োজিত ছিলাম। আমার কোন কাজ সম্পর্কে তিনি কখনো উহ! শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করেননি। আমার কোন কাজ দেখে কখনো বলেননি ঃ তুমি এ কাজ করলে কেন? কিংবা কোন কাজ না করলে কখনো বলেননি ঃ তুমি এ কাজ করলে না কেন? (বুখারী ও মুসলিম)

৫. অর্থাৎ ইসলাম প্রচারের কাজে তুমি কিছু শিথিলতা দেখালে এরাও তোমার বিরোধিতায় কিছুটা নমনীয়তা দেখাবে। কিংবা তাদের গোমরাহীকে প্রশ্রয় দিয়ে যদি দীনের মধ্যে কিছুটা কাটছাঁট করতে রাজী হয়ে যাও তাহলে এরাও তোমার সাথে আপোষ রফা করে নেবে।

৬. মূল আয়াতে مَهِينٍ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দটি নগণ্য, তুচ্ছ এবং নীচু লোকদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এটা কথায় কথায় শপথকারী ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট। সে কথায় কথায় কসম খায়। কারণ সে নিজেই বুঝে যে, লোকে তাকে মিথ্যাবাদী মনে করে। কসম না খাওয়া পর্যন্ত লোকে তাকে বিশ্বাস করবে না। তাই সে নিজের বিবেকের কাছে হীন এবং সমাজের কাছেও তার কোন মর্যাদা নেই।

৭. আয়াতে مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় অর্থ–সম্পদ ও যাবতীয় ভাল কাজকেও خَيْر (খায়ের) বলা হয়। তাই শব্দটিকে যদি অর্থ–সম্পদ অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে তার মানে হবে সে অত্যন্ত বখীল এবং কৃপণ। কাউকে কানাকড়ি দেয়ার মত উদারতা এবং মন–মানসও তার নেই। আর যদি خَيْر শব্দটি নেকী ও ভাল কাজের অর্থে গ্রহণ করা হয়, তবে সে ক্ষেত্রে তার একটি অর্থ হতে পারে, সে প্রতিটি কল্যাণের কাজে বাধা সৃষ্টি করে। আরেকটি অর্থ হতে পারে সে ইসলাম থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখতে অত্যন্ত তৎপর।

৮. আয়াতে ব্যবহৃত মূল শব্দ হলো عُتُلٍّ । আরবী ভাষায় عتل বলা হয় এমন লোককে যে অত্যন্ত সুঠামদেহী ও অধিকমাত্রায় পানাহারকারী। অধিকন্তু চরম দুশ্চরিত্র, ঝগড়াটে এবং হিংস্র ও পাষণ্ড।

৯. মূল আয়াতে زَنِيمٍ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবদের ভাষায় এ শব্দটি এমন অবৈধ সন্তানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে পরিবারের লোক নয়, কিন্তু তাদের মধ্যে অন্তরভুক্ত হয়ে গিয়েছে। সাঈদ ইবনে জুবাইর এবং শা'বী বলেন ঃ এ শব্দটি এমন লোকের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যে তার অন্যায় ও দুষ্কৃতির কারণে বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

এসব আয়াতে বর্ণিত বৈশিষ্টগুলো যে ব্যক্তিকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে তার সম্পর্কে মুফাস্‌সিরগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কেউ বলেছেন যে, সে ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা। কেউ আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগুসের নাম উল্লেখ করেছেন। কেউ আখনাস ইবনে শুরাইককে এই ব্যক্তি বলে চিহ্নিত করেছেন। আবার কেউ কেউ অন্য কিছু ব্যক্তির প্রতিও ইংগিত করেছেন। কিন্তু কুরআন মজীদে তার নাম উল্লেখ না করে শুধু বৈশিষ্টগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় এসব বৈশিষ্টের কারণে সে মক্কায় বেশ পরিচিত ছিল।

إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿١٧﴾ وَلَا يَسْتَثْنُونَ ﴿١٨﴾ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿١٩﴾ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿٢٠﴾ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ﴿٢١﴾ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ ﴿٢٢﴾ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ﴿٢٣﴾ أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ ﴿٢٤﴾

আমি এদের (মক্কাবাসী)–কে পরীক্ষায় ফেলেছি যেভাবে পরীক্ষায় ফেলেছিলাম[১২] বাগানের মালিকদেরকে, যখন তারা শপথ করেছিল যে, তারা খুব ভোরে গিয়ে অবশ্যি নিজেদের বাগানের ফল আহরণ করবে। তারা এ ব্যাপারে কোন ব্যতিক্রমের সম্ভাবনা স্বীকার করছিলো না।[১৩] অতপর তোমার রবের পক্ষ থেকে একটা বিপর্যয় এসে সে বাগানে চড়াও হলো। তখন তারা ছিলো নিদ্রিত। বাগানের অবস্থা হয়ে গেলো কর্তিত ফসলের ন্যায়। ভোরে তারা একে অপরকে ডেকে বললো ঃ তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও তাহলে সকাল সকাল ফসলের মাঠের দিকে বেরিয়ে পড়ো।[১৪] সুতরাং তারা বেরিয়ে পড়লো। তারা নীচু গলায় একে অপরকে বলছিলো, আজ যেন কোন অভাবী লোক বাগানে তোমাদের কাছে না আসতে পারে।

তাই তার নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিল না। এসব বৈশিষ্ট উল্লেখ করা মাত্র যে কোন লোক বুঝতে পারতো, কার প্রতি ইংগিত করা হচ্ছে।

১০. এ আয়াতটির সম্পর্ক পূর্বোক্ত আয়াতগুলোর সাথেও হতে পারে এবং পরের আয়াতের সাথেও হতে পারে। পূর্বোক্ত আয়াতগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে অর্থ হবে, বিপুল অর্থ–সম্পদ এবং অনেক সন্তান আছে বলে এ ধরনের লোকের দাপট ও প্রভাব–প্রতিপত্তি মেনে নিয়ো না। পরবর্তী আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে অর্থ হবে, বিপুল অর্থ–সম্পদ ও অনেক সন্তান থাকার কারণে সে অহংকারী হয়েছে। তাকে আমার আয়াত শুনালে সে বলে এসব তো প্রাচীনকালের কিস্সা কাহিনী মাত্র।

১১. সে যেহেতু নিজেকে খুব মর্যাদাবান মনে করতো তাই তার নাককে শুঁড় বলা হয়েছে। নাক দাগিয়ে দেয়ার অর্থ হচ্ছে লাঞ্ছিত করা। অর্থাৎ আমি তাকে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গাতেই এমন লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবো যে, এ লাঞ্ছনা ও অপমান থেকে সে কখনো নিষ্কৃতি পাবে না।

وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ ﴿٢٥﴾ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ﴿٢٦﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٢٧﴾ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ﴿٢٨﴾ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ ﴿٣٠﴾ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ ﴿٣١﴾ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ ﴿٣٢﴾ كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

তারা কিছুই না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে খুব ভোরে এমনভাবে দ্রুত[১৫] সেখানে গেল যেন তারা (ফল আহরণ করতে) সক্ষম হয়। কিন্তু বাগানের অবস্থা দেখার পর বলে উঠলো ঃ আমরা রাস্তা ভুলে গিয়েছি। তাও না—আমরা বরং বঞ্চিত হয়েছি।[১৬] তাদের মধ্যকার সবচেয়ে ভাল লোকটি বললো ঃ আমি কি তোমাদের বলিনি তোমরা 'তাসবীহ' করছো না কেন?[১৭] তখন তারা বলে উঠলো ঃ আমাদের রব অতি পবিত্র। বাস্তবিকই আমরা গোনাহগার ছিলাম। এরপর তারা সবাই একে অপরকে তিরস্কার করতে লাগলো।[১৮] অবশেষে তারা বললো ঃ "আমাদের এ অবস্থার জন্য আফসোস! আমরা তো বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিলাম। বিনিময়ে আমাদের রব হয়তো এর চেয়েও ভাল বাগান আমাদের দান করবেন। আমরা আমাদের রবের দিকে রুজু করছি।" আযাব এরূপই হয়ে থাকে। আখেরাতের আযাব এর চেয়েও বড়। হায়! যদি তারা জানতো।

১২. এখানে সূরা কাহাফের পঞ্চম রুকূ'র আয়াতগুলো সামনে রাখতে হবে। সেখানেও একইভাবে উপদেশ দেয়ার জন্য দুই বাগান মালিকের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে।

১৩. অর্থাৎ নিজেদের ক্ষমতা ও যোগ্যতার ওপর তাদের এমন আস্থা ছিল যে, শপথ করে দ্বিধাহীন চিত্তে বলে ফেললো, কালকে আমরা অবশ্যই আমাদের বাগানের ফল আহরণ করবো। আল্লাহর ইচ্ছা থাকলে আমরা এ কাজ করবো এতটুকু কথা বলার প্রয়োজনও তারা বোধ করেনি।

১৪. এখানে ক্ষেত শব্দ ব্যবহার করার কারণ সম্ভবত এই যে, বাগানে বৃক্ষরাজির ফাঁকে ফাঁকে কৃষিক্ষেতও ছিলো।

১৫. আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ হলো عَلٰى حَرْدٍ । আরবী ভাষায় حرد শব্দটি বাধা দান করা এবং না দেয়া বুঝাতেও বলা হয়, ইচ্ছা এবং সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত বুঝাতেও বলা হয় এবং তাড়াহুড়া অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সুতরাং শব্দটি অনুবাদ করতে আমরা তিনটি অর্থের প্রতিই লক্ষ রেখেছি।

২ রুকূ'

নিশ্চিতভাবে[১৯] মুত্তাকীদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে নিয়ামত ভরা জান্নাত। আমি কি অনুগতদের অবস্থা অপরাধীদের মতো করবো? কি হয়েছে তোমাদের? এ কেমন বিচার তোমরা করছো?[২০] তোমাদের কাছে কি কোন কিতাব[২১] আছে যাতে তোমরা পাঠ করে থাকো যে, তোমাদের জন্য সেখানে তাই আছে যা তোমরা পছন্দ করো। তোমাদের সাথে কি আমার কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ এমন কোন চুক্তি আছে যে, তোমরা নিজের জন্য যা চাইবে সেখানে তাই পাবে? তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখো এ ব্যাপারে কে দায়িত্বশীল[২২]? কিংবা তাদের স্বনিয়োজিত কিছু অংশীদার আছে কি (যারা এ বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে)? তারা তাদের সেসব অংশীদারদের নিয়ে আসুক। যদি তারা সত্যবাদী[২৩] হয়ে থাকে।

১৬. অর্থাৎ বাগান দেখে প্রথমে তারা বিশ্বাসই করতে পারেনি যে, সেটিই তাদের বাগান। তাই তারা বলেছে, আমরা পথ ভুলে হয়তো অন্য কোথাও এসে পৌঁছেছি। পরে চিন্তা করে যখন তারা বুঝতে পারলো সেটি তাদের নিজেদেরই বাগান তখন চিৎকার করে বলে উঠলো ঃ আমাদের কপাল পুড়ে গেছে!

১৭. এর মানে যখন তারা শপথ করে বলছিলো যে, আগামী দিন আমরা অবশ্যই বাগানের ফল আহরণ করবো তখন এ ব্যক্তি তাদেরকে সাবধান করে দিয়েছিলো। সে বলেছিলো, তোমরা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছো। তোমরা ইনশাআল্লাহ বলছো না কেন? কিন্তু তারা সে কথায় কর্ণপাতও করলো না। পুনরায় যখন তারা দুস্থ ও অসহায়দের কিছু না দেয়ার জন্য সলাপরামর্শ করছিলো তখনো সে তাদেরকে উপদেশ দিয়ে বললো ঃ আল্লাহর কথা স্মরণ করো এবং এ খারাপ মনোভাব পরিত্যাগ করো। কিন্তু তারা তাদের সিদ্ধান্তে অটল রইলো।

১৮. অর্থাৎ তারা একে অপরকে এই বলে দোষারোপ করতে শুরু করলো, আমরা অমুকের প্ররোচনায় আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিলাম এবং এ কুমতলব এঁটেছিলাম।

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٢﴾ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ﴿٤٣﴾ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿٤٥﴾

যেদিন কঠিন সময় এসে পড়বে[২৪] এবং সিজদা করার জন্য লোকদেরকে ডাকা হবে। কিন্তু তারা সিজদা করতে সক্ষম হবে না। তাদের দৃষ্টি হবে অবনত। হীনতা ও অপমানবোধ তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। এর আগে যখন তারা সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলো তখন সিজদার জন্য তাদেরকে ডাকা হতো (কিন্তু তারা অস্বীকৃতি জানাতো)।[২৫]

তাই হে নবী! এ বাণী অস্বীকারকারীদের ব্যাপারটি আমার ওপর ছেড়ে দাও।[২৬] আমি ধীরে ধীরে এমনভাবে তাদেরকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবো যে, তারা বুঝতেই পারবে না।[২৭] আমি এদের রশি ঢিলে করে দিচ্ছি। আমার কৌশল[২৮] অত্যন্ত মজবুত।

১৯. মক্কার বড় বড় নেতারা মুসলমানদের বলতো, আমরা দুনিয়াতে যেসব নিয়ামত লাভ করছি তা প্রমাণ করে যে, আমরা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয়। আর তোমরা যে দুর্দশার মধ্যে ডুবে আছো তা প্রমাণ করে যে, তোমরা আল্লাহর কাছে অভিশপ্ত। তোমাদের বক্তব্য অনুসারে আখেরাত যদি হয়ও তাহলে সেখানেও মজা লুটবো আমরা। আযাব ভোগ করলে তোমরা করবে, আমরা নই। এ আয়াতগুলোতে একথারই জবাব দেয়া হয়েছে।

২০. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা অনুগত ও অপরাধীর মধ্যে কোন পার্থক্য করবেন না, এটা বিবেক-বুদ্ধির পরিপন্থী। বিশাল বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা এমন বিচার-বুদ্ধিহীন হবেন, এটা তোমরা ধারণা করলে কিভাবে? তোমরা মনে করে নিয়েছো, এ পৃথিবীতে কারা তাঁর হুকুম-আহকাম ও বিধি-বিধান মেনে চললো এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকলো আর কারা তার তোয়াক্কা না করে সব রকমের গোনাহ, অপরাধ এবং জুলুম-অত্যাচার চালালো তা তিনি দেখবেন না। তোমরা ঈমানদারদের দুর্দশা ও দূরবস্থা এবং নিজেদের স্বাচ্ছন্দ ও সচ্ছলতা দেখতে পেয়েছো ঠিকই কিন্তু নিজেদের এবং তাদের নৈতিক চরিত্র ও কাজ-কর্মের পার্থক্য তোমাদের নজরে পড়েনি। তাই আগাম বলে দিয়েছো যে, আল্লাহর দরবারেও এসব অনুগতদের সাথে অপরাধীদের ন্যায় আচরণ করা হবে। কিন্তু তোমাদের মত পাপীদের দেয়া হবে জান্নাত।

২১. অর্থাৎ আল্লাহর পাঠানো কিতাব।

২২. মূল আয়াতে زَعِيْمٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় زعيم বলা হয় এমন ব্যক্তিকে যে কোন বিষয়ের দায়িত্বশীল কিংবা কোন গোষ্ঠী বা দলের মুখপাত্র। কথাটার মানে হলো, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কি এমন দাবী করে যে, সে তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট থেকে এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছে?

২৩. অর্থাৎ নিজেদের সম্পর্কে তোমরা যা বলছো তার কোন ভিত্তি নেই। এটা বিবেক–বুদ্ধিরও পরিপন্থী। আল্লাহর কোন কিতাবে এরূপ লেখা আছে বলেও তোমরা দেখাতে পারবে না। তোমাদের মধ্য থেকে কেউ এরূপ দাবীও করতে পারে না। এ মর্মে আল্লাহর নিকট থেকে কোন রকম প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে বলেও তোমাদের মধ্য থেকে কেউ দাবী করতে পারে না। কিংবা তোমরা যাদেরকে উপাস্য বানিয়ে রেখেছো তাদের কাউকে দিয়ে একথাও তোমরা বলাতে পারবে না যে, সে আল্লাহর নিকট থেকে তোমাদেরকে জান্নাত দেয়ার দায়িত্ব ও ক্ষমতা লাভ করেছে। এসব সত্ত্বেও তোমরা কি করে এ ভ্রান্ত ধারণার শিকার হলে?

২৪. মূল আয়াতে আছে يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ "যেদিন পায়ের গোছা অনাবৃত করা হবে।" সাহাবা ও তাবেয়ীগণের এক দলের মতে একথাটি প্রচলিত প্রবাদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী প্রবাদে দুর্দিনের আগমনকে "পায়ের গোছা অনাবৃত করা" বলে বুঝানো হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসও কথাটির একই অর্থ বর্ণনা করেছেন। আরবী ভাষা থেকে তিনি এর স্বপক্ষে প্রমাণও পেশ করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং রাবী ইবনে আনাস থেকে বর্ণিত অপর একটি ব্যাখ্যায় 'পায়ের গোছা অনাবৃত' করার অর্থ করা হয়েছে সত্যকে আবরণ মুক্ত করা। এ ব্যাখ্যা অনুসারে অর্থ হবে, যেদিন সব সত্য উন্মুক্ত হবে এবং মানুষের সব কাজ কর্ম স্পষ্ট হয়ে সামনে আসবে।

২৫. এর মানে হলো দুনিয়াতে কে আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করতো আর কে তার বিরোধী ছিলো কিয়ামতের দিন প্রকাশ্যে তা দেখানো হবে। এ উদ্দেশ্যে লোকদেরকে আল্লাহ তা'আলার সামনে সিজদাবনত হওয়ার আহবান জানানো হবে। যারা দুনিয়াতে আল্লাহর ইবাদাত করতো তারা সাথে সাথে সিজদায় পড়ে যাবে। কিন্তু দুনিয়াতে যারা আল্লাহকে সিজদা করেনি তাদের কোমর শক্ত ও অনমনীয় হয়ে যাবে। তাদের পক্ষে ইবাদাতগুজার বান্দা হওয়ার মিথ্যা প্রদর্শনী করা সম্ভব হবে না। তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।

২৬. অর্থাৎ তাদের সাথে বুঝাপড়া করার চিন্তা করো না। তাদের সাথে বুঝাপড়া করা আমার কাজ।

২৭. অজ্ঞাতসারে কাউকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়ার পন্থা হলো ন্যায় ও সত্যের দুশমন এবং জালেমকে এ পৃথিবীতে অধিক পরিমাণে বিলাস সামগ্রী, স্বাস্থ্য, অর্থ–সম্পদ, সন্তান–সন্তুতি ও পার্থিব সাফল্য দান করা যাতে সে ধোঁকায় পড়ে যায় এবং মনে করে বসে যে, সে যা করছে ঠিকই করছে। তার কাজে কোন ত্রুটি–বিচ্যুতি নেই। এভাবে সে ন্যায় ও সত্যের সাথে শত্রুতা এবং জুলুম–অত্যাচার ও সীমালংঘনের কাজে অধিক মাত্রায় মেতে ওঠে এবং বুঝেই উঠতে পারে না যে, যেসব নিয়ামত সে লাভ করছে তা পুরস্কার নয়, বরং ধ্বংসের উপকরণ মাত্র।

أَمْ تَسْـَٔلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ﴿٤٦﴾ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿٤٧﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿٤٨﴾ لَّوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿٤٩﴾ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٥٠﴾ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿٥١﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٥٢﴾

তুমি কি এদের কাছে কোন পারিশ্রমিক দাবী করছো যে, সে জরিমানার বোঝা তাদের কাছে দুর্বহ হয়ে পড়েছে?[২৯] তাদের কি গায়েবের বিষয় জানা আছে, যা তারা লিখে রাখছে?[৩০] অতএব তোমার রবের চূড়ান্ত ফায়সালা পর্যন্ত ধৈর্যসহ অপেক্ষা করো[৩১] এবং মাছওয়ালার (ইউনুস আলাইহিস সালাম) মতো[৩২] হয়ো না, যখন সে বিষাদ ভারাক্রান্ত[৩৩] হয়ে ডেকেছিলো। তার রবের অনুগ্রহ যদি তার সহায়ক না হতো তাহলে সে অপমানিত হয়ে খোলা প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হতো।[৩৪] অবশেষে তার রব তাকে বেছে নিলেন এবং নেক বান্দাদের অন্তরভুক্ত করলেন।

এ কাফেররা যখন উপদেশবাণী (কুরআন) শোনে তখন এমনভাবে তোমার দিকে তাকায় যেন তোমার পদযুগল উৎপাটিত করে ফেলবে[৩৫] আর বলে যে, এ তো অবশ্যি পাগল। অথচ তা সারা বিশ্ব-জাহানের জন্য উপদেশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

২৮. আয়াতে كَيْدِ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হলো কারো বিরুদ্ধে গোপনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। কাউকে অন্যায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে এরূপ করা হলে তা খুব খারাপ কাজ। অন্যথায় এরূপ কাজে কোন দোষ নেই। বিশেষ করে কোন ব্যক্তি যদি নিজেই নিজের বিরুদ্ধে এরূপ করার বৈধতা সৃষ্টি করে নিজেকে এর উপযুক্ত বানিয়ে নেয়।

২৯. এখানে দৃশ্যত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করা হচ্ছে। তবে মূল লক্ষ সেসব লোক যারা তাঁর বিরোধিতার ক্ষেত্রে সীমালংঘন করছিলো। তাদেরকে বলা হচ্ছেঃ আমার রসূল কি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক দাবী করছেন যে কারণে তোমরা এতটা বিগড়ে গিয়েছো? তোমরা জানো, তিনি একজন নিস্বার্থ ব্যক্তি। তিনি তোমাদের কাছে যা পেশ করছেন তাতে তোমাদের জন্য কল্যাণ আছে বলে তিনি মনে করেন। আর এ জন্য তিনি তা পেশ করছেন। তোমরা না চাইলে তা মানবে না। কিন্তু এর প্রচার ও তাবলীগের ব্যাপারে এতটা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছো কেন? (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা তূর, টীকা ৩১)

৩০. এ প্রশ্নটিও বাহ্যত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে করা হয়েছে। কিন্তু আসলে প্রশ্নটি তাঁর বিরোধীদের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। এর অর্থ হলো, তোমরা কি গায়েবের পর্দার অন্তরালে উঁকি দিয়ে দেখে নিয়েছো যে, প্রকৃতপক্ষে তিনি আল্লাহর প্রেরিত রসূল নন। আর যেসব সত্য তিনি তোমাদের কাছে বর্ণনা করছেন তাও ঠিক নয়। তাই তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য তোমরা এমন কোমর বেঁধে লেগেছো? (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, সূরা তূরের তাফসীর, টীকা ৩২)

৩১. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তোমাদের বিজয় ও সাহায্য দেয়া এবং তোমাদের এসব বিরোধীদের পরাজিত করার চূড়ান্ত ফায়সালার সময় এখনও বহু দূরে। চূড়ান্ত ফায়সালার সে সময়টি আমার পূর্ব পর্যন্ত এ দীনের তাবলীগ ও প্রচারের পথে যত দুঃখ–কষ্ট ও মুসিবত আসবে তা ধৈর্যের সাথে বরদাশত করতে থাকো।

৩২. অর্থাৎ ইউনুস আলাইহিস সালামের মত অধৈর্য হয়ে পড়ো না। অধৈর্য হয়ে পড়ার কারণে তাকে মাছের পেটে যেতে হয়েছিলো। আল্লাহর চূড়ান্ত ফায়সালা না আসা পর্যন্ত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়ার পরক্ষণেই "ইউনুস আলাইহিস সালামের মত হয়ো না" বলা থেকে স্বতই ইংগিত পাওয়া যায় যে, আল্লাহর চূড়ান্ত ফায়সালা আসার আগেই তিনি অধৈর্য হয়ে কোন কাজ করে ফেলেছিলেন এবং এভাবে আল্লাহর অসন্তুষ্টি লাভ করেছিলেন। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইউনুস, আয়াত ৯৮, টীকা ৯৯; সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত ৮৭–৮৮, টীকা ৮২ থেকে ৮৫; সূরা আস সাফ্ফাত, আয়াত ১৩৯ থেকে ১৪৮, টীকা ৭৮ থেকে ৮৫।

৩৩. সূরা আম্বিয়াতে এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, মাছের পেটের এবং সাগরের পানির অন্ধকারে হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম উচ্চস্বরে এ বলে প্রার্থনা করলেন ঃ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ তোমার পবিত্র সত্তা ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আসলে আমিই অপরাধী"। আল্লাহ তা'আলা তাঁর ফরিয়াদ গ্রহণ করলেন এবং তাকে এ দুঃখ ও মুসিবত থেকে মুক্তি দান করলেন। (আয়াত ৮৭–৮৮)

৩৪. এ আয়াতটিকে সূরা সাফ্ফাতের ১৪২ থেকে ১৪৬ পর্যন্ত আয়াতগুলোর পাশাপাশি রেখে পড়লে দেখা যাবে যে, যে সময় হযরত ইউনুস মাছের পেটে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন তখন তিনি তিরস্কারের পাত্র ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি আল্লাহর তাসবীহ করলেন এবং নিজের অপরাধ স্বীকার করলেন তখন তাঁকে মাছের পেট থেকে বের করে অসুস্থ অবস্থায় একটি উন্মুক্ত ভূখণ্ডের ওপর নিক্ষেপ করা হলো। কিন্তু সে মুহূর্তে তিনি আর তিরস্কারের পাত্র নন। মহান আল্লাহ তাঁর রহমতে সে জায়গায় একটি লতানো গাছ উৎপন্ন করে দিলেন, যাতে এ গাছের পাতা তাকে ছায়াদান করতে পারে এবং এর ফল খেয়ে তিনি ক্ষুধা ও পিপাসা নিবৃত করতে পারেন।

৩৫. আমরা বলে থাকি, অমুক ব্যক্তি তার প্রতি এমনভাবে তাকালো যেন তাকে খেয়ে ফেলবে। একথাটিও ঠিক সেরকম। মক্কার কাফেরদের ক্রোধ ও আক্রোশের এ অবস্থা সূরা বনী ইসরাঈলের ৭৩ তেকে ৭৭ পর্যন্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

আল হাক্‌কাহ

৬৯

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দটিকেই এর নাম হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরাটিও মক্কী জীবনের প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ সূরাসমূহের একটি। এর বিষয়বস্তু থেকে বুঝা যায়, সূরাটি যে সময় নাযিল হয়েছিলো তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা শুরু হয়েছিলো ঠিকই কিন্তু তখনো তা তেমন তীব্র হয়ে ওঠেনি। মুসনাদে আহমাদ হাদীস গ্রন্থে হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন : ইসলাম গ্রহণের পূর্বে একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে আমি বাড়ি থেকে বের হলাম। কিন্তু আমার আগেই তিনি মসজিদে হারামে পৌছে গিয়েছিলেন। আমি সেখানে পৌছে দেখলাম তিনি নামাযে সূরা আল হাক্‌কাহ পড়ছেন। আমি তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে গেলাম, শুনতে থাকলাম। কুরআনের বাচনভঙ্গি আমাকে বিস্ময়ে অভিভূত করে ফেলেছিল। সহসা আমার মন বলে উঠলো, লোকটি নিশ্চয়ই কবি হবে। কুরাইশরাও তো তাই বলে। সে মুহূর্তেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে একথাগুলো উচ্চারিত হলো : "এ একজন সম্মানিত রসূলের বাণী। কোন কবির কাব্য নয়।" আমি মনে মনে বললাম : কবি না হলে গণক হবেন। তখনই পবিত্র মুখে উচ্চারিত হলো : "এ কোন গণকের কথাও নয়। তোমরা খুব কমই চিন্তা-ভাবনা করে থাকো। একথা তো বিশ্ব-জাহানের রব বা পালনকর্তার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।" এসব কথা শোনার পর ইসলাম আমার মনের গভীরে প্রভাব বিস্তার করে বসলো। হযরত উমরের (রা) এ বর্ণনা থেকে জানা যায়, সূরাটি তাঁর ইসলাম গ্রহণের অনেক আগে নাযিল হয়েছিলো। কারণ এ ঘটনার পর বেশ কিছুকাল পর্যন্ত তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। তবে বিভিন্ন সময়ের কিছু ঘটনা তাঁকে ক্রমান্বয়ে ইসলামের প্রতি আগ্রহী করে তুলছিলো। অবশেষে তাঁর মনের ওপর চূড়ান্ত আঘাত পড়ে তাঁর আপন বোনের বাড়ীতে। আর এ ঘটনাই তাঁকে ঈমানের মনযিলে পৌছিয়ে দেয়। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা মারয়ামের ভূমিকা; সূরা ওয়াকিয়ার ভূমিকা)

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

সূরাটির প্রথম রুকূ'তে আখেরাত সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় রুকূ'তে কুরআনের আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে, আল্লাহর রসূল তার সত্যতা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

কিয়ামত ও আখেরাতের কথা দিয়ে প্রথম রুকূ' শুরু হয়েছে। কিয়ামত ও আখেরাত এমন একটি সত্য যা অবশ্যই সংঘটিত হবে। আয়াত ৪ থেকে ১২তে বলা হয়েছে যে, যেসব জাতি আখেরাত অস্বীকার করেছে শেষ পর্যন্ত তারা আল্লাহর আযাবের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছে। অতপর ১৭ আয়াত পর্যন্ত কিয়ামত কিভাবে সংঘটিত হবে তার চিত্র পেশ করা হয়েছে। যে উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ দুনিয়ার বর্তমান জীবন শেষ হওয়ার পর মানুষের জন্য আরেকটি জীবনের ব্যবস্থা করেছেন ১৮ থেকে ২৭ আয়াতে সে মূল উদ্দেশ্যটি বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সেদিন সব মানুষ তার রবের আদালতে হাজির হবে। সেখানে তাদের কোন বিষয়ই গোপন থাকবে না। প্রত্যেকের আমলনামা তার নিজের হাতে দিয়ে দেয়া হবে। পৃথিবীতে যারা এ উপলব্ধি ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে জীবন যাপন করেছিলো যে, একদিন তাদেরকে আল্লাহর কাছে নিজ নিজ কাজের হিসেব দিতে হবে, যারা দুনিয়ার জীবনে নেকী ও কল্যাণের কাজ করে আখেরাতে কল্যাণলাভের জন্য অগ্রীম ব্যবস্থা করে রেখেছিলো তারা সেদিন নিজের হিসেব পরিষ্কার ও নিরঝঞ্ঝাট দেখে আনন্দিত হবে। পক্ষান্তরে যেসব লোক আল্লাহ তা'আলার হকেরও পরোয়া করেনি, বান্দার হকও আদায় করেনি, তাদেরকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা করার মত কেউ থাকবে না। তারা জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে থাকবে।

দ্বিতীয় রুকূ'তে মক্কার কাফেরদেরকে বলা হয়েছে। এ কুরআনকে তোমরা কবির কাব্য ও গণকের গণনা বলে আখ্যায়িত করছো। অথচ তা আল্লাহর নাযিলকৃত বাণী। তা উচ্চারিত হচ্ছে একজন সম্মানিত রসূলের মুখ থেকে। এ বাণীর মধ্যে নিজের পক্ষ থেকে একটি শব্দও হ্রাস বা বৃদ্ধি করার ইখতিয়ার রসূলের নেই। তিনি যদি এর মধ্যে তাঁর মনগড়া কোন কথা শামিল করে দেন তাহলে আমি তার ঘাড়ের শিরা (অথবা হৃদপিণ্ডের শিরা) কেটে দেবো। এ একটি নিশ্চিত সত্য বাণী। যারাই এ বাণীকে মিথ্যা বলবে শেষ পর্যন্ত তাদের অনুশোচনা করতে হবে।

اَلْحَاقَّةُ ۝١ مَا الْحَاقَّةُ ۝٢ وَمَا أَدْرٰكَ مَا الْحَاقَّةُ ۝٣ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ۝٤ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ۝٥ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۝٦ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعٰى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۝٧ فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ ۝٨ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكٰتُ بِالْخَاطِئَةِ ۝٩ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً ۝١٠

অবশ্যম্ভাবী ঘটনাটি[১]। কি সে অবশ্যম্ভাবী ঘটনাটি? তুমি কি জান সে অবশ্যম্ভাবী ঘটনাটি কি?[২] সামূদ[৩] ও আদ আকস্মিকভাবে সংঘটিতব্য সে মহা ঘটনাকে[৪] অস্বীকার করেছিলো তাই সামূদকে একটি কঠিন মহা বিপদ[৫] দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। আর আদকে কঠিন ঝঞ্ঝাবাত্যা দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। যা তিনি সাত রাত ও আট দিন ধরে বিরামহীনভাবে তাদের ওপর চাপিয়ে রেখেছিলেন। (তুমি সেখানে থাকলে) দেখতে পেতে তারা ভূলুন্ঠিত হয়ে পড়ে আছে। যেন খেজুরের পুরনো কাণ্ড। তুমি তাদের কাউকে অবশিষ্ট দেখতে পাচ্ছো কি? ফেরাউন, তার পূর্ববর্তী লোকেরা এবং উলটপালট হয়ে যাওয়া জনপদসমূহও[৬] একই মহা অপরাধে অপরাধী হয়েছিলো। তারা সবাই তাদের রবের প্রেরিত রসূলের কথা অমান্য করেছিল। তাই তিনি তাদের অত্যন্ত কঠোরভাবে পাকড়াও করেছিলেন।

১. মূল আয়াতে اَلْحَاقَّةُ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ এমন ঘটনা যা অবশ্যই সংঘটিত হবে। যার সংঘটিত হওয়া একান্ত বাস্তব, যার সংঘটিত হওয়ায় কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কিয়ামতের জন্য এ ধরনের শব্দ ব্যবহার এবং তা দিয়ে বক্তব্য শুরু করা প্রমাণ করে যে, এ বক্তব্য এমন লোকদের উদ্দেশ করে পেশ করা হয়েছে যারা

إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ﴿١١﴾ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ ﴿١٢﴾ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٣﴾ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ﴿١٤﴾ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١٥﴾ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ﴿١٦﴾ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا ۚ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ ﴿١٧﴾ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴿١٨﴾

যে সময় পানির তুফান সীমা অতিক্রম করলো[৭] তখন আমি তোমাদেরকে জাহাজে সওয়ার করিয়েছিলাম[৮] যাতে এ ঘটনাকে আমি তোমাদের জন্য একটি শিক্ষণীয় স্মৃতি বানিয়ে দেই যেন স্মরণকারী কান তা সংরক্ষণ করে[৯]।

অতপর[১০] যে সময় শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে—একটি মাত্র ফুৎকার। আর পাহাড়সহ পৃথিবীকে উঠিয়ে একটি আঘাতেই চূর্ণ–বিচূর্ণ করে দেয়া হবে। সেদিন সে মহা ঘটনা সংঘটিত হয়ে যাবে। সেদিন আসমান চৌচির হয়ে যাবে এবং তার বন্ধন শিথিল হয়ে পড়বে। ফেরেশতারা এর প্রান্ত সীমায় অবস্থান করবে। সেদিন আটজন ফেরেশতা তাদের ওপরে তোমার রবের আরশ বহন করবে।[১১] সেদিনটিতে তোমাদেরকে পেশ করা হবে। তোমাদের কোন গোপনীয় বিষয়ই আর সেদিন গোপন থাকবে না।

কিয়ামতের আগমনকে অস্বীকার করছিলো। তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে, যে বিষয়কে তোমরা অস্বীকার করছো তা অবশ্যম্ভাবী। তোমরা অস্বীকার করলেই তার আগমন ঠেকে থাকবে না।

২. শ্রোতাদেরকে সজাগ ও সতর্ক করে দেয়ার জন্য পরপর দু'টি প্রশ্ন করা হয়েছে। যাতে তারা বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে এবং পূর্ণ মনোযোগ সহকারে পরবর্তী বক্তব্য শ্রবণ করে।

৩. মক্কার কাফেররা যেহেতু কিয়ামতকে অস্বীকার করছিলো এবং তা সংঘটিত হওয়ার বিষয়টিকে একটি তামাশা বলে মনে করছিলো, তাই প্রথমে তাদেরকে এ মর্মে সাবধান করা হয়েছে যে, কিয়ামত একটি অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। তোমরা বিশ্বাস করো আর নাই করো তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। একথা বলার পর তাদের বলা হচ্ছে, এ বিষয়টি এতটা সাদামাটা বিষয় নয় যে, কেউ একটি সম্ভাব্য ঘটনার খবরকে মেনে নিচ্ছে কিংবা মেনে নিচ্ছে না। বরং জাতিসমূহের নৈতিক চরিত্র এবং তাদের ভবিষ্যতের সাথে এর অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। তোমাদের পূর্বের জাতিগুলোর ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যে

জাতিই আখেরাতকে অস্বীকার করেছে এবং এ দুনিয়ার জীবনকে প্রকৃত জীবন বলে মনে করেছে পরিশেষে আল্লাহর আদালতে হাজির হয়ে নিজের কৃতকর্মের হিসেব দেয়ার বিষয়টি মিথ্যা বলে মনে করেছে সেসব জাতিই মারাত্মক নৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে পতিত হয়েছে। অবশেষে আল্লাহর আযাব এসে তাদের অস্তিত্ব থেকে দুনিয়াকে পবিত্র করে দিয়েছে।

৪. মূল শব্দ হলো الْقَارِعَة । قرع শব্দটি আরবী ভাষায় খট্‌খট্‌ শব্দ করা, হাতুড়ি পিটিয়ে শব্দ করা, কড়া নেড়ে শব্দ করা এবং একটি জিনিসকে আরেকটি জিনিস দিয়ে আঘাত করা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। কিয়ামতের ভয়াবহতা সম্পর্কে ধারণা দেয়ার জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

৫. সূরা আ'রাফের ৭৮ আয়াতে একে الرَّجْفَة (প্রচণ্ড ভূমিকম্প) বলা হয়েছে। সূরা হুদের ৬৭ আয়াতে এ জন্য الصَّيْحَة (প্রচণ্ড বিস্ফোরণ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সূরা হা–মীম আস্ সাজদার ১৭ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাদেরকে صَاعِقَةُ الْعَذَابِ (আযাবের বজ্র ধ্বনি) এসে পাকড়াও করলো। এখানে সে একই আযাবকে الطَّاغِيَة (অতিশয় কঠিন দুর্ঘটনা) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি একই ঘটনার বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনা মাত্র।

৬. অর্থাৎ লূতের কওমের জনবসতিসমূহ। এসব জনবসতি সম্পর্কে সূরা হুদ (৮২ আয়াত) এবং সূরা হিজরে (৭৪ আয়াত) বলা হয়েছে, আমি ঐগুলোকে ওলটপালট করে দিলাম।

৭. নূহের সময়ের মহা প্লাবনের কথা বলা হয়েছে। এ মহা প্লাবনে গোটা একটা জাতিকে এ একই মহা অপরাধের কারণে ডুবিয়ে ধ্বংস করা হয়েছিল। শুধু তারাই বেঁচে ছিল যারা আল্লাহর রসূলের কথা মেনে নিয়েছিলো।

৮. যেসব লোককে জাহাজে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিলো তারা হাজার হাজার বছর পূর্বে অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। পরবর্তীকালের গোটা মানব গোষ্ঠী যেহেতু এ মহা প্লাবন থেকে রক্ষা পাওয়া লোকদের সন্তান–সন্ততি, তাই বলা হয়েছে ঃ আমি তোমাদেরকে জাহাজে উঠিয়ে নিয়েছিলাম। অর্থাৎ আজ তোমরা পৃথিবীতে এ কারণে বিচরণ করতে পারছো যে, মহান আল্লাহ ঐ মহা প্লাবন দ্বারা শুধু কাফেরদের ডুবিয়ে মেরেছিলেন এবং ঈমানদারদের তা থেকে রক্ষা করেছিলেন।

৯. অর্থাৎ এমন কান নয় যা শুনেও শোনে না এবং যে কানের পর্দা স্পর্শ করেই শব্দ অন্যত্র সরে যায়। বরং এমন কান যা শোনে এবং কথাকে মনের গভীরে প্রবিষ্ট করিয়ে দেয়। বাহ্যত এখানে কান শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু অর্থ হলো শ্রবণকারী মানুষ যারা এ ঘটনা শুনে তা মনে রাখে, তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে অতপর আখেরাতকে অস্বীকার এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পরিণাম কত ভয়াবহ তা কখনো ভুলে যায় না।

১০. পরবর্তী আয়াত পড়ার সময় এ বিষয়টি দৃষ্টিতে থাকা দরকার যে, কিয়ামতের তিনটি পর্যায় আছে। এ তিনটি পর্যায়ের ঘটনাবলী একের পর এক বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত

হবে। কুরআন মজীদের কোন কোন জায়গায় এ তিনটি পর্যায় আলাদাভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আবার কোন কোন জায়গায় প্রথম পর্যায় থেকে শেষ পর্যায় পর্যন্ত একসাথে বর্ণনা করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে সূরা নামলের ৮৭নং আয়াতের উল্লেখ করা যায়। এ আয়াতটিতে প্রথমবার শিংগায় ফুৎকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যখন সারা পৃথিবীর মানুষ একটি ভয়ানক বিকট শব্দে এক সাথে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। সেই সময় গোটা বিশ্ব–জাহানের লণ্ডভণ্ড হয়ে যাওয়ার যে অবস্থা সূরা হজ্জের ১ ও ২ আয়াতে, সূরা ইয়াসীনের ৪৯ ও ৫০ আয়াতে এবং সূরা তাকবীরের ১ থেকে ৬ পর্যন্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে তা তাদের চোখের সামনে ঘটতে থাকবে। সূরা যুমারের ৬৭ থেকে ৭০ আয়াতে শিংগায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় ফুৎকারের কথা বলা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, একবারের ফুৎকারে সব মানুষ মৃত্যু মুখে পতিত হবে। কিন্তু এরপর আবার শিংগায় ফুৎকার দিলে সব মানুষ জীবিত হয়ে যাবে এবং আল্লাহর আদালতে বিচারের সম্মুখীন হবে। সূরা ত্বা–হার ১০২ থেকে ১১২ আয়াত, সূরা আম্বিয়ার ১০১ থেকে ১০৩ আয়াত, সূরা ইয়াসীনের ৫১ থেকে ৫৩ আয়াত এবং সূরা ক্বাফের ২০ থেকে ২২ আয়াতে শুধু শিংগায় তৃতীয়বারের ফুৎকারের কথা উল্লেখিত হয়েছে। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ত্বা–হা, টীকা ৭৮; সূরা হজ্জ, টীকা ১ এবং সূরা ইয়াসীন, টীকা ৪৬ ও ৪৭) কিন্তু কুরআন মজীদের এ জায়গায় এবং অন্য আরো অনেক জায়গায় শিংগায় প্রথম ফুৎকার থেকে শুরু করে মানুষের জান্নাত ও জাহান্নামে প্রবেশ করা পর্যন্ত কিয়ামতের সমস্ত ঘটনাবলী একই সাথে বর্ণনা করা হয়েছে।

১১. এ আয়াতটি 'মুতাশাবেহাত' আয়াত শ্রেণীর অন্তরভুক্ত। এর নির্দিষ্ট কোন অর্থ বলা কঠিন। আরশ কি বস্তু আমরা জানি না। কিয়ামতের দিন আটজন ফেরেশতার আরশ বহন করার ধরন কি হবে তাও আমরা বুঝি না। তবে কোন অবস্থায়ই এ ধারণা করা যাবে না যে, আল্লাহ তা'আলা আরশের ওপর উপবিষ্ট থাকবেন আর আটজন ফেরেশতা তাঁকে সহ আরশ বহন করবে। সেই সময় আল্লাহ আরশের ওপর উপবিষ্ট থাকবেন, এমন কথা আয়াতেও বলা হয়নি। মহান আল্লাহ দেহসত্তাহীন এবং দিক ও স্থানের গণ্ডি থেকে মুক্ত। এমন এক সত্তা কোন স্থানে অধিষ্ঠিত থাকবেন আর কোন মাখলুক তাকে বহন করবে এটা ভাবা যায় না। আল্লাহর মহান সত্তা সম্পর্কে কুরআন মজীদের দেয়া ধারণা আমাদেরকে এরূপ কল্পনা করতে বাধা দেয়। এ জন্য খুঁজে খুঁজে এর অর্থ বের করার প্রচেষ্টা চালানো নিজেকে গোমরাহী ও বিভ্রান্তির গহবরে নিক্ষেপ করার শামিল। তবে এ বিষয়টি বুঝা দরকার যে, আল্লাহ তা'আলার শাসন ও শাসন কর্তৃত্ব এবং তাঁর যাবতীয় বিষয়ের একটা ধারণা দেয়ার জন্য কুরআন মজীদে আমাদের জন্য এমন একটি চিত্র পেশ করা হয়েছে যা দুনিয়ার কোন বাদশার বাদশাহীর চিত্রের অনুরূপ। মানুষের ভাষায় রাষ্ট্র ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির জন্য যে পরিভাষা ব্যবহার করা হয় এ জন্য অনুরূপ পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, মানুষের বুদ্ধি–বিবেক এরূপ চিত্র এবং পরিভাষার সাহায্যেই গোটা বিশ্ব–সাম্রাজ্যের বিভিন্ন বিষয় কিছুটা উপলব্ধি করতে সক্ষম। বিশ্ব–জাহানের ইলাহী ব্যবস্থাপনাকে মানুষের বোধগম্যতার সীমায় নিয়ে আসাই এ ধরনের বর্ণনাভঙ্গী গ্রহণের উদ্দেশ্য। তাই এর আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করা ঠিক নয়।

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُوا۟ كِتَٰبِيَهْ ﴿١٩﴾ إِنِّى ظَنَنتُ أَنِّى مُلَٰقٍ حِسَابِيَهْ ﴿٢٠﴾ فَهُوَ فِى عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٢١﴾ فِى جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿٢٢﴾ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٢٣﴾ كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔۢا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِى ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِشِمَالِهِۦ فَيَقُولُ يَٰلَيْتَنِى لَمْ أُوتَ كِتَٰبِيَهْ ﴿٢٥﴾ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ﴿٢٦﴾ يَٰلَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ﴿٢٧﴾

সে সময় যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে,[১২] সে বলবে ঃ নাও, আমার আমলনামা পড়ে দেখো।[১৩] আমি জানতাম, আমাকে হিসেবের সম্মুখীন হতে হবে।[১৪] তাই সে মনের মত আরাম আয়েশের মধ্যে থাকবে। উন্নত মর্যাদার জান্নাতে। যার ফলের গুচ্ছসমূহ নাগালের সীমায় অবনমিত হয়ে থাকবে। (এসব লোকদেরকে বলা হবে ঃ) অতীত দিনগুলোতে তোমরা যা করে এসেছো তার বিনিময়ে তোমরা তৃপ্তির সাথে খাও এবং পান করো। আর যার আমলনামা তার বাঁ হাতে দেয়া হবে[১৫], সে বলবেঃ হায়! আমার আমলনামা যদি আমাকে আদৌ দেয়া না হতো[১৬] এবং আমার হিসেব যদি আমি আদৌ না জানতাম[১৭] তাহলে কতই না ভালো হতো। হায়! আমার সেই মৃত্যুই (যা দুনিয়াতে এসেছিলো) যদি চূড়ান্ত হতো।[১৮]

১২. ডান হাতে আমলনামা দেয়ার অর্থই হবে তার হিসেব-নিকেশ অত্যন্ত পরিষ্কার। আর সে আল্লাহ তা'আলার আদালতে অপরাধী হিসেবে নয়, বরং একজন সৎ ও সত্যনিষ্ঠ মানুষ হিসেবে উপস্থিত হতে যাচ্ছে। অধিকতর সম্ভাবনা হলো, আমলনামা দেয়ার সময়ই সৎ ও সত্যনিষ্ঠ মানুষগুলো নিজেরাই ডান হাত বাড়িয়ে আমলনামা গ্রহণ করবে। কারণ মৃত্যুর সময় থেকে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হওয়ার সময় পর্যন্ত তার সাথে যে আচরণ করা হবে তাতে তার মনে এতটা আস্থা ও প্রশান্তি থাকবে যে, সে মনে করবে আমাকে এখানে পুরস্কার প্রদানের জন্য হাজির করা হচ্ছে, শাস্তিদানের জন্য নয়। একজন মানুষ সৎ ও সত্যনিষ্ঠ মানুষ হিসেবে পরপারে যাত্রা করছে, না অসৎ ও পাপী হিসেবে যাত্রা করছে মৃত্যুর সময় থেকেই তা তার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। একথাটি কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। তাছাড়া মৃত্যুর সময় থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত একজন নেক্‌কার মানুষের সাথে সম্মানিত মেহমানের মত আচরণ করা হয়। কিন্তু একজন অসৎ ও বদকার মানুষের সাথে আচরণ করা হয় অপরাধে অভিযুক্ত কয়েদীর মত। এরপর কিয়ামতের দিন আখেরাতের জীবনের সূচনালগ্ন থেকেই নেক্‌কার মানুষদের জীবন যাপনের ধরন-ধারণই পাল্টে যায়। একইভাবে কাফের, মুনাফিক ও

مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ ۜ ﴿٢٨﴾ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ ﴿٢٩﴾ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴿٣١﴾ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴿٣٢﴾ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ﴿٣٣﴾ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣٤﴾ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ ﴿٣٥﴾ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ﴿٣٦﴾ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ﴿٣٧﴾

আজ আমার অর্থ-সম্পদ কোন কাজে আসলো না। আমার সব ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে।[১৯] (আদেশ দেয়া হবে) পাকড়াও করো ওকে আর ওর গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও। তারপর জাহান্নামে নিক্ষেপ করো। এবং সত্তর হাত লম্বা শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলো। সে মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করতো না এবং দুস্থ মানুষকে খাদ্য দিতে উৎসাহিত করতো না।[২০] তাই আজকে এখানে তার সমব্যথী কোন বন্ধু নেই। আর কোন খাদ্যও নেই ক্ষত নিসৃত পুঁজ-রক্ত ছাড়া। যা পাপীরা ছাড়া আর কেউ খাবে না।

পাপীদের জীবন যাপনের ধরনও ভিন্ন রূপ হয়ে যায়। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আনফাল, আয়াত ৫০; আন নাহল, আয়াত ২৮ ও ৩২ এবং টীকা ২৬; বনী ইসরাঈল, আয়াত ৯৭; ত্বা-হা, আয়াত ১০২, ১০৩ ও ১২৪ থেকে ১২৬ এবং টীকা ৭৯, ৮০ ও ১০৭; আল আম্বিয়া, আয়াত ১০৩, টীকা ৯৮; আল ফুরকান, আয়াত ২৪ ও টীকা ৩৮; আন নাম্‌ল, আয়াত ৮৯ ও টীকা ১০৯; সাবা, আয়াত ৫১ ও টীকা ৭২; ইয়াসীন, আয়াত ২৬ ও ২৭ এবং টীকা ২২-৩২; আল মু'মিন, আয়াত ৪৫ ও ৪৬ এবং টীকা ৬৩; মুহাম্মাদ, আয়াত ২৭ এবং টীকা ৩৭; ক্বাফ, আয়াত ১৯ থেকে ২৩ পর্যন্ত এবং টীকা ২২, ২৩ ও ২৫)।

১৩. অর্থাৎ আমলনামা পাওয়ার সাথে সাথেই তারা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠবে এবং নিজের বন্ধু-বান্ধবদের তা দেখাবে। সূরা ইনশিকাকের ৯ আয়াতে বলা হয়েছে যে, "সে আনন্দচিত্তে আপনজনদের কাছে ফিরে যাবে।''

১৪. অর্থাৎ তারা তাদের এ সৌভাগ্যের কারণ হিসেবে বলবে যে, দুনিয়ার জীবনে তারা আখেরাতকে ভুলে ছিল না। বরং একদিন তাদেরকে আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে সব কৃতকর্মের হিসেব দিতে হবে এ বিশ্বাস নিয়েই তারা সেখানে জীবন যাপন করেছিল।

১৫. সূরা ইন্‌শিকাকে বলা হয়েছে, "আর যাকে পিছন দিক থেকে আমলনামা দেয়া হবে।" সম্ভবত তা হবে এভাবে, অপরাধীর প্রথম থেকেই তার অপরাধী হওয়ার বিষয়টি জানা থাকবে। তার আমলনামায় কি আছে তাও ঠিকঠাক তার জানা থাকবে। তাই সে অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্তেও বাঁ হাত বাড়িয়ে তা গ্রহণ করবে এবং সংগে সংগেই নিজের পেছনের দিকে লুকিয়ে ফেলবে যাতে কেউ তা দেখতে না পায়।

فَلَآ اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٣٨﴾ وَمَا لَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٣٩﴾ اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ﴿٤٠﴾ وَّمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ؕ قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ ﴿٤١﴾ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٢﴾ تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٣﴾

২ রুকূ'

অতএব তা নয়।[২১] আমি শপথ করছি ঐ সব জিনিসেরও যা তোমরা দেখতে পাও এবং ঐ সব জিনিসেরও যা তোমরা দেখতে পাও না। এটা একজন সম্মানিত রসূলের বাণী,[২২] কোন কবির কাব্য নয়। তোমরা খুব কমই ঈমান পোষণ করে থাকো[২৩] আর এটা কোন গণকের গণনাও নয়। তোমরা খুব কমই চিন্তা-ভাবনা করে থাকো। এ বাণী বিশ্ব-জাহানের রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।[২৪]

১৬. অর্থাৎ হাশরের ময়দানে প্রকাশ্যে আমার হাতে এ আমলনামা দিয়ে সবার সামনে লাঞ্ছিত ও অপমানিত না করে যে শাস্তি দেয়ার তা দিয়ে ফেললেই ভালো হতো।

১৭. অর্থাৎ পৃথিবীতে আমি যা করে এসেছি তা যদি আমাকে আদৌ বলা না হতো। এ আয়াতের আরেকটি অর্থ এও হতে পারে যে, আমি ইতিপূর্বে আদৌ জানতাম না যে, হিসেব কি জিনিস। কোনদিন আমার কল্পনায়ও আসেনি যে, আমাকে একদিন আমার কার্যাবলীর হিসেব দিতে হবে এবং আমার অতীত কাজ-কর্ম সব আমার সামনে পেশ করা হবে।

১৮. অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনে আমার মৃত্যুবরণের পর সবকিছু যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো। এবং আর কোন জীবন যদি না থাকতো।

১৯. মূল আয়াতে আছে هَلَكَ عَنِّيْ سُلْطٰنِيَهْ । سلطان শব্দটি দলিল-প্রমাণ অর্থেও ব্যবহৃত হয় আবার ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্থেও ব্যবহৃত হয়। দলিল-প্রমাণ অর্থে গ্রহণ করলে তার অর্থ হবে আমি দলিল ও যুক্তি-প্রমাণের যে তুবড়ি ছুটাতাম তা আর এখানে চলবে না। এখন আত্মপক্ষ সমর্থনের মত কোন প্রমাণই আমার কাছে নেই। আর ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও প্রভাব প্রতিপত্তি অর্থে গ্রহণ করলে তার অর্থ হবে, আমি যে শক্তিতে বলিয়ান হয়ে পৃথিবীতে বুকটান করে চলতাম তা খতম হয়ে গিয়েছে। এখানে আমার কোন দলবল বা সেনাবাহিনী নেই, আমার আদেশ মেনে চলারও কেউ নেই। এখানে তো আমি এমন একজন অসহায় মানুষের মত দাঁড়িয়ে আছি যে আত্মরক্ষার জন্যও কিছু করতে সক্ষম নয়।

২০. অর্থাৎ নিজে কোন দরিদ্রকে খাবার দেয়া তো দূরের কথা কাউকে এতটুকু কথা বলাও পছন্দ করতো না যে, আল্লাহর ক্ষুধাক্লিষ্ট বান্দাদের খাদ্য দান করো।

২১. অর্থাৎ তোমরা যা মনে করে নিয়েছো ব্যাপার তা নয়।

২২. এখানে সম্মানিত রসূল মানে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। কিন্তু সূরা তাক্‌বীরে (আয়াত ১৯) সম্মানিত রসূলের যে উল্লেখ আছে তার অর্থ হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম। এখানে যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই সম্মানিত রসূল বলা হয়েছে তার প্রমাণ হলো, কুরআনকে সম্মানিত রসূলের বাণী বলার পরেই বলা হয়েছে যে, তা কোন কবি বা গণকের কথা নয়। আর একথা সবারই জানা যে, মক্কার কাফেররা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই কবি বা গণক বলতো। তারা জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে কবি বা গণক বলতো না। পক্ষান্তরে সূরা তাক্‌বীরে কুরআন মজীদকে সম্মানিত রসূলের বাণী বলার পরে বলা হয়েছে যে, সে রসূল অত্যন্ত শক্তিশালী, আরশের অধিপতির কাছে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, সেখানে তাঁর কথা গ্রহণ করা হয়, তিনি বিশ্বস্ত ও আমানতদার এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে পরিষ্কার দিগন্তে দেখেছেন। সূরা নাজ্‌মের ৫ থেকে ১০ আয়াতে জিবরাঈল আলাইহিস সাল্লাম সম্পর্কে প্রায় এ একই বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

এখানে একটি প্রশ্ন জাগে। তাহলো, কুরআনকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও জিবরাঈল আলাইহিস সালামের বাণী বলার তাৎপর্য কি? এর জওয়াব হলো, মানুষ কুরআনের এ বাণী শুনতো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুনতেন জিবরাঈল আলাইহিস সালামের মুখ থেকে। তাই এক বিচারে এটা ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী এবং আরেক বিচারে তা ছিল হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামের বাণী। কিন্তু পরক্ষণেই বিষয়টি স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে এ হচ্ছে সমগ্র বিশ্ব–জাহানের 'রবের' নাযিলকৃত বাণী। তবে তা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিবরাঈলের মুখ থেকে এবং লোকদেরকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে শুনানো হচ্ছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের কথা থেকেও এ সত্যটিই ফুটে ওঠে। তিনি বলেছেন যে, এসব তাঁদের দু'জনের কথা নয়। বরং বার্তাবাহক হিসেবে তাঁরা এ বাণী মূল বাণী প্রেরকের পক্ষ থেকে পেশ করেছেন।

২৩. "কমই ঈমান পোষণ করে থাকো" প্রচলিত আরবী বাকরীতি অনুসারে এর একটি অর্থ হতে পারে তোমরা আদৌ ঈমান পোষণ করো না। এর আরেকটি অর্থ এও হতে পারে যে, কুরআন শুনে কোন সময় তোমাদের মন হয়তো স্বতস্ফূর্তভাবেই বলে ওঠে যে, এটা মানুষের কথা হতে পারে না। কিন্তু তোমরা নিজেদের হঠকারিতার ওপর অবিচল রয়েছ এবং এ বাণীর ওপর ঈমান আনতে অস্বীকৃতি জানিয়ে থাকো।

২৪. সারকথা হলো তোমরা যা কিছু দেখতে পাও এবং যা কিছু দেখতে পাও না তার কসম আমি এ জন্য করছি যে, এ কুরআন কোন কবি বা গণকের কথা নয়। বরং সারা বিশ্ব–জাহানের রবের নাযিলকৃত বাণী। এ বাণী এমন এক রসূলের মুখ থেকে উচ্চারিত হচ্ছে যিনি মর্যাদাবান (অত্যন্ত সম্মানিত ও ভদ্র)। এখন দেখা যাক কসম করার উদ্দেশ্য কি? লোকজন যা কিছু দেখতে পাচ্ছিল তাহলো :

এক : এ বাণী এমন ব্যক্তি পেশ করছিলেন যার মার্জিত ও ভদ্র স্বভাবের বিষয়টি মক্কা শহরের কারোই অজানা ছিল না। সমাজের সবাই একথা জানতো যে, নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে তিনি তাদের জাতির মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি। এরূপ লোক আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা

আরোপ করবে এবং নিজে কোন কথা বানিয়ে মহান আল্লাহর কথা বলে তা চালিয়ে দেবে, এত বড় মিথ্যার বেসাতি এ লোকের কাছ থেকে আশা করা যায় না।

দুই ঃ তারা আরো দেখছিল যে, এ ব্যক্তি কোন ব্যক্তিগত স্বার্থের বশবর্তী হয়ে এ বাণী পেশ করছে না। বরং এ কাজ করতে গিয়ে সে নিজের স্বার্থকেই জলাঞ্জলী দিয়েছে। এ কাজ করতে গিয়ে সে নিজের ব্যবসায়–বাণিজ্য ধ্বংস করেছে, আরাম–আয়েশ ত্যাগ করেছে, যে সমাজে তাকে অভাবনীয় সম্মান দেখানো হতো সেখানেই তাকে গালিগালাজের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, আর এসব করে নিজেই যে শুধু দুঃখ–মসিবতের মধ্যে নিপতিত হচ্ছে তাই নয়, বরং নিজের ছেলেমেয়েদেরকেও সব রকম দুঃখ–দুর্দশার মুখে ঠেলে দিয়েছে। ব্যক্তি স্বার্থের পূজারী হলে সে নিজেকে এ দুঃখ–দুর্দশার মধ্যে টেনে আনবে কেন?

তিন ঃ তারা নিজের চোখে এও দেখছিলো যে, তাদের সমাজের যেসব লোক ঐ ব্যক্তির প্রতি ঈমান আনছিলো তাদের জীবনে হঠাৎ একটা বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়ে যাচ্ছে। কোন কবি অথবা গণকের কথার এতটা প্রভাব কি কখনো দেখা গিয়েছে যে তা মানুষের মধ্যে ব্যাপক নৈতিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে আর তার অনুসারীরা এ জন্য সব রকমের বিপদাপদ ও দুঃখ–কষ্ট বরদাশত করতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে?

চার ঃ কবিদের ভাষা কেমন হয়ে থাকে এবং গণকদের কথাবার্তা কিরূপ হয় তাও তাদের অজানা ছিল না। কুরআনের ভাষা, সাহিত্য ও বিষয়বস্তুকে কবির কাব্য এবং গণকের গণনা সদৃশ বলা একমাত্র হঠকারী ব্যক্তি ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। (আমি এ বিষয়ে তাফহীমুল কুরআনের সূরা আম্বিয়ার ৭নং টীকায়, সূরা শূ'আরার ১৪২ থেকে ১৪৫নং টীকায় এবং সূরা আত্ তূরের ২২নং টীকায় বিস্তারিত আলোচনা করেছি।)

পাঁচ ঃ সমগ্র আরব ভূমিতে উন্নত ভাষাশৈলীর অধিকারী এমন কোন ব্যক্তি ছিল না যার চমকপ্রদ ও অলংকারময় ভাষাকে কুরআনের মোকাবিলায় পেশ করা যেতো। কুরআনের সমকক্ষ হওয়া তো দূরের কথা, কারো ভাষার বিশুদ্ধতা ও শ্রুতিমাধুর্য কুরআনের উন্নত ভাষাশৈলীর ধারে কাছে ঘেঁষারও যোগ্যতা রাখতো না। এ বিষয়টিও তাদের জানা ছিল।

ছয় ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের কথাবার্তা ও ভাষার সাহিত্যিক উৎকর্ষ ও কুরআনের সাহিত্যিক মান ও উৎকর্ষ থেকে যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল তাও তাদের অগোচরে ছিল না। আরবী ভাষাভাষী কোন ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তৃতা এবং কুরআন শোনার পর বলতে পারতো না যে, এ দু'টি একই ব্যক্তির মুখের কথা।

সাত ঃ যেসব বিষয়বস্তু ও জ্ঞান–বিজ্ঞান কুরআনে পেশ করা হয়েছে নবুওয়াত দাবী করার একদিন আগেও মক্কার লোকেরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে তা শোনেনি। তারা এও জানতো যে, তাঁর কাছে এসব তথ্য ও বিষয়বস্তু জানার কোন উপায়–উপকরণও নেই। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন গোপনীয় সূত্র থেকে এসব তথ্য ও জ্ঞান লাভ করছেন বলে তাঁর বিরোধীরা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করলেও মক্কার কেউ–ই তা বিশ্বাস করতো না। (আমি তাফহীমুল কুরআনের সূরা

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴿٤٤﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٤٦﴾ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ﴿٥١﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٥٢﴾

যদি এ নবী নিজে কোন কথা বানিয়ে আমার কথা বলে চালিয়ে দিতো তাহলে আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং ঘাড়ের রগ কেটে দিতাম। তোমাদের কেউ–ই (আমাকে) এ কাজ থেকে বিরত রাখতে পারতো না।[২৫] আসলে এটি আল্লাহভীরু লোকদের জন্য একটি নসীহত।[২৬] আমি জানি তোমাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক মিথ্যাপ্রতিপন্ন করতে থাকবে। নিশ্চিতভাবে তা এসব কাফেরদের জন্য অনুতাপ ও আফসোসের[২৭] কারণ হবে। এটি অবশ্যই এক নিশ্চিত সত্য। অতএব হে নবী, তুমি তোমার মহান রবের পবিত্রতা ঘোষণা করো।

আন নাহ্‌লের ১০৭নং টীকা এবং সূরা আল ফুরকানের ১২নং টীকায় এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করেছি।)

আট ঃ এ পৃথিবী থেকে সুদূর আসমান তথা মহাশূন্য পর্যন্ত বিস্তৃত এ বিরাট–বিশাল বিশ্ব–জাহানকে তারা নিজ চোখে সুচারু রূপে পরিচালিত হতে দেখছিল। তারা এও দেখছিলো যে, এ বিশাল বিশ্বলোক একটি জ্ঞানগর্ভ আইন–বিধান এবং সর্বব্যাপী নিয়ম–শৃংখলা দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। আরবের লোকেরা শির্‌কে লিপ্ত ছিল এবং আখেরাত অস্বীকার করতো। এটা ছিল তাদের আকীদা–বিশ্বাসের অন্তর্গত। কিন্তু এ বিশাল বিশ্বলোকের পরিচালনা ও নিয়ম–শৃংখলার কোন ক্ষেত্রেই তারা শির্‌ক ও আখেরাত অস্বীকৃতির পক্ষে কোন সাক্ষ–প্রমাণ খুঁজে পেতো না। বরং কুরআন তাওহীদ ও আখেরাতের যে ধারণা পেশ করছে সর্বত্র তারই সত্যতার সাক্ষ–প্রমাণ পাওয়া যায়।

এসবই তারা দেখতে পাচ্ছিল। কিন্তু যেসব জিনিস তারা দেখতে পাচ্ছিল না তা হলো, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলাই এ বিশ্ব–জাহানের স্রষ্টা, মালিক এবং শাসক, বিশ্ব–জাহানের সবাই তাঁর বান্দা, একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউ ইলাহ নয়, কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে, আল্লাহ তা'আলাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রসূল করে পাঠিয়েছেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকেই তাঁর ওপর কুরআন নাযিল হচ্ছে। পূর্বোক্ত আয়াতগুলোতে যা বলা হয়েছে তা বলা হয়েছে এ দু' ধরনের সত্যের কসম খেয়ে।

২৫. নিজের পক্ষ থেকে অহীর মধ্যে কোন কম বেশী করার ইখতিয়ার নবীর নেই, নবী যদি এ কাজ করে তাহলে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দেবো, একথাটি বলাই এ

আয়াতের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু কথাটি বলতে যে বাচনভঙ্গী গ্রহণ করা হয়েছে তাতে চোখের সামনে এমন একটি চিত্র ভেসে ওঠে যে, বাদশাহর নিযুক্ত কর্মচারী বাদশাহর নামে জালিয়াতি করলে তিনি তাকে পাকড়াও করে তার গর্দান মেরে দেবেন। কিছু লোক এ আয়াত থেকে এ ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, কোন ব্যক্তি নবুওয়াতের দাবী করলে তৎক্ষণাৎ আল্লাহর তরফ থেকে যদি তার গর্দানের রগ কেটে দেয়া না হয় তাহলে এটা হবে তার নবী হওয়ার প্রমাণ। অথচ এ আয়াতে যা বলা হয়েছে তা সত্য নবী সম্পর্কে বলা হয়েছে। নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদার সম্পর্কে তা প্রযোজ্য নয়। মিথ্যা দাবীদার তো শুধু নবুওয়াতের দাবীই করে না, খোদায়ীর দাবী পর্যন্ত করে বসে এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে বুক ফুলিয়ে চলে। এটা তাদের সত্য হওয়ার কোন প্রমাণ নয়। (আমি তাফহীমুল কুরআনের সূরা ইউনুসের ২৩নং টীকায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।)

২৬. অর্থাৎ যারা ভুল-ভ্রান্তি ও তার খারাপ পরিণাম থেকে রক্ষা পেতে চায় কুরআন তাদের জন্য উপদেশ বাণী। (আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল বাকারাহ, টীকা ৩)

২৭. অর্থাৎ পরিশেষে তাদেরকে এ জন্য অনুশোচনা করতে হবে যে, কেন তারা কুরআনকে মিথ্যা মনে করেছিল।

আল মা'আরিজ

৭০

নামকরণ

সূরার তৃতীয় আয়াতের ذِى الْمَعَارِجِ শব্দটি থেকে এর নামকরণ হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বিষয়বস্তু থেকে প্রমাণিত হয় যে, সূরা আল হাক্কাহ যে পরিবেশ–পরিস্থিতিতে নাযিল হয়েছিল এ সূরাটিও মোটামুটি সে একই পরিবেশ–পরিস্থিতিতে নাযিল হয়েছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

কাফেররা কিয়ামত, আখেরাত এবং দোযখ ও বেহেশ্‌ত সম্পর্কিত বক্তব্য নিয়ে বিদ্রূপ ও উপহাস করতো এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ মর্মে চ্যালেঞ্জ করতো যে, তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো আর তোমাকে অস্বীকার করে আমরা জাহান্নামের শাস্তিলাভের উপযুক্ত হয়ে থাকি তাহলে তুমি আমাদেরকে যে কিয়ামতের ভয় দেখিয়ে থাকো তা নিয়ে এসো। যে কাফেররা এসব কথা বলতো এ সূরায় তাদের সতর্ক করা হয়েছে এবং উপদেশ বাণী শোনানো হয়েছে। তাদের এ চ্যালেঞ্জের জবাবে এ সূরার গোটা বক্তব্য পেশ করা হয়েছে।

সূরার প্রথমে বলা হয়েছে প্রার্থনাকারী আযাব প্রার্থনা করছে। নবীর দাওয়াত অস্বীকারকারীর ওপর সে আযাব অবশ্যই পতিত হবে। আর যখন আসবে তখন কেউ তা প্রতিরোধ করতে পারবে না। তবে তার আগমন ঘটবে নির্ধারিত সময়ে। আল্লাহর কাজে দেরী হতে পারে। কিন্তু তার কাছে বেইনসাফী বা অবিচার নেই। তাই তাদের হাসি–তামাসার ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করো। এরা মনে করছে তা অনেক দূরে। কিন্তু আমি দেখছি তা অতি নিকটে।

এরপর বলা হয়েছে, এসব লোক হাসি–ঠাট্টাচ্ছলে কিয়ামত দ্রুত নিয়ে আসার দাবী করছে। অথচ কত কঠোর ও ভয়ানক সেই কিয়ামত। যখন তা আসবে তখন এসব লোকের কি–যে ভয়ানক পরিণতি হবে। সে সময় এরা আযাব থেকে বাঁচার জন্য নিজের স্ত্রী, সন্তান–সন্ততি এবং নিকট আত্মীয়দেরকেও বিনিময় স্বরূপ দিয়ে দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। কিন্তু কোনভাবেই আযাব থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারবে না।

এরপর মানুষকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, সেদিন মানুষের ভাগ্যের ফায়সালা হবে সম্পূর্ণরূপে তাদের আকীদা–বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্র ও কৃতকর্মের ভিত্তিতে। দুনিয়ার

জীবনে যারা ন্যায় ও সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং ধন–সম্পদ জমা করে ডিমে তা দেয়ার মত সযত্নে আগলে রেখেছে তারা হবে জাহান্নামের উপযুক্ত। আর যারা আল্লাহর আযাবের ভয়ে ভীত থেকেছে। আখেরাতকে বিশ্বাস করেছে, নিয়মিত নামায পড়েছে, নিজের উপার্জিত সম্পদ দিয়ে আল্লাহর অভাবী বান্দাদের হক আদায় করেছে, ব্যভিচার থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেছে, আমানতের খেয়ানত করেনি, ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি এবং কথা ও কাজ যথাযথভাবে রক্ষা করে চলেছে এবং সাক্ষদানের বেলায় সত্যবাদিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকেছে তারা সম্মান ও মর্যাদার সাথে জান্নাতে স্থান লাভ করবে।

পরিশেষে মক্কার কাফেরদের সাবধান করা হয়েছে, যারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখামাত্র বিদ্রূপ ও উপহাস করার জন্য চারদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তো। তাদেরকে বলা হয়েছে, যদি তোমরা তাঁকে না মানো তাহলে আল্লাহ তা'আলা অন্যদেরকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই বলে উপদেশ দেয়া হয়েছে, যেন তিনি এসব উপহাস–বিদ্রূপের তোয়াক্কা না করেন। এরা যদি কিয়ামতের লাঞ্ছনা দেখার জন্যই জিদ ধরে থাকে তাহলে তাদেরকে এ অর্থহীন তৎপরতায় লিপ্ত থাকতে দিন। তারা নিজেরাই এর দুঃখজনক পরিণতি দেখতে পাবে।

سَاَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ۝١ لِّلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ ۝٢ مِّنَ اللّٰهِ ذِي الْمَعَارِجِ ۝٣ تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ۝٤ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلًا ۝٥ اِنَّهُمْ يَرَوْنَهٗ بَعِيْدًا ۝٦ وَّنَرٰىهُ قَرِيْبًا ۝٧

এক প্রার্থনাকারী আযাব প্রার্থনা করেছে[১] যে আযাব কাফেরের জন্য অবধারিত। তা প্রতিরোধ করার কেউ নেই। আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি উর্ধারোহনের সোপানসমূহের অধিকারী[২] ফেরেশতারা এবং রূহ[৩] তার দিকে উঠে যায়[৪] এমন এক দিনে যা পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।[৫] অতএব, হে নবী, তুমি উত্তম ধৈর্য ধারণ করো।[৬] তারা সেটিকে অনেক দূরে মনে করছে। কিন্তু আমি দেখছি তা নিকটে।[৭]

১. মূল আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ হলো سَاَلَ سَآئِلٌ । কোন কোন মুফাস্‌সির এখানে سـال শব্দটিকে জিজ্ঞেস করা অর্থে গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মতে আয়াতের অর্থ হলো একজন জিজ্ঞেসকারী জানতে চেয়েছে যে, তাদেরকে যে আযাব সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে তা কার ওপর আপতিত হবে? আল্লাহ তা'আলা এ প্রশ্নের জওয়াব দিয়েছেন এই বলে যে, তা কাফেরদের ওপর পতিত হবেই। তবে অধিকাংশ মুফাস্‌সির এ ক্ষেত্রে চাওয়াকে দাবী করা অর্থে গ্রহণ করেছেন। নাসায়ী এবং আরো কিছু সংখ্যক মুহাদ্দিস ইবনে আব্বাস থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। মুহাদ্দিস হাকেম এটিকে সহীহ হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি হলো নাদর ইবনে হারেস ইবনে কালাদা বলেছিলঃ

اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ – (الانفال : ٣٢)

"হে আল্লাহ, এটি যদি সত্যিই তোমার পক্ষ থেকে আসা একটা সত্য বাণী হয়ে থাকে, তাহলে আসমান থেকে আমাদের ওপর পাথর বর্ষণ করো অথবা আমাদেরকে ভীষণ কষ্টদায়ক শাস্তি দাও।"

এটি ছাড়াও কুরআন মজীদের আরো অনেক স্থানে মক্কার কাফেরদের এ চ্যালেঞ্জেরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, তুমি আমাদের যে আযাবের ভয় দেখাচ্ছো তা নিয়ে আসছো না কেন? উদাহরণ স্বরূপ নীচে উল্লেখিত স্থানসমূহ দেখুন। সূরা ইউনুস, আয়াত ৪৬ থেকে ৪৮; সূরা আম্বিয়া, আয়াত ৩৬ থেকে ৪১; সূরা আন নাম্ল আয়াত ৬৭ থেকে ৭২; সূরা সাবা, আয়াত ২৬ থেকে ৩০; ইয়াসীন, আয়াত ৪৫ থেকে ৫২ এবং সূরা মূলক ২৪ থেকে ২৭।

২. মূল ইবারতে ذِى الْمَعَارِجِ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। مَعْرَجٌ শব্দের বহুবচন হলো معارج । এর অর্থ হলো ধাপ বা সিঁড়ি অথবা এমন জিনিস যার সাহায্যে ওপরে ওঠা যায়। আল্লাহ তা'আলাকে معارج এর অধিকারী বলার মানে হলো তাঁর সত্তা অনেক উচ্চ ও সমুন্নত। তার দরবারে পৌঁছার জন্যে ফেরেশতাদের একের পর এক ওপর দিকে উঠতে হয়। পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়টিই বলা হয়েছে।

৩. রূহ অর্থ জিবরাঈল আলাইহিস সালাম। অন্য সব ফেরেশতাদের থেকে আলাদাভাবে জিবরাঈলের উল্লেখ তাঁর বিশেষ মর্যাদা প্রকাশ করে। সূরা শূ'আরায় বলা হয়েছে, نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ (রূহুল আমীন এ কুরআন নিয়ে তোমার দিলের মধ্যে নাযিল হয়েছে।) সূরা বাকারায় বলা হয়েছে,

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ

"বলো, যে ব্যক্তি শুধু এ কারণে জিবরাঈলের দুশমন হয়ে গিয়েছেন যে, সে তোমার অন্তরে কুরআন নাযিল করেছেন......................................।"

এ দু'টি আয়াত এক সাথে পড়লে বুঝা যায় যে, রূহ মানে জিবরাঈল (আ) ছাড়া আর কিছু নয়।

৪. এ পুরো বিবরণটি 'মুতাশাবিহাতের' অন্তরভুক্ত। এর কোন নির্দিষ্ট অর্থ করা যায় না। আমরা ফেরেশতার সঠিক তাৎপর্য কি তা জানি না। আমরা তাদের উর্ধারোহণের সঠিক রূপও জানি না। যে ধাপগুলো পেরিয়ে ফেরেশতারা ওপরে ওঠেন তা কেমন তাও আমরা জানি না। মহান আল্লাহ সম্পর্কেও এ ধারণা করা যায় না যে, তিনি কোন বিশেষ স্থানে অবস্থান করেন। কারণ তাঁর মহান সত্তা স্থান ও কালের গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়।

৫. সূরা হজ্জের ৪৭ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ এসব লোক এ মুহূর্তেই আযাব নিয়ে আসার জন্য তোমার কাছে দাবী করছে। আল্লাহ কখনো তাঁর প্রতিশ্রুতি ভংগ করবেন না। তবে তোমার রবের হিসেবের একদিন তোমাদের হিসেবের হাজার হাজার বছরের সমান হয়ে থাকে। সূরা আস সাজ্দার ৫ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ "তিনি আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত গোটা বিশ্ব-জাহানের সব বিষয় পরিচালনা করেন। এরপর (তার রিপোর্ট) এমন একটি দিনে তার কাছে পৌঁছে যা তোমাদের গণনার এক হাজার বছরের সমান।" আর এখানে আযাব দাবী করার জবাবে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলার একদিন পঞ্চাশ হাজার

يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ۝٨ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۝٩ وَلَا يَسْأَلُ
حَمِيمٌ حَمِيمًا ۝١٠ يُبَصَّرُونَهُمْ ۚ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ
بِبَنِيهِ ۝١١ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ۝١٢ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ۝١٣ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ۝١٤ كَلَّا ۖ إِنَّهَا لَظَىٰ ۝١٥ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ ۝١٦ تَدْعُو مَنْ
أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ۝١٧ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ۝١٨

(যেদিন সেই আযাব আসবে) সেদিন[৮] আসমান গলিত রূপার মত বর্ণ ধারণ করবে।[৯] আর পাহাড়সমূহ রংবেরং–এর ধুনিত পশমের মত হয়ে যাবে।[১০] কোন পরম বন্ধুও বন্ধুকে জিজ্ঞেস করবে না। অথচ তাদেরকে পরস্পর দৃষ্টি সীমার মধ্যে রাখা হবে।[১১] অপরাধী সেদিনের আযাব থেকে মুক্তির বিনিময়ে তার সন্তান–সন্ততিকে, স্ত্রীকে, ভাইকে, এবং তাকে আশ্রয়দানকারী জ্ঞাতি–গোষ্ঠীর আপনজনকে এমনকি পৃথিবীর সবকিছুই দিতে চাইবে। কখনো নয়, তা তো হবে জলন্ত আগুনের লেলিহান শিখা যা শরীরের গোশত ও চামড়া ঝলসিয়ে নিঃশেষ করে দেবে। যারা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল আর সম্পদ জমা করে ডিমে তা দেয়ার মত করে আগলে রেখেছিল[১২] তাদেরকে সে অগ্নিশিখা উচ্চ স্বরে নিজের কাছে ডাকবে।

বছরের সমান। এরপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে যারা বিদ্রূপ করে আযাব দাবী করছে তাদের এসব কথায় ধৈর্য ধারণ করুন। তারপর বলা হচ্ছে, এসব লোক আযাবকে দূরে মনে করছে। কিন্তু আমি দেখছি তা অত্যাসন্ন। এসব বক্তব্যের প্রতি সামগ্রিকভাবে দৃষ্টিপাত করলে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মানুষ তার মন–মানসিকতা, চিন্তা ও দৃষ্টির পরিসর সংকীর্ণ হওয়ার কারণে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াবলীকে নিজেদের সময়ের মান অনুযায়ী পরিমাপ করে থাকে। তাই একশো বছর বা পঞ্চাশ বছর সময়ও তাদের কাছে অত্যন্ত দীর্ঘ সময় বলে মনে হয়। কিন্তু আল্লাহর এক একটি পরিকল্পনা হাজার হাজার বছর বা লাখ লাখ বছর মেয়াদের হয়ে থাকে। এ সময়টিও বলা হয়েছে উদাহরণ হিসেবে। প্রকৃতপক্ষে মহা বিশ্ব ভিত্তিক পরিকল্পনা লক্ষ লক্ষ ও শত শত কোটি বছর মেয়াদেরও হয়ে থাকে। এসব পরিকল্পনার মধ্য থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার অধীনে এ পৃথিবীতে মানব জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর একটা নির্দিষ্ট সময় দেয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী তাদেরকে এখানে একটি বিশেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাজ করার অবকাশ দেয়া হবে। কোন মানুষই জানে না এ পরিকল্পনা কখন শুরু হয়েছে, তা কার্যকরী করার জন্য কি পরিমাণ সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তার

পরিসমাপ্তির জন্য কোন্ মুহূর্তটি নির্ধারিত করা হয়েছে, যে মুহূর্তটিতে কিয়ামত সংঘটিত হবে এবং সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত জন্মলাভকারী সমস্ত মানুষকে এক সাথে জীবিত করে উঠিয়ে বিচার করার জন্য কোন্ সময়টি ঠিক করে রাখা হয়েছে। আমরা এ মহা পরিকল্পনার ততটুকুই কেবল জানি যতটুকু আমাদের চোখের সামনে সংঘটিত হচ্ছে অথবা অতীত মহাকালে সংঘটিত ঘটনাবলীর যে আংশিক ইতিহাসটুকু আমাদের সামনে বিদ্যমান আছে। এর সূচনা ও পরিণতি সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয়, সে সম্পর্কে জানা তো দূরের কথা তা বুঝাও আমাদের সাধ্যাতীত। তাই এর পেছনে যে দর্শন ও রহস্য কাজ করছে তা বুঝার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। এখন কথা হলো, যেসব লোক দাবী করছে যে, এ পরিকল্পনা বাদ দিয়ে তার পরিণাম এখনই তাদের সামনে এনে হাজির করা হোক। আর যদি তা না করা হয় তাহলে পরিণাম সম্পর্কে যা বলা হচ্ছে সেটিই মিথ্যা, তারা আসলে নিজেদের অজ্ঞতাই প্রমাণ করছে। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল হাজ্জ, টীকা ৯২–৯৩ এবং আস সাজদা, টীকা ৯)

৬. অর্থাৎ এমন ধৈর্য যা একজন মহত উদার ও সাহসী মানুষের মর্যাদার উপযোগী।

৭. এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, তারা এ ব্যাপারটিকে অসম্ভব মনে করে। অথচ আমাদের কাছে তা অত্যাসন্ন। দ্বিতীয় অর্থ এও হতে পারে যে, তারা কিয়ামতকে অনেক দূরের ব্যাপার বলে মনে করে। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে তা এত কাছের যেন আগামীকালই সংঘটিত হবে।

৮. একদল মুফাস্সির এ আয়াতাংশকে فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ আয়াতাংশের সাথে সম্পৃক্ত বলে ধরে নিয়েছেন। তারা বলেন ঃ যে দিনটির স্থায়িত্ব পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান বলা হয়েছে সেটি কিয়ামতের দিন। মুসনাদে আহমাদ ও তাফসীরে ইবনে জারীরে হযরত আবু সায়ীদ খুদরী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এ আয়াতটি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হলো, তাহলে তো সেদিনটি খুবই দীর্ঘায়িত হবে। একথা শুনে তিনি বললেন ঃ "যার হাতে আমার প্রাণ সেই মহান সত্তার শপথ, একটি ফরয নামায পড়তে দুনিয়াতে যতটুকু সময় লাগে একজন ঈমানদারের জন্য সেদিনটি তার চাইতেও সংক্ষিপ্ত হবে।" এটি সহীহ সনদে বর্ণিত রেওয়ায়াত হলে এটি ছাড়া এ আয়াতের অন্য কোন ব্যাখ্যা করার অবকাশই থাকতো না। হাদীসটির সনদে উল্লেখিত বর্ণনাকারী দাররাজ এবং তার উস্তাদ আবুল হাইসাম উভয়েই যয়ীফ।

৯. অর্থাৎ বার বার রং পরিবর্তিত হবে।

১০. পাহাড়সমূহের রং যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন তাই যখন তা স্থানচ্যুত ওজনহীন হয়ে উড়তে থাকবে তখন মনে হবে যেন রংবেরংয়ের ধুনিত পশম বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

১১. অর্থাৎ তারা একজন আরেকজনকে দেখতে পাবে না বলে জিজ্ঞেস করবে না তা নয়। বরং অন্যের ব্যাপারে যা ঘটছে তা প্রত্যেকেই নিজ চোখে দেখতে পাবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তাকে জিজ্ঞেস করবে না। কেননা, সে তখন নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবে।

১২. এ স্থানে ও আখেরাতে মানুষের মন্দ পরিণামের দু'টি কারণ বলা হয়েছে যা সূরা আল হাক্কার ৩৩ ও ৩৪ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। একটি হলো হক থেকে ফিরে যাওয়া এবং ঈমান আনয়নে অস্বীকৃতি। অপরটি হলো দুনিয়া পূজা ও কৃপণতা। এ কারণেই মানুষ সম্পদ জমা করে এবং কোন কল্যাণকর কাজের জন্য তা খরচ করে না।

إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٢٦﴾ وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿٢٧﴾

মানুষকে ছোট মনের অধিকারী করে সৃষ্টি করা হয়েছে।[১৩] বিপদ–মুসিবতে পড়লেই সে ঘাবড়ে যায়, আর যে–ই সচ্ছলতার মুখ দেখে অমনি সে কৃপণতা করতে শুরু করে। তবে যারা নামায পড়ে[১৪] (তারা এ দোষ থেকে মুক্ত)। যারা নামায আদায়ের ব্যাপারে সবসময় নিষ্ঠাবান।[১৫] যাদের সম্পদে নির্দিষ্ট হক আছে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের।[১৬] যারা প্রতিফলের দিনটিকে সত্য বলে মানে।[১৭] যারা তাদের প্রভুর আযাবকে ভয় করে।[১৮]

১৩. যে বিষয়টিকে আমরা আমাদের ভাষায় এভাবে বলে থাকি যে, "এটি মানুষের প্রকৃতিগত অথবা এটা তার সহজাত দুর্বলতা" সে বিষয়টিকে আল্লাহ এভাবে বর্ণনা করেন যে, "মানুষকে সৃষ্টিই করা হয়েছে এভাবে"। এ ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে, কুরআন মজীদের বহু জায়গায় মানব জাতির সাধারণ নৈতিক দুর্বলতা উল্লেখ করার পর ঈমান ও সত্যের পথ অনুসরণকারীদের তা থেকে ব্যতিক্রমী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়টিই বর্ণনা করা হয়েছে। এভাবে এ সত্যটি আপনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মানুষের জন্মগত এসব দুর্বলতা অপরিবর্তনীয় নয়। বরং আল্লাহর দেয়া হিদায়াত গ্রহণ করে মানুষ যদি আত্মশুদ্ধির জন্য সত্যিকার প্রচেষ্টা চালায় তাহলে সে এসব দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারে। পক্ষান্তরে যদি সে তার প্রবৃত্তিকে লাগামহীনভাবে ছেড়ে দেয় তাহলে দুর্বলতাগুলো তার মধ্যে দৃঢ়মূল হয়ে যায়। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আম্বিয়া, টীকা ৪১; সূরা আয যুমার, টীকা ২৩ থেকে ২৮ এবং সূরা আশ্ শূরা, টীকা ৭৫)

১৪. কোন ব্যক্তির নামায পড়ার অপরিহার্য অর্থ হলো সে আল্লাহ, রসূল, কিতাব ও আখেরাতের ওপর বিশ্বাস রাখে এবং সাথে সাথে নিজের এ বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করার প্রচেষ্টাও চালিয়ে যায়।

১৫. অর্থাৎ কোন প্রকার অলসতা, আরামপ্রিয়তা, ব্যস্ততা কিংবা আকর্ষণ তাদের নামাযের ক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। নামাযের সময় হলে সে সবকিছু ফেলে রেখে তার প্রভুর ইবাদাতের জন্য প্রস্তুত হয়। عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ–এর আর একটি অর্থ বর্ণনা করেছেন হযরত উকবা ইবনে আমের। তাহলো, সে পূর্ণ প্রশান্তি এবং বিনয় ও নিষ্ঠাসহ নামায পড়ে, কাকের মত ঠোকর মারে না। ঠোকর

إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ﴿٢٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٢٩﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٣١﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٣٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ ﴿٣٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٣٤﴾ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ ﴿٣٥﴾

কারণ তাদের প্রভুর আযাব এমন বস্তু নয় যে সম্পর্কে নির্ভয় থাকা যায়। যারা নিজেদের লজ্জাস্থান নিজের স্ত্রী অথবা মালিকানাধীন স্ত্রীলোকদের ছাড়া অন্যদের থেকে হিফাযত করে।[১৯] স্ত্রী ও মালিকানাধীন স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে তারা তিরস্কৃত হবে না। তবে যারা এর বাইরে আর কেউকে চাইবে তারা সীমালংঘনকারী।[২০] যারা আমানত রক্ষা করে ও প্রতিশ্রুতি পালন করে।[২১] আর যারা সাক্ষ দানের ক্ষেত্রে সততার ওপর অটল থাকে।[২২] যারা নামাযের হিফাযত করে।[২৩] এসব লোক সম্মানের সাথে জান্নাতের বাগানসমূহে অবস্থান করবে।

মেরেই কোন রকমে নামায শেষ করার চেষ্টা করে না। আবার নামাযের মধ্যে এদিক সেদিক তাকিয়েও দেখে না। প্রচলিত আরবী বাকরীতিতে বদ্ধ বা স্থির পানিকে ماء دائم বলা হয়। এরই আলোকে এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হয়েছে।

১৬. সূরা যারিয়াতের ১৯ আয়াতে বলা হয়েছে, "তাদের সম্পদে প্রার্থী এবং বঞ্চিতদের নির্দিষ্ট হক আছে।" কেউ কেউ এ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট হকের অর্থ মনে করেছেন ফরয যাকাত। কারণ ফরয যাকাতেই নেসাব ও হার দু'টিই নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, সূরা মা'আরিজ সর্বসম্মত মতে মক্কায় অবতীর্ণ সূরা। কিন্তু নেসাব ও হার নির্দিষ্ট করে যাকাত ফরয হয়েছে মদীনায়। অতএব হকের সঠিক অর্থ হলো, প্রার্থী ও বঞ্চিতদের জন্য তারা নিজেরাই নিজেদের সম্পদে একটা অংশ নির্দিষ্ট করে রেখেছে। এটাকে তাদের হক মনে করে তারা নিজেরাই তা দিয়ে দেয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর, মুজাহিদ, শা'বী এবং ইবরাহীম নাখয়ী এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

প্রার্থী মানে পেশাদার ভিক্ষুক নয়, বরং যেসব অভাবী মানুষ অন্যের সাহায্যপ্রার্থী হয় তারা। আর বঞ্চিত অর্থ এমন লোক যার কোন আয়–উপার্জন নেই। অথবা সে উপার্জনের জন্য চেষ্টা করে ঠিকই কিন্তু তাতে তার প্রয়োজন পূরণ হয় না। অথবা কোন দুর্ঘটনা বা দুর্যোগের শিকার হয়ে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েছে অথবা আয়–উপার্জনের সামর্থই নেই। এ

ধরনের লোকদের ব্যাপারে যখনই জানা যাবে যে, তারা প্রকৃতই বঞ্চিত তখন একজন আল্লাহভীরু মানুষ এ জন্য অপেক্ষা করে না যে, সে তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুক। বরং তার বঞ্চিত থাকার কথা জানা মাত্র সে নিজেই অগ্রসর হয়ে তাকে সাহায্য করে। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা যারিয়াত, টীকা ১৭)

১৭. অর্থাৎ দুনিয়াতে নিজেকে দায়িত্বহীন এবং জবাবদিহি থেকে মুক্ত মনে করে না। বরং এ ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে যে, একদিন আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে তাদেরকে নিজেদের সব কাজের হিসেব দিতে হবে।

১৮. অন্য কথায় তাদের অবস্থা কাফেরদের মত নয়। কাফেররা দুনিয়াতে সব রকম গোনাহ, অপরাধ ও জুলুম–অত্যাচারে লিপ্ত থেকেও আল্লাহকে ভয় করে না। কিন্তু তারা নিজস্বভাবে যথাসম্ভব নৈতিকতা ও কাজ–কর্মে সদাচরণ করা সত্ত্বেও সবসময় আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকে। সবসময় তারা এ আশংকা করে যে, আল্লাহর আদালতে আমাদের ত্রুটি–বিচ্যুতি আমাদের নেক কাজের তুলনায় অধিক বলে প্রমাণিত না হয় এবং এভাবে আমরা শাস্তির উপযুক্ত বলে প্রমাণিত না হই। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল মু'মিনূন, টীকা ৫৪ এবং সূরা আয যারিয়াত, টীক ১৯)

১৯. লজ্জাস্থানের হিফাযতের অর্থ ব্যভিচার না করা এবং উলঙ্গপনা থেকেও দূরে থাকা। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল মু'মিনূন, টীকা ৬; আন নূর, টীকা ৩০–৩২ এবং আল আহযাব, টীকা ৬২)।

২০. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল–মু'মিনূন, টীকা–৭।

২১. আমানতসমূহ বলতে এমন সব আমানত বুঝায়, যা আল্লাহ তা'আলা বান্দার হাতে সোপর্দ করেছেন এবং একজন মানুষ অন্য একজন মানুষের ওপর আস্থা স্থাপন করে 'আমানত' হিসেবে অর্পণ করে। ঠিক তেমনি চুক্তি বা প্রতিশ্রুতি মানে বান্দা আল্লাহর সাথে যে চুক্তি বা প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয় এবং মানুষ পরস্পরের সাথে যেসব চুক্তি ও প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয় এ উভয় প্রকার চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি। এ উভয় প্রকার আমানত এবং উভয় প্রকার চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা একজন মু'মিনের চরিত্রের অপরিহার্য বৈশিষ্ট। হাদীসে হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সামনে যে বক্তব্যই পেশ করতেন তাতে অবশ্যই বলতেন ঃ

لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهٗ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهٗ

"সাবধান, যার আমানতদারী নেই তার ঈমান নেই। আর যে অংগীকার বা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না তার মধ্যে দীনদারী নেই। (বায়হাকী–শু'আবুল ঈমান)।

২২. অর্থাৎ তারা সাক্ষ যেমন গোপন করে না, তেমনি তাতে তেমন কোন কম–বেশীও করে না।

২৩. এ থেকে নামাযের গুরুত্ব বুঝা যায়। যে ধরনের উন্নত চরিত্র ও মহৎ কর্মশীল লোক জান্নাতের উপযুক্ত তাদের গুণাবলী উল্লেখ করতে গিয়ে নামায দিয়ে শুরু করা হয়েছে এবং নামায দিয়েই শেষ করা হয়েছে। তাদের প্রথম গুণ হলো তারা হবে নামাযী।

فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿৩৬﴾ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ﴿৩৭﴾
أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴿৩৮﴾ كَلَّا ۖ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا
يَعْلَمُونَ ﴿৩৯﴾ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿৪০﴾
عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿৪১﴾ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا
وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿৪২﴾ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ
الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ ﴿৪৩﴾ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ
تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿৪৪﴾

২ রুকূ'

অতএব হে নবী, কি ব্যাপার যে, এসব কাফের ডান দিক ও বাম দিক হতে দলে দলে তোমার দিকে ছুটে আসছে?[২৪] তাদের প্রত্যেকে কি এ আশা করে যে, তাকে প্রাচুর্যে ভরা জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ দেয়া হবে?[২৫] কখ্খনো না। আমি যে জিনিস দিয়ে তাদের সৃষ্টি করেছি তারা নিজেরা তা জানে।[২৬] অতএব না,[২৭] আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলসমূহের মালিকের।[২৮] আমি তাদের চাইতে উৎকৃষ্টতর লোকদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করতে সক্ষম। আমাকে পেছনে ফেলে যেতে পারে এমন কেউ–ই নেই।[২৯] অতএব তাদেরকে অর্থহীন কথাবার্তা ও খেল–তামাসায় মত্ত থাকতে দাও, যেদিনটির প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেয়া হচ্ছে যতদিন না সেদিনটির সাক্ষাত তারা পায়। সেদিন তারা কবর থেকে বেরিয়ে এমনভাবে দৌড়াতে থাকবে যেন তারা নিজেদের দেব–প্রতিমার আস্তানার দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে।[৩০] সেদিন চক্ষু হবে আনত, লাঞ্ছনা তাদের আচ্ছন্ন করে রাখবে। ঐ দিনটিই সেদিন যার প্রতিশ্রুতি এদেরকে দেয়া হচ্ছে।

দ্বিতীয় গুণ হলো, তারা হবে নামাযের প্রতি নিষ্ঠাবান এবং সর্বশেষ গুণ হলো, তারা নামাযের হিফাযত করবে। নামাযের হিফাযতের অর্থ অনেক কিছু। যথা সময়ে নামায পড়া, দেহ ও পোশাক–পরিচ্ছদ পাক–পবিত্র আছে কিনা নামাযের পূর্বেই সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া, অযু থাকা এবং অযু করার সময় অংগ–প্রত্যংগগুলো ভালভাবে ধোয়া, নামাযের ফরয, ওয়াজিব ও মুস্তাহাবগুলো ঠিকমত আদায় করা, নামাযের নিয়ম–কানুন

পুরোপুরি মেনে চলা, আল্লাহর নাফরমানী করে নামাযকে ধ্বংস না করা, এসব বিষয়ও নামাযের হিফাযতের অন্তরভুক্ত।

২৪. যে সমস্ত লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ দেখে এবং কুরআনের বক্তব্য শুনে তা নিয়ে হাসি–তামাসা করা এবং তার প্রতি বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করার জন্য চারদিক থেকে ছুটে আসতো এখানে তাদের কথা বলা হয়েছে।

২৫. অর্থ হলো যেসব লোকের বৈশিষ্ট ও গুণাবলী এই মাত্র বর্ণনা করা হলো আল্লাহর জান্নাত তো তাদের জন্য নির্দিষ্ট। কিন্তু যারা সত্যের বাণী শোনা পর্যন্ত পছন্দ করে না এবং ন্যায় ও সত্যের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য এভাবে ছুটে আসছে তারা জান্নাতের দাবীদার কিভাবে হতে পারে? আল্লাহ কি এমন সব লোকদের জন্যই তাঁর জান্নাত তৈরী করেছেন? এ পর্যায়ে সূরা আল কলমের ৩৪ থেকে ৪১ আয়াত সামনে থাকা দরকার। মক্কার কাফেররা বলতো, আখেরাত যদি থাকেও তাহলে এ দুনিয়ায় তারা যেভাবে আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকছে, সেখানেও একইভাবে মত্ত থাকবে। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান পোষণকারী লোকেরা দুনিয়ায় যেভাবে দুরবস্থার শিকার হয়ে আছে সেখানেও ঠিক তাই থাকবে। উল্লেখিত আয়াতসমূহে কাফেরদের এ ধ্যান–ধারণার জবাব দেয়া হয়েছে।

২৬. এখানে এ আয়াতাংশের দু'টি অর্থ হতে পারে। আগে বর্ণিত বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত ধরে নিলে এর অর্থ হবে, যে উপাদানে এসব লোককে সৃষ্টি করা হয়েছে সে হিসেবে সব মানুষ সমান। জান্নাতে যাওয়ার কারণ যদি ঐ উপাদানটি হয় তাহলে সৎ ও অসৎ, জালেম ও ন্যায়নিষ্ঠ, অপরাধী ও নিরপরাধ সবারই জান্নাতে যাওয়া উচিত। কিন্তু জান্নাতে যাওয়ার অধিকার যে মানুষের সৃষ্টির উপাদানের ভিত্তিতে সৃষ্টি হয় না বরং শুধু তার গুণাবলীর ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়। এ বিষয়টির ফায়সালার জন্য সাধারণ বিবেক–বুদ্ধিই যথেষ্ট। আর এ আয়াতাংশকে যদি পরবর্তী বিষয়ের পূর্বাভাস বা ভূমিকা হিসেবে ধরে নেয়া হয় তাহলে তার অর্থ হবে এসব লোক নিজেরাই নিজেদেরকে আমার আযাব থেকে নিরাপদ মনে করছে আর যে ব্যক্তি আমার কাছে জবাবদিহি সম্পর্কে তাদেরকে সাবধান করে দেয় তাকে বিদ্রূপ ও হাসি–তামাসা করছে। অথচ আমি চাইলে যখন ইচ্ছা দুনিয়াতেও তাদেরকে আযাব দিতে পারি আবার যখন ইচ্ছা মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করেও উঠাতে পারি। তারা জানে নগণ্য এক ফোটা বীর্য দিয়ে আমি তাদের সৃষ্টির সূচনা করেছি এবং তারপর তাদেরকে সচল ও সক্ষম মানুষ বানিয়েছি। তাদের এ সৃষ্টি কৌশল সম্পর্কে যদি তারা চিন্তা–ভাবনা করতো তাহলে কখনো এ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী তারা হতো না যে, এখন তারা আমার কর্তৃত্বের গণ্ডির বাইরে কিংবা আমি তাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম নই।

২৭. অর্থাৎ তারা যা মনে করে বসে আছে ব্যাপার আসলে তা নয়।

২৮. এখানে মহান আল্লাহ নিজেই নিজের সত্তার শপথ করেছেন। "উদয়াচলসমূহ ও অস্তাচলসমূহ" এ শব্দ ব্যবহারের কারণ হলো, গোটা বছরের আবর্তন কালে সূর্য প্রতিদিনই একটি নতুন কোণ থেকে উদিত হয় এবং একটি নতুন কোণে অস্ত যায়।

তাছাড়াও ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে সূর্য ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ক্রমাগত উদিত ও অস্তমিত হতে থাকে। এ হিসেবে সূর্যের উদয় হওয়ার ও অস্ত যাওয়ার স্থান একটি নয়, অনেক। আরেক হিসেবে উত্তর ও দক্ষিণ দিকের তুলনায় একটি দিক হলো পূর্ব এবং আরেকটি দিক হলো পশ্চিম। তাই সূরা শূ'আরার ২৮ আয়াতে এবং সূরা মুয্যাম্মিলের ১৯ আয়াতে رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরেক বিচারে পৃথিবীর দু'টি উদয়াচল এবং দু'টি অস্তাচল আছে। কারণ পৃথিবীর এক গোলার্ধে যখন সূর্য অস্ত যায় তখন অপর গোলার্ধে উদিত হয়। এ কারণে সূরা আর রাহমানের ১৭ আয়াতে رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আর রাহমান, টীকা ১৭)

২৯. একথাটির জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাঁর দু'টি উদয়াচল ও দু'টি অস্তাচলের মালিক হওয়ার শপথ করেছেন। এর অর্থ হলো, আমি যেহেতু উদয়াচল ও অস্তাচলসমূহের মালিক তাই গোটা পৃথিবীই আমার কর্তৃত্বাধীন। আমার কর্তৃত্ব ও পাকড়াও থেকে রক্ষা পাওয়া তোমাদের সাধ্যাতীত। যখন ইচ্ছা আমি তোমাদেরকে ধ্বংস করতে পারি এবং তোমাদের চাইতে উৎকৃষ্টতর কোন জাতির উত্থান ঘটিয়ে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারি।

৩০. মূল আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ হলো إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ । نُصُب শব্দের অর্থের ব্যাপারে মুফাস্সিরগণ দ্বিমত পোষণ করেছেন। অনেকে এর অর্থ করেছেন মূর্তি বা প্রতিমা। তাদের মতে এর অর্থ হলো, তারা হাশরের অধিপতির নির্ধারিত জায়গার দিকে দৌড়িয়ে অগ্রসর হতে থাকবে ঠিক; আজ যেমন তারা তাদের দেব-দেবীর আস্তানার দিকে ছুটে যায়। আবার অন্য আরেক দল মুফাস্সিরের মতে এর অর্থ দৌড়ে অংশ গ্রহণকারীদের জন্য চিহ্নিত গন্তব্য স্থল। প্রত্যক প্রতিদ্বন্দ্বী যাতে সবার আগে সেখানে পৌছতে চেষ্টা করে।

নূহ

৭১

নামকরণ

'নূহ' এ সূরার নাম। এর বিষয়বস্তুর শিরোনামও 'নূহ'। কারণ এতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত হযরত 'নূহ' আলাইহিস সালামের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এটিও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে নাযিল হওয়া সূরাসমূহের অন্যতম। তবে এর বিষয়বস্তুর আভ্যন্তরীণ সাক্ষ থেকে ইংগিত পাওয়া যায় যে, যে সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত ও তাবলীগের বিরুদ্ধে মক্কার কাফেরদের শত্রুতামূলক আচরণ বেশ তীব্রতা লাভ করেছিল তখন এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এতে হযরত নূহ আলাইহিস সালামের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। তবে তা কেবল কাহিনী বর্ণনার উদ্দেশ্যে করা হয়নি। বরং এর উদ্দেশ্য মক্কার কাফেরদের এ মর্মে সাবধান করা যে, হযরত নূহ আলাইহিস সালামের সাথে তার কওম যে আচরণ করেছিল তোমরাও হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সে একই আচরণ করছো। তোমরা যদি এ আচরণ থেকে বিরত না হও তাহলে তোমাদেরও সে একই পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে যার সম্মুখীন হয়েছিল ঐ সব লোকেরা। গোটা সূরার মধ্যে একথাটি স্পষ্ট ভাষায় কোথাও বলা হয়নি। কিন্তু যে অবস্থা ও পরিস্থিতিতে মক্কাবাসীদের এ কাহিনী শুনানো হয়েছে তার পটভূমিতে এ বিষয়টি আপনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

যে সময় আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ আলাইহিস সালামকে রিসালাতের পদ মর্যাদায় অভিসিক্ত করেছিলেন সে সময় তার ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন প্রথম আয়াতে তা বলা হয়েছে।

তিনি তাঁর দাওয়াত কিভাবে শুরু করেছিলেন এবং স্বজাতির মানুষের সামনে কি বক্তব্য পেশ করেছিলেন।

২ থেকে ৪ আয়াতে তা সংক্ষিপ্তাকারে বলা হয়েছে, এরপর দীর্ঘকাল পর্যন্ত দীনের দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট বরণ করার পর তার যে বর্ণনা হযরত

নূহ আলাইহিস সালাম আল্লাহর দরবারে পেশ করেছিলেন ৫ থেকে ২০ আয়াতে তা বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি তাঁর জাতিকে সত্য পথে আনার জন্য কিভাবে চেষ্টা–সাধনা করেছেন আর তার জাতির লোকেরা কি রকম হঠকারিতার মাধ্যমে তার বিরোধিতা করেছে এ পর্যায়ে তিনি তার সবই তাঁর প্রভুর সামনে পেশ করেছেন।

এরপর ২১ থেকে ২৪ আয়াতে হযরত নূহ আলাইহিস সালামের শেষ আবেদনের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এতে তিনি মহান আল্লাহর কাছে এ মর্মে আবেদন করছেন যে, এ জাতি আমার দাওয়াত চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। এরা তাদের নেতাদের হাতে নিজেদের লাগাম তুলে দিয়েছে এবং বিরাট ও ব্যাপক ষড়যন্ত্র–জাল বিস্তার করেছে। এখন তাদের থেকে হিদায়াত গ্রহণ করার শুভবুদ্ধি ও যোগ্যতা ছিনিয়ে নেয়ার সময় এসে গেছে। হযরত নূহ আলাইহিস সালামের পক্ষ থেকে এটা কোন প্রকার অধৈর্যের বহিপ্রকাশ ছিল না। বরং শত শত বছর ধরে ধৈর্যের চরম পরীক্ষার মত পরিবেশ–পরিস্থিতির মধ্যে দীনের তাবলীগের দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার পর যে সময় তিনি তাঁর কওমের ব্যাপারে পুরোপুরি নিরাশ হয়ে গেলেন কেবল তখনই তিনি এ সিদ্ধান্তে পৌছলেন যে, এখন এ জাতির সত্য ও ন্যায়ের পথে আসার আর কোন সম্ভাবনাই অবশিষ্ট নেই। তাঁর এ সিদ্ধান্ত ছিল হুবহু আল্লাহ তা'আলার ফায়সালার অনুরূপ। তা–ই এর পরবর্তী ২৫ আয়াতেই বলা হয়েছে। এ জাতির কৃতকর্মের কারণে তাদের ওপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আযাব নাযিল হলো।

আযাব নাযিল হওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে হযরত নূহ আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা'আলার কাছে যে দোয়া করেছিলেন শেষ আয়াতটিতে তা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে তিনি নিজের ও ঈমানদারদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছেন এবং নিজ কওমের কাফেরদের জন্য এ মর্মে আল্লাহর কাছে আবেদন করছেন যেন তাদের কাউকেই পৃথিবীর বুকে বসবাস করার জন্য জীবিত রাখা না হয়। কারণ, তাদের মধ্যে এখন আর কোন কল্যাণই অবশিষ্ট নেই। তাই তাদের ঔরসে এখন যারাই জন্মলাভ করবে তারাই কাফের এবং পাপী হিসেবেই বেড়ে উঠবে।

এ সূরা অধ্যয়নকালে ইতিপূর্বে কুরআন মজীদে হযরত নূহ আলাইহিস সালামের কাহিনীর যে বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করা হয়েছে তাও সামনে থাকা দরকার। দেখুন, সূরা আল আ'রাফ, আয়াত ৫৯ থেকে ৬৪; ইউনুস, ৭১ থেকে ৭৩; হূদ, ২৫ থেকে ৪৯; আল মু'মিনূন, ২৩ থেকে ৩১; আশ শু'আরা, ১০৫ থেকে ১২২; আল আনকাবুত, ১৪ ও ১৫; আস্ সাফ্ফাত, ৭৫ থেকে ৮২ এবং আল কামার, ৯ থেকে ১৬ আয়াত পর্যন্ত।

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١﴾ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢﴾ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿٣﴾ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ ۖ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾

আমি নূহকে তার জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম (এ নির্দেশ দিয়ে) যে, একটি কষ্টদায়ক আযাব আসার আগেই তুমি তাদেরকে সাবধান করে দাও।[১]

সে বললো, হে আমার জাতি, আমি তোমাদের জন্য একজন সতর্ককারী (বার্তাবাহক, আমি তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছি) যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো, তাঁকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো,[২] আল্লাহ তোমাদের গোনাহ মাফ করে দেবেন[৩] এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ দেবেন।[৪] প্রকৃত ব্যাপার হলো, আল্লাহর নির্ধারিত সময় যখন এসে যায় তখন তা থেকে বাঁচা যায় না।[৫] আহ্! যদি তোমরা তা জানতে।[৬]

১. অর্থাৎ একথা জানিয়ে দেবেন যে, তারা যে বিভ্রান্তি ও নৈতিক অনাচারের মধ্যে পড়ে আছে যদি তা থেকে বিরত না হয় তাহলে তা তাদের আল্লাহর আযাবের উপযুক্ত করে দেবে। এ আযাব থেকে বাঁচার জন্য কোন্ পথ অবলম্বন করতে হবে তাও তাদের বলে দেবেন।

২. হযরত নূহ্ আলাইহিস সালাম তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব পালনের শুরুতেই তাঁর জাতির সামনে এ তিনটি বিষয় পেশ করেছিলেন। অর্থাৎ এক, আল্লাহর দাসত্ব, দুই, তাকওয়া বা আল্লাহভীতি এবং তিন, রসূলের আনুগত্য। আল্লাহর দাসত্বের মানে অন্য সব কিছুর দাসত্ব ও গোলামী বর্জন করে এক আল্লাহকেই শুধু উপাস্য মেনে নিয়ে কেবল তাঁরই উপাসনা করা এবং তাঁরই আদেশ–নিষেধ মেনে চলা। তাকওয়া বা আল্লাহভীতির মানে এমন সব কাজ থেকে বিরত থাকা যা আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও গযবের কারণ হয় এবং

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ۝٥ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءِي إِلَّا فِرَارًا ۝٦ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ۝٧ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ۝٨ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۝٩ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۝١٠

সে[৭] বললো ঃ হে আমার রব, আমি আমার কওমের লোকদের রাতদিন আহবান করেছি। কিন্তু আমার আহবান তাদের দূরে সরে যাওয়াকে কেবল বাড়িয়েই তুলেছে।[৮] তুমি যাতে তাদের ক্ষমা করে দাও[৯] এ উদ্দেশ্যে আমি যখনই তাদের আহবান করেছি তখনই তারা কানে আঙুল দিয়েছে,[১০] এবং কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে নিয়েছে, নিজেদের আচরণে অনড় থেকেছে এবং অতি মাত্রায় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে।[১১] অতপর আমি তাদেরকে উচ্চকন্ঠে আহবান জানিয়েছি। তারপর প্রকাশ্যে তাদের কাছে তাবলীগ করেছি এবং গোপনে চুপে চুপে বুঝিয়েছি। আমি বলেছি তোমরা নিজেদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা চাও। নিসন্দেহে তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল।

নিজেদের জীবনে এমন নীতি গ্রহণ করো যা একজন আল্লাহভীরু মানুষের গ্রহণ করা উচিত। আর আমার আনুগত্য করো একথাটির মানে হলো, আল্লাহর রসূল হিসেবে তোমাদের যেসব আদেশ দেই তা মেনে চলো।

৩. মূল ইবারাতে শব্দ আছে يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ এ আয়াতাংশের অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ তোমাদের কিছু গোনাহ মাফ করে দেবেন। বরং এর সঠিক অর্থ হলো, যে তিনটি বিষয় তোমাদের সামনে পেশ করা হচ্ছে তা যদি তোমরা মেনে নাও তাহলে এতদিন পর্যন্ত যে গোনাহ তোমরা করেছো তা সবই আল্লাহ মাফ করে দেবেন। এখানে مِنْ শব্দটি অংশবিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়নি।

৪. অর্থাৎ যদি তোমরা এ তিনটি বিষয় মেনে নাও তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের স্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য যে সময় নির্ধারিত রেখেছেন সে সময় পর্যন্ত এ পৃথিবীতে তোমাদের বেঁচে থাকার অবকাশ দেয়া হবে।

৫. কোন কওমের ওপর আযাব নাযিল করার জন্য আল্লাহ তা'আলা যে সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এখানে সে সময়টিকে বুঝানো হয়েছে। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কোন কওমের জন্য আযাবের ফায়সালা হয়ে যাওয়ার পর ঈমান আনলেও তাদের আর মাফ করা হয় না।

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿١١﴾ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ
لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿١٢﴾ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿١٣﴾ وَقَدْ خَلَقَكُمْ
أَطْوَارًا ﴿١٤﴾ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ﴿١٥﴾ وَجَعَلَ الْقَمَرَ
فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿١٦﴾ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
نَبَاتًا ﴿١٧﴾ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿١٨﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ
بِسَاطًا ﴿١٩﴾ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿٢٠﴾

তিনি আকাশ থেকে তোমাদের ওপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষাবেন। সম্পদ ও সন্তান–সন্ততি দিয়ে সাহায্য করবেন, তোমাদের জন্য বাগান সৃষ্টি করবেন আর নদী–নালা প্রবাহিত করে দিবেন।[১২] তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর মাহাত্ম্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা আছে বলে মনে করছো না।[১৩] অথচ তিনিই তোমাদের পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন।[১৪] তোমরা কি দেখ না, আল্লাহ কিভাবে সাত স্তরে বিন্যস্ত করে আসমান সৃষ্টি করেছেন? ওগুলোর মধ্যে চাঁদকে আলো এবং সূর্যকে প্রদীপ হিসেবে স্থাপন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে মাটি থেকে বিস্ময়কররূপে উৎপন্ন করেছেন।[১৫] আবার এ মাটির মধ্যে তোমাদের ফিরিয়ে নেবেন এবং অকস্মাৎ এ মাটি থেকেই তোমাদের বের করে আনবেন। আল্লাহ ভূপৃষ্ঠকে তোমাদের জন্য বিছানার মত করে পেতে দিয়েছেন। যেন তোমরা এর প্রশস্ত পথে চলতে পার।

৬. অর্থাৎ যদি তোমরা এ বিষয়টি বুঝতে যে, আমার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার বাণী তোমাদের কাছে পৌঁছার পর যে সময়টা অতিবাহিত হচ্ছে তা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের জন্য একটা অবকাশ। তোমাদেরকে এ অবকাশ দেয়া হয়েছে ঈমান আনয়নের জন্য। এ অবকাশের জন্য নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহর আযাব থেকে তোমাদের নিষ্কৃতি পাওয়ার আর কোন সম্ভাবনা নেই। এ অবস্থায় ঈমান আনয়নের জন্য তোমরা দ্রুত এগিয়ে আসবে। আযাব আসার সময় পর্যন্ত তা আর বিলম্বিত করবে না।

৭. মাঝখানে একটা দীর্ঘকালের ইতিহাস বাদ দিয়ে নূহ আলাইহিস সালামের আবেদন তুলে ধরা হচ্ছে যা তিনি তাঁর রিসালাতের শেষ যুগে আল্লাহর সামনে পেশ করেছিলেন।

৮. অর্থাৎ আমি যতই তাদেরকে আহবান করেছি তারা ততই দূরে সরে গিয়েছে।

৯. এর মধ্যেই একথাটি নিহিত আছে যে, তারা নাফরমানীর আচরণ পরিহার করে ক্ষমাপ্রার্থী হবে। কারণ কেবল এভাবেই তারা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ক্ষমা লাভ করতে পারতো।

১০. মুখ ঢাকার একটি কারণ হতে পারে, তারা হযরত নূহ আলাইহিস সালামের বক্তব্য শোনা তো দূরের কথা তাঁর চেহারা দেখাও পছন্দ করতো না। আরেকটি কারণ হতে পারে, তারা তাঁর সম্মুখ দিয়ে যাওয়ার সময় মুখ ঢেকে চলে যেতো যাতে তিনি তাদের চিনে কথা বলার কোন সুযোগ আদৌ না পান। মক্কার কাফেররা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যে ধরনের আচরণ করছিলো সেটিও ছিল অনুরূপ একটি আচরণ। সূরা হূদের ৫ আয়াতে তাদের এ আচরণের উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে "দেখ, এসব লোক তাদের বক্ষ ঘুরিয়ে নেয় যাতে তারা রসূলের চোখের আড়ালে থাকতে পারে। সাবধান! যখন এরা কাপড় দ্বারা নিজেদেরকে ঢেকে আড়াল করে তখন আল্লাহ তাদের প্রকাশ্য বিষয়গুলোও জানেন এবং গোপন বিষয়গুলোও জানেন। তিনি তো মনের মধ্যকার গোপন কথাও জানেন। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা হূদ, টীকা ৫ ও ৬)

১১. এখানে تكبر বা ঔদ্ধত্যের মানে হলো তারা ন্যায় ও সত্যকে মেনে নেয়া এবং আল্লাহর রসূলের উপদেশ গ্রহণ করাকে তাদের মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বের তুলনায় নীচু কাজ বলে মনে করেছে। উদাহরণ স্বরূপ কোন সৎ ও ভাল লোক যদি কোন দুশ্চরিত্র ব্যক্তিকে উপদেশ দান করে আর সে জন্য ঐ ব্যক্তি ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে পড়ে এবং মাটিতে পদাঘাত করে বেরিয়ে যায় তাহলে বুঝা যাবে যে, সে ঔদ্ধত্যের সাথে উপদেশ বাণী প্রত্যাখ্যান করেছে।

১২. একথাটি কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহদ্রোহিতার আচরণ মানুষের জীবনকে শুধু আখেরাতেই নয় দুনিয়াতেও সংকীর্ণ করে দেয়। অপর পক্ষে কোন জাতি যদি অবাধ্যতার বদলে ঈমান, তাকওয়া এবং আল্লাহর আদেশ–নিষেধ মেনে চলার পথ অনুসরণ করে তাহলে তা শুধু আখেরাতের জন্যই কল্যাণকর হয় না, দুনিয়াতেও তার ওপর আল্লাহর অশেষ নিয়ামত বর্ষিত হতে থাকে। সূরা ত্বা–হায় বলা হয়েছে ঃ "যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তার দুনিয়ার জীবন হবে সংকীর্ণ। আর কিয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ করে উঠাবো।" (আয়াত ১২৪) সূরা মা–য়েদায় বলা হয়েছেঃ "আহলে কিতাব যদি তাদের কাছে তাদের রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত 'তাওরাত', 'ইনযীল' ও অন্যান্য আসমানী কিতাবের বিধানাবলী মেনে চলতো তাহলে তাদের জন্য ওপর থেকেও রিযিক বর্ষিত হতো এবং নীচ থেকেও ফুটে বের হতো।" (আয়াত ৬৬) সূরা আ'রাফে বলা হয়েছে ঃ জনপদসমূহের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনতো এবং তাকওয়ার নীতি অনুসরণ করতো তাহলে আমি তাদের জন্য আসমান ও যমীনের বরকতের দরজাসমূহ খুলে দিতাম। (আয়াত ৯৬) সূরা হূদে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত হূদ আলাইহিস সালাম তাঁর কওমের লোকদের বললেন ঃ "হে আমার কওমের লোকেরা, তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করো, তার দিকে ফিরে যাও। তিনি তোমাদের ওপর আসমান থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং তোমাদের শক্তি ও ক্ষমতা আরো বাড়িয়ে দেবেন।" (আয়াত ৫২) খোদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দিয়ে মক্কার লোকদের সম্বোধন করে এ সূরা হূদেই বলা হয়েছে ঃ "আর তোমরা যদি তোমাদের রবের কাছে

ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তাঁর দিকে ফিরে আস তাহলে তিনি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদের উত্তম জীবনোপকরণ দান করবেন।" (আয়াত ৩) হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদের বললেন ঃ একটি কথা যদি তোমরা মেনে নাও তাহলে আরব ও আজমের শাসনদণ্ডের অধিকারী হয়ে যাবে। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা মা–য়েদাহ, টীকা ৯৬; সূরা হূদ, টীকা ৩ ও ৫৭; সূরা ত্বা–হা, টীকা ১০৫ এবং সূরা সোয়াদের ভূমিকা)।

কুরআন মজীদের এ নির্দেশনা অনুসারে কাজ করতে গিয়ে একবার দুর্ভিক্ষের সময় হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বৃষ্টির জন্য দোয়া করতে বের হলেন এবং শুধু ইসতিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করেই শেষ করলেন। সবাই বললো, 'হে আমীরুল মু'মিনীন আপনি তো আদৌ দোয়া করলেন না। তিনি বললেন ঃ আমি আসমানের ঐ সব দরজায় করাঘাত করেছি যেখান থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। একথা বলেই তিনি সূরা নূহের এ আয়াতগুলো তাদের পাঠ করে শুনালেন। (ইবনে জারীর ও ইবনে কাসীর) অনুরূপ একবার এক ব্যক্তি হাসান বাসরীর মজলিসে অনাবৃষ্টির অভিযোগ করলে তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। অপর এক ব্যক্তি দারিদ্র্যের অভিযোগ করলো। তৃতীয় এক ব্যক্তি বললো ঃ আমার কোন ছেলেমেয়ে নেই। চতুর্থ এক ব্যক্তি বললো ঃ আমার ফসলের মাঠে ফলন খুব কম হচ্ছে। তিনি সবাইকে একই জবাব দিলেন। অর্থাৎ আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। লোকেরা বললো ঃ কি ব্যাপার যে, আপনি প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন অভিযোগের একই প্রতিকার বলে দিচ্ছেন? তখন তিনি সূরা নূহের এ আয়াতগুলো পাঠ করে শুনালেন। (কাশশাফ)

১৩. অর্থাৎ দুনিয়ার ছোট ছোট নেতা ও বিশেষ ব্যক্তিদের সম্পর্কে তো তোমরা মনে করো, তাদের মাহাত্ম্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার পরিপন্থী কোন আচরণ বিপজ্জনক। কিন্তু বিশ্ব–জাহানের মালিক আল্লাহ সম্পর্কে এতটুকুও মনে করো না যে, তিনিও মাহাত্ম্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার অধিকারী সত্তা। তোমরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছো, তাঁর প্রভুত্বের মধ্যে অন্যকে শরীক করছো, তাঁর আদেশ–নিষেধ অমান্য করছো, এসব সত্ত্বেও তাঁকে তোমরা এতটুকু ভয়ও করো না যে, এ জন্য তিনি তোমাদের শাস্তি দেবেন।

১৪. অর্থাৎ সৃষ্টিকর্মের বিভিন্ন পর্যায় ও স্তর অতিক্রম করে তোমাদের বর্তমান অবস্থায় পৌছানো হয়েছে। প্রথমে তোমরা বীর্য আকারে মা-বাপের দেহে ছিলে। অতপর আল্লাহর বিধান ও সৃষ্টি কৌশল অনুসারে এ দু'টি বীর্য সংমিশ্রিত হয়ে তোমরা মাতৃগর্ভে স্থিতি লাভ করেছিলে। এরপর মাতৃগর্ভে দীর্ঘ নয়টি মাস ধরে ক্রমবিকাশ ও উন্নয়ন ঘটিয়ে তোমাদের পূর্ণাংগ মানবাকৃতি দেয়া হয়েছে এবং মানুষ হিসেবে দুনিয়াতে কাজ করার জন্য যে শক্তি ও যোগ্যতার প্রয়োজন তা তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। তারপর তোমরা একটি জীবন্ত শিশু হিসেবে মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে এসেছো, প্রতি মুহূর্তেই একটি অবস্থা থেকে আরেকটি অবস্থায় তোমাদের উত্তরণ ঘটানো হয়েছে। অবশেষে তোমরা যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়েছো। এসব পর্যায় অতিক্রমকালে প্রতি মুহূর্তেই তোমরা পুরোপুরি আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ ও কবজায় ছিলে। তিনি ইচ্ছা করলে তোমার জন্মের জন্য গর্ভ সঞ্চারই হতে দিতেন না এবং সে গর্ভে তোমার পরিবর্তে অন্য কেউ স্থিতিলাভ করতো। তিনি চাইলে মাতৃগর্ভেই তোমাদেরকে অন্ধ, বধির, বোবা কিংবা বিকলাঙ্গ করে দিতেন অথবা তোমাদের

قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ﴿٢١﴾ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ﴿٢٢﴾ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا ۖ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴿٢٤﴾

২ রুকূ'

নূহ বললো ঃ হে প্রভু, তারা আমার কথা প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ঐ সব নেতার অনুসরণ করেছে যারা সম্পদ ও সন্তান–সন্ততি পেয়ে আরো বেশী ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। এসব লোক সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র–জাল বিস্তার করে রেখেছে।[১৬] তারা বলেছে, তোমরা নিজেদের দেব–দেবীদের কোন অবস্থায় পরিত্যাগ করো না। আর ওয়াদ, সুওয়া'আ, ইয়াগুস, ইয়াউক এবং নাস্‌রকেও[১৭] পরিত্যাগ করো না। অথচ এসব দেব–দেবী বহু লোককে গোমরাহীতে নিক্ষেপ করেছে। তুমিও এসব জালেমদের জন্য গোমরাহী ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করো না।[১৮]

বিবেক–বুদ্ধি বিশৃংখল ও ত্রুটিপূর্ণ করে দিতেন। তিনি চাইলে তোমরা জীবন্ত শিশুরূপে জন্ম লাভই করতে পারতে না। জন্মলাভের পরও যে কোন মুহূর্তে তিনি তোমাদের ধ্বংস করতে পারতেন। তাঁর একটি মাত্র ইংগিতেই তোমরা কোন দুর্ঘটনার শিকার হয়ে যেতে। যে আল্লাহর কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণে তোমরা এতটা অসহায় তাঁর সম্পর্কে কি করে এ ধারণা পোষণ করে বসে আছো যে, তাঁর সাথে সব রকম ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও অকৃতজ্ঞতার আচরণ করা যেতে পারে, তাঁর বিরুদ্ধে সব রকম বিদ্রোহ করা যেতে পারে। কিন্তু এসব আচরণের জন্য তোমাদের কোন শাস্তি ভোগ করতে হবে না?

১৫. এ স্থানে মাটির উপাদান থেকে মানুষ সৃষ্টি করাকে উদ্ভিদ উৎপন্ন হওয়ার সাথে উপমা দেয়া হয়েছে। কোন এক সময় যেমন এই গ্রহে উদ্ভিদরাজি ছিল না। মহান আল্লাহই এখানে উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছেন। ঠিক তেমনি এক সময়ে এ ভূপৃষ্ঠে কোন মানুষের অস্তিত্ব ছিল না। আল্লাহ তা'আলাই এখানে তাদের সৃষ্টি করেছেন।

১৬. ষড়যন্ত্রের অর্থ হলো জাতির লোকদের সাথে নেতাদের ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা। নেতারা জাতির লোকদের হযরত নূহ আলাইহিস সালামের শিক্ষার বিরুদ্ধে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত করার চেষ্টা করতো। যেমন, তারা বলতো ঃ "নূহ তো তোমাদের মতই একজন মানুষ। আল্লাহর কাছ থেকে তার কাছে অহী এসেছে তা কি করে মেনে নেয়া যায়?" (সূরা আ'রাফ, ৬৩; হূদ–২৭) "আমাদের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা না বুঝে শুনে নূহের আনুগত্য করছে। তার কথা যদি সত্যিই মূল্যবান হতো তাহলে জাতির নেতা ও জ্ঞানী–গুণী ব্যক্তিবর্গ তার প্রতি বিশ্বাস পোষণ করতো।" (হূদ–২৭) "আল্লাহ যদি পাঠাতেই চাইতেন

তাহলে কোন ফেরেশতা পাঠাতেন।" (আল মু'মিনূন, ২৪) এ ব্যক্তি যদি আল্লাহর প্রেরিত রসূল হতেন, তাহলে তাঁর কাছে সবকিছুর ভাণ্ডার থাকতো, তিনি অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জানতেন এবং ফেরেশতাদের মত সব রকম মানবীয় প্রয়োজন ও অভাব থেকে মুক্ত হতেন। (হূদ, ৩১) নূহ এবং তার অনুসারীদের এমন কি অলৌকিকত্ব আছে যার জন্য তাদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিতে হবে? (হূদ, ২৭) এ ব্যক্তি আসলে তোমাদের মধ্যে তার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। (আল মু'মিনূন, ২৫) প্রায় এ রকম কথা বলেই কুরাইশ নেতারা লোকদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে বিভ্রান্ত করতো।

১৭. নূহের কওমের উপাস্যদের দেবীদের মধ্য থেকে এখানে সেসব দেব–দেবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে পরবর্তীকালে মক্কাবাসীরা যাদের পূজা করতে শুরু করেছিল এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগে আরবের বিভিন্ন স্থানে তাদের মন্দিরও বর্তমান ছিল। এটা অসম্ভব নয় যে, মহা প্লাবনে যেসব লোক রক্ষা পেয়েছিল পরবর্তী বংশধরগণ তাদের মুখ থেকে নূহের (আ) জাতির প্রাচীন উপাস্য দেব–দেবীদের নাম শুনেছিল এবং পরে তাদের বংশধরদের নতুন করে জাহেলিয়াত ছড়িয়ে পড়লে তারা সেসব দেব–দেবীর প্রতিমা তৈরী করে তাদের পূজা অর্চনা শুরু করেছিল।

'ওয়াদ্দ' ছিল 'কুদা'আ' গোত্রের 'বনী কালব ইবনে দাবূরা' শাখার উপাস্য দেবতা। 'দুমাতুল জানদাল' নামক স্থানে তারা এর বেদী নির্মাণ করে রেখেছিল। আরবের প্রাচীন শিলালিপিতে তার নাম 'ওয়াদ্দাম আবাম' (ওয়াদ্দ বাপু) উল্লেখিত আছে। কালবীর মতে তার মূর্তি ছিল এক বিশালদেহী পুরুষের আকৃতিতে নির্মিত। কুরাইশরাও তাকে উপাস্য দেবতা হিসেবে মানতো। তাদের কাছে এর নাম ছিল 'উদ্দ'। তার নাম অনুসারে ইতিহাসে 'আবদে উদ্দ' নামে এক ব্যক্তির উল্লেখ দেখা যায়।

'সুওয়া' ছিল হুযাইল গোত্রের দেবী। তার মূর্তি ছিল নারীর আকৃতিতে তৈরী। ইয়াম্বুর সন্নিকটস্থ 'রুহাত' নামক স্থানে তার মন্দির ছিল।

'ইয়াগুস' ছিল 'তায়' গোত্রের 'আনউম' শাখার এবং 'মাযহিজ' গোত্রের কোন কোন শাখার উপাস্য দেবতা। 'মাযহিজে'র শাখা গোত্রের লোকেরা ইয়ামান ও হিজাযের মধ্যবর্তী 'জুরাশ' নামক স্থানে তার সিংহাকৃতির মূর্তি স্থাপন করে রেখেছিল। কুরাইশ গোত্রেরও কোন কোন লোকের নাম আবদে ইয়াগুস ছিল বলে দেখা যায়।

'ইয়াউক' ইয়ামানের হামদান অঞ্চলের অধিবাসী হামদান গোত্রের 'খায়ওয়ান' শাখার উপাস্য দেবতা ছিল। এর মূর্তি ছিল ঘোড়ার আকৃতির।

'নাসর' ছিল হিমইয়ার অঞ্চলের হিমইয়ার গোত্রের 'আলে যুল–কুলা' শাখার দেবতা। বালখা' নামক স্থানে তার মূর্তি ছিল। এ মূর্তির আকৃতি ছিল শকুনের মত। সাবার প্রাচীন শিলালিপিতে এর নাম উল্লেখিত হয়েছে 'নাসূর'। এর মন্দিরকে লোকেরা 'বায়তে নাসূর' বা নাসূরের ঘর এবং এর পূজারীদের 'আহলে নাসূর' বা নাসূরের পূজারী বলতো। প্রাচীন মন্দিরসমূহের যে ধ্বংসাবশেষ আরব এবং তার সন্নিহিত অঞ্চলসমূহে পাওয়া যায় সেসব মন্দিরের অনেকগুলোর দরজায় শকুনের চিত্র খোদিত দেখা যায়।

مِمَّا خَطِيْئٰتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا ۙ فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْصَارًا ﴿٢٥﴾ وَقَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا ﴿٢٦﴾ اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْٓا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٢٧﴾ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا ﴿٢٨﴾

নিজেদের অপরাধের কারণেই তাদের নিমজ্জিত করা হয়েছিল তারপর আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।[১৯] অতপর তারা আল্লাহর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কোন সাহায্যকারী পায়নি।[২০] আর নূহ বললো : হে আমার রব, এ কাফেরদের কাউকে পৃথিবীর বুকে বসবাসের জন্য রেখো না। তুমি যদি এদের ছেড়ে দাও তাহলে এরা তোমার বান্দাদের বিভ্রান্ত করবে এবং এদের বংশে যারাই জন্মলাভ করবে তারাই হবে দুষ্কৃতকারী ও কাফের। হে আমার রব, আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যারা মু'মিন হিসেবে আমার ঘরে প্রবেশ করেছে তাদেরকে এবং সব মু'মিন নারী-পুরুষকে ক্ষমা করে দাও। জালেমদের জন্য ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করো না।

১৮. এ সূরার ভূমিকাতেই আমরা এ বিষয়টি উল্লেখ করেছি যে, হযরত নূহ আলাইহিস সালামের এ বদদোয়া কোন প্রকার ধৈর্যহীনতার কারণে ছিল না। বরং এ বদদোয়া তাঁর মুখ থেকে তখনই উচ্চারিত হয়েছিল যখন তাবলীগ ও দাওয়াতের ক্ষেত্রে শত শত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর তিনি তাঁর জাতির ব্যাপারে পুরোপুরি নিরাশ হয়েছিলেন। হযরত মূসাও এরূপ পরিস্থিতিতেই ফেরাউন ও ফেরাউনের কওমের জন্য এ বলে বদদোয়া করেছিলেন : "হে প্রভু! তুমি এদের অর্থ-সম্পদ ধ্বংস করে দাও এবং তাদের দিলের ওপর মোহর লাগিয়ে দাও, এরা কঠিন আযাব না দেখা পর্যন্ত ঈমান আনবে না।" তার জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেছিলেন : তোমার দোয়া কবুল করা হয়েছে। (ইউনুস, আয়াত ৮৮-৮৯) হযরত মূসা আলাইহিস সালামের বদদোয়ার মত নূহ আলাইহিস সালামের এ বদদোয়াও ছিল আল্লাহর ইচ্ছার প্রতিধ্বনি। তাই সূরা হূদে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَاُوْحِيَ اِلٰى نُوْحٍ اَنَّهُ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ○

"আর অহী পাঠিয়ে নূহকে জানিয়ে দেয়া হলো, এ পর্যন্ত তোমার কওমের যেসব লোক ঈমান এনেছে এখন তারা ছাড়া আর কেউ ঈমান আনবে না। তাদের কৃতকর্মের জন্য আর দুঃখ করো না।" (হূদ, ৩৬)

১৯. অর্থাৎ নিমজ্জিত হওয়াতেই তাদের ব্যাপারটা চূড়ান্তভাবে শেষ হয়ে যায়নি। বরং ধ্বংস হওয়ার পরপরই তাদের রূহসমূহকে আগুনের কঠিন শাস্তির মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে। এ আচরণের সাথে ফেরাউন ও তার জাতির সাথে কৃত আচরণের হুবহু মিল রয়েছে। এ বিষয়টিই সূরা আল মু'মিনের ৪৫ ও ৪৬ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল মু'মিন, টীকা-৬৩) যেসব আয়াত দ্বারা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের আযাব বা কবরের আযাব প্রমাণিত হয় এ আয়াতটি তারই একটি।

২০. অর্থাৎ তারা যেসব দেব-দেবীকে সাহায্যকারী মনে করতো সেসব দেব-দেবীর কেউ-ই তাদের রক্ষা করতে আসেনি। এটা যেন মক্কাবাসীদের জন্য এ মর্মে সতর্কবাণী যে, তোমরাও যদি আল্লাহর আযাবে পাকড়াও হও তা হলে যেসব দেব-দেবীর ওপর তোমরা ভরসা করে আছ তারা তোমাদের কোন কাজেই আসবে না।

আল জিন

৭২

নামকরণ

আল জিন এ সূরার নাম। এর বিষয়বস্তুর শিরোনামও আল জিন। কারণ এতে কুরআন শুনে জিনদের নিজেদের জাতির কাছে যাওয়া এবং তাদের মধ্যে ইসলামের তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজ করার ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বুখারী ও মুসলিম হাদীস গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েকজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে উকাযের বাজারে যাচ্ছিলেন। পথে নাখলা নামক স্থানে তিনি ফজরের নামাযে ইমামতি করেন। সে সময় একদল জিন ঐ স্থান অতিক্রম করছিলো। কুরআন তিলাওয়াতের শব্দ শুনে তারা সেখানে থেমে যায় এবং গভীর মনযোগসহ কুরআন শুনতে থাকে। এ সূরাতে এ ঘটনারই উল্লেখ করা হয়েছে।

এ বর্ণনার ভিত্তিতে অধিকাংশ মুফাস্সির মনে করেছেন যে, এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইতিহাস খ্যাত তায়েফ সফরের ঘটনা। ঘটনাটি ঘটেছিল হিজরাতের তিন বছর আগে নবুওয়াতের ১০ম বছরে। কিন্তু কয়েকটি কারণে এ ধারণা ঠিক নয়। তায়েফের উক্ত সফরে জিনদের কুরআন শোনার যে ঘটনা ঘটেছিল তা সূরা আহকাফের ২৯ থেকে ৩২ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। ঐ আয়াতগুলো একবার দেখলেই বুঝা যায়, সে সময় যেসব জিন কুরআন শুনে তার প্রতি ঈমান এনেছিল তারা আগে থেকেই হযরত মূসা এবং পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান পোষণ করতো। পক্ষান্তরে এ সূরার ২ হতে ৭ পর্যন্ত আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এ সময় যে জিনেরা কুরআন শুনেছিল তারা ছিল মুশরিক। তারা আখেরাত ও রিসালাত অস্বীকার করতো। তাছাড়াও এ বিষয়টি ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে, তায়েফের সফরে যায়েদ ইবনে হারেসা ছাড়া আর কেউ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন না। পক্ষান্তরে এ সূরায় উল্লেখিত সফর সম্পর্কে ইবনে আব্বাস বর্ণনা করছেন যে, এ সময় কয়েকজন সাহাবী তাঁর সাথে ছিলেন। তা ছাড়াও অনেকগুলো বর্ণনা এ বিষয়ে একমত যে, সূরা আহ্কাফে বর্ণিত ঘটনায় জিনরা যখন কুরআন শুনেছিল তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়েফ থেকে মক্কা ফেরার পথে নাখলায় অবস্থান করছিলেন। আর ইবনে আব্বাসের বর্ণনা মতে এ সূরায় বর্ণিত সফরে জিনদের কুরআন শোনার ঘটনা তখন ঘটেছিল যখন তিনি মক্কা থেকে উকায যাচ্ছিলেন। এসব কারণে যে বিষয়টি সঠিক বলে জানা যায় তাহলো, সূরা আহ্কাফ

এবং সূরা জিনে একই ঘটনার উল্লেখ করা হয়নি। বরং এ ছিল ভিন্ন ভিন্ন সফরে সংঘটিত ভিন্ন ভিন্ন দু'টি ঘটনা।

সূরা আহ্কাফে যে ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে তা যে দশম নববী সনে তায়েফ সফরের সময় সংঘটিত হয়েছিল সে ব্যাপারে রেওয়ায়াতসমূহে ঐকমত্য পোষণ করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, এ দ্বিতীয় ঘটনাটি কখন সংঘটিত হয়েছিল? ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় এর কোন জবাব পাওয়া যায় না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদল সাহাবীকে সাথে নিয়ে কখন উকাযের বাজারে গিয়েছিলেন অন্য আর কোন ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকেও তা জানা যায় না। তবে এ সূরার ৮ থেকে ১০ পর্যন্ত আয়াতগুলো সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে বুঝা যায়, এটি নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগের ঘটনা হবে। এসব আয়াতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতলাভের পূর্বে জিনরা উর্ধ জগতের খবর জানার জন্য আসমান থেকে কিছু না কিছু শুনে নেয়ার একটা সুযোগ পেয়ে যেতো। কিন্তু এরপর তারা হঠাৎ দেখতে পেলো সবখানে ফেরেশতাদের কড়া পাহারা বসে গেছে এবং উল্কার বৃষ্টি হচ্ছে। তাই কোথাও তারা এমন একটু জায়গা পাচ্ছে না যেখানে অবস্থান নিয়ে কোন আভাস তারা লাভ করতে পারে। তাই একথা জানার জন্য তারা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো যে, পৃথিবীতে এমন কি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বা হতে যাচ্ছে যার জন্য এ কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। সম্ভবত তখন থেকেই জিনদের বিভিন্ন দল বিষয়টির অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছিল এবং তাদেরই একটি দল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র মুখ থেকে কুরআন মজীদের তিলাওয়াত শুনে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে, এটিই সে বস্তু, যার কারণে জিনদের জন্য উর্ধ জগতের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

জিনদের হাকীকত বা তাৎপর্য

মন-মগজ যাতে কোন প্রকার বিভ্রান্তির শিকার না হয় সে জন্য এ সূরা অধ্যয়নের আগে জিনদের তাৎপর্য সম্পর্কে জেনে নেয়া আবশ্যক। বর্তমান যুগের বহু লোক এ ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত আছে যে, জিন বলতে বাস্তবে কিছু নেই। বরং এটিও প্রাচীন কালের কুসংস্কার ভিত্তিক বাজে একটি ধারণা। তাদের এ ধারণার ভিত্তি কিন্তু এটা নয় যে, তারা গোটা বিশ্ব-জাহানের সবকিছুর তাৎপর্য ও বাস্তবতা জেনে ফেলেছে এবং এও জেনে ফেলেছে যে, জিন বলে কোথাও কিছু নেই। এমন জ্ঞান লাভের দাবী তারা নিজেরাও করতে পারে না। কিন্তু কোন প্রমাণ ছাড়াই তারা ধরে নিয়েছে যে, গোটা বিশ্ব-জাহানে শুধু তা-ই বাস্তব যা অনুভব করা যায় বা ধরা ছোঁয়ার মধ্যে আনা যায়। অথচ সমুদ্রের তুলনায় এক বিন্দু পানির যে অবস্থা এ বিরাট বিশাল বিশ্ব-জাহানের বিশালত্বের তুলনায় মানুষের অনুভূতি ও ধরা-ছোঁয়ার গণ্ডির অবস্থা তাও নয়। যে ব্যক্তি মনে করে যে, যা অনুভব করা যায় না তার কোন অস্তিত্ব নেই, আর যার অস্তিত্ব আছে তা অবশ্যই অনুভূত হবে, সে আসলে নিজের বুদ্ধি-বিবেকের সংকীর্ণতারই প্রমাণ দেয়। এ ধরনের চিন্তাধারা অবলম্বন করলে শুধু এক জিন নয় বরং এমন কোন সত্যকেই মানুষ মেনে নিতে পারবে না যা

সরাসরি তার অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণে ধরা পড়ে না এবং অনুভব করা যায় না এমন কোন সত্যকে মেনে নেয়া তো দূরের কথা আল্লাহর অস্তিত্ব পর্যন্তও তাদের কাছে মেনে নেয়ার মত থাকে না।

মুসলমানদের মধ্যে যারা এরূপ ধ্যান–ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে কিন্তু কুরআনকেও অস্বীকার করতে পারেনি তারা জিন, ইবলীস এবং শয়তান সম্পর্কে কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যকে নানা রকম ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণের বিষয়ে পরিণত করেছে। তারা বলেন ঃ জিন বলতে এমন কোন অদৃশ্য মাখলুক বুঝায় না যাদের স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব আছে। বরং কোথাও এর অর্থ মানুষের পাশবিক শক্তি যাকে শয়তান বলে অভিহিত করা হয়েছে। কোথাও এর অর্থ অসভ্য, বন্য ও পাহাড়ী এলাকায় বসবাসকারী জাতিসমূহ। আবার কোথাও এর দ্বারা ঐ সব লোকদের বুঝানো হয়েছে যারা গোপনে কুরআন শুনতো। কিন্তু এ ব্যাপারে কুরআন মজীদের বক্তব্য এত স্পষ্ট ও খোলামেলা যে, এ ধরনের ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণের সামান্যতম অবকাশও তাতে নেই।

কুরআন মজীদে এক জায়গায় নয় বহু জায়গায় এমনভাবে জিন ও মানুষের উল্লেখ করা হয়েছে যা থেকে বুঝা যায়, এরা স্বতন্ত্র দু'টি মাখলুক। উদাহরণ স্বরূপ দেখুন সূরা আ'রাফ, আয়াত ৩৮; হূদ, ১৯; হা–মীম আস সাজদা, আয়াত ২৫ ও ২৯; আল আহকাফ ১৮; আয যারিয়াত; ৫৬ এবং আন নাস, ৬। সূরা আর রাহমান তো পুরাটাই এ ব্যাপারে এমন অকাট্য প্রমাণ যে, জিনদের এক প্রকার মানুষ মনে করার কোন অবকাশই নেই। সূরা আ'রাফের ১২ আয়াত, সূরা হিজরের ২৬ ও ২৭ আয়াত এবং সূরা আর রাহমানের ১৪ ও ১৫ আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, মানুষ সৃষ্টির মৌলিক উপাদান হলো মাটি আর জিন সৃষ্টির মৌলিক উপাদান হলো আগুন।

সূরা হিজরের ২৭ আয়াতে পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে যে, মানুষ সৃষ্টির পূর্বে জিনদের সৃষ্টি করা হয়েছে। কুরআন মজীদের সাতটি স্থানে আদম ও ইবলীসের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। এর সবগুলো স্থানের বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষের সৃষ্টির সময় ইবলীস বর্তমান ছিল। এ ছাড়াও সূরা কাহ্‌ফের ৫০ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইবলীস জিনদেরই একজন।

সূরা আ'রাফের ২৭ আয়াতে পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে যে, জিনরা মানুষকে দেখতে পায় কিন্তু মানুষ জিনদের দেখতে পায় না।

সূরা হিজরের ১৭ থেকে ১৮, সূরা সাফ্‌ফাতের ৬ থেকে ১০ এবং সূরা মূলকের ৫ আয়াতে বলা হয়েছে, জিনেরা উর্ধ জগতের দিকে উঠতে সক্ষম হলেও একটি নির্দিষ্ট সীমার ওপরে তারা যেতে পারে না। এর উর্ধে যাওয়ার চেষ্টা করলে এবং উর্ধজগতে বিচরণকারী ফেরেশতাদের কথাবার্তা শুনতে চাইলে তাদের থামিয়ে দেয়া হয়। গোপনে দৃষ্টির অগোচরে শুনতে চাইলে উল্কাপিণ্ড ছুড়ে মেরে তাড়িয়ে দেয়া হয়। একথার মাধ্যমে আরবের মুশরিকদের একটি ধারণার প্রতিবাদ করা হয়েছে। তাদের ধারণা ছিল জিনরা গায়েবী বিষয়ের খবর জানে অথবা খোদায়ীর গোপন তত্ত্বসমূহ জানার কোন উপায় তাদের জানা আছে। সূরা সাবার ১৪ আয়াতেও এ ভ্রান্ত ধারণা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

সূরা বাকারার ৩০ থেকে ৩৪ আয়াত এবং সূরা কাহ্ফের ৫০ আয়াত থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর খেলাফত দিয়েছেন মানুষকে। এও জানা যায় যে, মানুষ জিনদের চেয়ে উত্তম মাখলুক যদিও জিনদের কিছু অস্বাভাবিক ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। আমরা সূরা নাম্লের ৭ আয়াতে এর একটি দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। কিন্তু মানুষের তুলনায় পশুরাও কিছু অধিক ক্ষমতা লাভ করেছে। কিন্তু এর দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, পশুরা মানুষের চেয়ে অধিক মর্যাদার অধিকারী।

কুরআন একথাও বলে যে, জিনরাও মানুষের মত একটি মাখলুক। তাদেরকেও মানুষের মত স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। ইবলীসের কাহিনী এবং সূরা আহ্কাফ ও সূরা জিনে উল্লেখিত কিছু সংখ্যক জিনের ঈমান আনার ঘটনা এর সুস্পষ্ট প্রমাণ।

কুরআনের বহু জায়গায় এ সত্যটিও বর্ণনা করা হয়েছে যে, আদমকে সৃষ্টি করার মুহূর্তেই ইবলীস এ মর্মে দৃঢ় সংকল্প করেছিল যে, সে মানব জাতিকে গোমরাহ, বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। সে সময় থেকেই জিনদের শয়তানরা মানুষকে গোমরাহীর মধ্যে ঠেলে দেয়ার চেষ্টায় লেগে আছে। কিন্তু মানুষের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে জবরদস্তিমূলকভাবে কোন কাজ করিয়ে নেয়ার সামর্থ তারা রাখে না। বরং তারা তা মনের মধ্যে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করে, তাদের বিভ্রান্ত করে এবং অন্যায় ও গোমরাহীকে তাদের সামনে শোভনীয় করে পেশ করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্ন বর্ণিত আয়াতগুলো পাঠ করুন। সূরা নিসা, আয়াত ১১৭ থেকে ১২০; আ'রাফ, ১১ থেকে ১৭ পর্যন্ত; ইবরাহীম ২২; আল হিজ্র ৩০ থেকে ৪২; আন নাহল, ৯৮ থেকে ১০০ এবং বনী ইসরাঈল, ৬১ থেকে ৬৫ আয়াত পর্যন্ত।

কুরআন শরীফে একথাও বলা হয়েছে যে, আরবের মুশরিকরা জাহেলী যুগে জিনদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করতো, তাদের ইবাদাত বা পূজা-অর্চনা করতো এবং তাদেরকে আল্লাহর বংশধর বা সন্তান-সন্ততি মনে করতো। দেখুন, সূরা আল আন'আম, আয়াত ১০০; সাবা, আয়াত ৪০ থেকে ৪১ এবং আস্ সাফ্ফাত, আয়াত ১৫৮।

এসব বিশদ আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, জিনরা একটা স্বতন্ত্র বহিঃসত্তার অধিকারী এবং তারা মানুষের থেকে ভিন্ন প্রজাতির আরেকটি অদৃশ্য সৃষ্টি। তাদের রহস্যজনক গুণাবলী ও বৈশিষ্টের কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদের অস্তিত্ব ও শক্তি-সামর্থ সম্পর্কে কিছু অতিরঞ্জিত ধারণা পোষণ করে আসছিলো এমনকি তাদের পূজা করতে শুরু করেছিল। কিন্তু কুরআন তাদের ব্যাপারে প্রকৃত সত্য একেবারে খোলাসা করে বলে দিয়েছে যা থেকে তারা কি এবং কি নয় তা ভালভাবে জানা যায়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

জিনদের একটি দল কুরআন মজীদ শোনার পর তার কি প্রভাব গ্রহণ করেছিল এবং ফিরে গিয়ে নিজ জাতির অন্যান্য জিনদের কি কি কথা বলেছিল, এ সূরার প্রথম আয়াত থেকে ১৫ আয়াত পর্যন্ত তা-ই বলা হয়েছে। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা তাদের সব কথাবার্তা এখানে উল্লেখ করেননি। বরং উল্লেখযোগ্য বিশেষ বিশেষ কথাগুলোই উল্লেখ

করেছেন। তাই বর্ণনাভঙ্গী ধারাবাহিক কথাবার্তা বলার মত নয়। বরং তাদের বিভিন্ন উক্তি এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, তারা এরূপ এরূপ কথা বলেছে। জিনদের মুখ থেকে উচ্চারিত এসব উক্তি যদি মানুষ গভীর মনোযোগ সহকারে পড়ে তাহলে সহজেই একথা বুঝা যাবে যে, তাদের ঈমান আনার এ ঘটনা এবং নিজ জাতির সাথে কথোপকথন কুরআন মজীদে বিশেষ কোন উদ্দেশ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে। আয়াতের ব্যাখ্যায় আমি যে টীকা লিখেছি তাতে তাদের উক্তিসমূহের যে ব্যাখ্যা পেশ করেছি এ উদ্দেশ্য বুঝতে তা আরো অধিক সাহায্য করবে।

তারপর ১৬ থেকে ১৮ পর্যন্ত আয়াতে লোকদের বুঝানো হয়েছে যে, তারা যদি শিরক পরিত্যাগ করে এবং সঠিক পথে চলার ক্ষেত্রে অবিচল থাকে তাহলে তাদের প্রতি অজস্র নিয়ামত বর্ষিত হবে। অন্যথায় আল্লাহর পাঠানো এ উপদেশবাণী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার পরিণামে তারা কঠিন আযাবের মধ্যে নিপতিত হবে। অতপর ১৯ থেকে ২৩ পর্যন্ত আয়াতে মক্কার কাফেরদের তিরস্কার করা হয়েছে। কারণ আল্লাহর রসূল যখন আল্লাহর দিকে উচ্চকণ্ঠে আহবান জানান তখন তারা তার ওপরে হামলা করতে উদ্যত হয়। অথচ আল্লাহর বাণী পৌছিয়ে দেয়াই রসূলের দায়িত্ব। তিনি তো এ দাবী করছেন না যে, মানুষের ভালমন্দ এবং কল্যাণ ও অকল্যাণ তারই ইখতিয়ারে। এরপর ২৪ ও ২৫ আয়াতে কাফেরদের এ মর্মে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে যে, আজ তারা রসূলকে বন্ধুহীন ও অসহায় দেখে অবদমিত করে রাখার চেষ্টা করছে। কিন্তু এমন এক সময় আসবে যখন তারা জানতে পারবে, প্রকৃতপক্ষে বন্ধুহীন ও অসহায় কারা? সে সময়টি দূরে না নিকটে রসূল তা জানেন না। কিন্তু সেটি অবশ্যই আসবে। সব শেষে লোকদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে, 'আলেমুল গায়েব' বা গায়েবী বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই আছে। রসূল শুধু ততটুকুই জানতে পারেন যতটুকু আল্লাহ তাঁকে জানান। এ জ্ঞানও হয় রিসালাতের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন সম্পর্কিত বিষয়ে। এমন সুরক্ষিত পন্থায় রসূলকে এ জ্ঞান দেয়া হয় যার মধ্যে বাইরে থেকে হস্তক্ষেপের আদৌ কোন সম্ভাবনা থাকে না।

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۝١ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۖ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۝٢ وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۝٣ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ۝٤ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۝٥ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ۝٦

হে নবী, বল, আমার কাছে অহী পাঠানো হয়েছে যে, জিনদের একটি দল মনোযোগ দিয়ে শুনেছে।[১] তারপর (ফিরে গিয়ে নিজ জাতির লোকদেরকে) বলেছেঃ

"আমরা এক বিস্ময়কর 'কুরআন' শুনেছি[২] যা সত্য ও সঠিক পথের নির্দেশনা দেয় তাই আমরা তার ওপর ঈমান এনেছি এবং আমরা আর কখনো আমাদের রবের সাথে কাউকে শরীক করবো না।"[৩]

আর "আমাদের রবের মর্যাদা অতীব সমুচ্চ। তিনি কাউকে স্ত্রী কিংবা সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেননি।"[৪]

আর "আমাদের নির্বোধ লোকেরা[৫] আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ও ন্যায়ের পরিপন্থী অনেক কথাবার্তা বলে আসছে।"

আর "আমরা মনে করেছিলাম যে, মানুষ এবং জিন আল্লাহ সম্বন্ধে কখনো মিথ্যা বলতে পারে না।"[৬]

আর "মানুষের মধ্য থেকে কিছু লোক জিনদের কিছু লোকের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতো। এভাবে তারা জিনদের অহংকার আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।"[৭]

১. এ থেকে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে সময় জিনদের দেখতে পাচ্ছিলেন না এবং তারা যে কুরআন শুনছে একথাও তাঁর জানা ছিল না। পরবর্তী সময়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অহীর মাধ্যমে এ ঘটনা জানিয়ে দিয়েছেন। এ ঘটনাটি বর্ণনা প্রসংগে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, সে সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিনদের উদ্দেশ্যে কুরআন পাঠ করেননি এবং তিনি তাদের দেখেনওনি।" (মুসলিম, তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ, ইবনে জারীর)

২. মূল আয়াতে قُرْاٰنًا عَجَبًا শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 'কুরআন' মানে পড়ার মত জিনিস। জিনেরা সম্ভবত শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহার করেছিল। কারণ তখন তারা প্রথম বারের মত এ বাণীর সাথে পরিচিত হয়েছিল। সে সময় হয়তো তাদের জানা ছিল না যে, যে জিনিস তারা শুনছে তার নামই কুরআন। عجب আধিক্য অর্থনির্দেশক একটি শব্দ। আরবী ভাষায় শব্দটি ব্যবহৃত হয় অত্যধিক বিস্ময়কর ব্যাপার বুঝাতে। সুতরাং জিনদের উক্তির অর্থ হলো, আমরা এমন একটি বাণী শুনে এসেছি যা ভাষাগত উৎকর্ষতা ও বিষয়বস্তু হিসেবে অতুলনীয়।

এ থেকে জানা যায় যে, জিনরা শুধু মানুষের কথা শুনতে পারে তাই নয়, তারা মানুষের ভাষাও ভালভাবে বুঝতে পারে। তবে এটা জরুরী নয় যে, সব জিন মানুষের সব ভাষাই জানবে বা বুঝবে। সম্ভবত তাদের যে গোষ্ঠী পৃথিবীর যে এলাকায় বসবাস করে তারা সে এলাকার মানুষের ভাষা জানে। তবে কুরআনের এ বক্তব্য থেকে একথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ঐ সময় যেসব জিন কুরআন শুনেছিল তারা আরবী ভাষায় এত দক্ষ ছিল যে, তারা এ বাণীর অতুলনীয় ভাষাগত উৎকর্ষ পর্যন্ত উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল এবং এর উচ্চমানের বিষয়বস্তুও ভালভাবে বুঝতে পেরেছিল।

৩. এ থেকে কয়েকটি বিষয় জানা গেল। এক, জিনরা আল্লাহর অস্তিত্ব এবং তাঁর 'রব' হওয়াকে অস্বীকার করে না। দুই, তাদের মধ্যেও মুশরিক আছে যারা মুশরিক মানুষের মত অন্য জিনিসকে আল্লাহর উলুহিয়াতের মধ্যে শরীক করে। তাই জিনদের যে কওমের সদস্যরা কুরআন মজীদ শোনার পর কওমের কাছে ফিরে গিয়েছিল তারাও ছিল মুশরিক। তিন, নবুওয়াত এবং আসমানী কিতাবসমূহ নাযিল হওয়ার ধারা জিনদের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। বরং তাদের মধ্যে যেসব জিন ঈমান আনে তারা মানুষের মধ্যে প্রেরিত নবী এবং তাদের আনীত কিতাবসমূহের ওপর–ই ঈমান আনে। একথাটি সূরা আহ্কাফের ২৯–৩১ আয়াত থেকেও জানা যায়। ঐ আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে, সে সময় যেসব জিন কুরআন শুনেছিল তারা হযরত মূসার অনুসারী ছিল। তারা কুরআন শোনার পর নিজের কওমকে এ মর্মে দাওয়াত দিয়েছিল যে, এখন আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বাণী এসেছে এবং পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের সত্যতা প্রতিপন্ন করছে তার ওপর ঈমান আনো। সূরা আর রাহমানও এ বিষয়টিই প্রমাণ করে। কারণ তার পুরা বক্তব্যই স্পষ্ট করে দেয় যে, মানুষ ও জিন শুধু এ দু'টি সৃষ্টিই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের ক্ষেত্র ছিল।

৪. এখান থেকে দু'টি বিষয় জানা গেল। এ জিনগুলো হয় ঈসায়ী বা খৃষ্ট ধর্মের অনুসারী ছিল অথবা অন্য এমন কোন ধর্মের অনুসারী ছিল যে ধর্মে মহান আল্লাহর স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে আছে বলে বিশ্বাস করা হতো। দুই, সে সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ﴿٧﴾ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ
فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴿٨﴾ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ
فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿٩﴾ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن
فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿١٠﴾ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ ۖ
كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ﴿١١﴾ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا ﴿١٢﴾

আর "তোমরা যেমন ধারণা পোষণ করতে মানুষেরাও ঠিক তেমনি ধারণা পোষণ করেছিল যে, আল্লাহ কাউকে রসূল বানিয়ে পাঠাবেন না।"[৮]

আর "আমরা আসমানে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখেছি, তা কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা পরিপূর্ণ।"

আর "ইতিপূর্বে আমরা ছিঁটেফোটা কিছু আড়ি পেতে শোনার জন্য আসমানে বসার জায়গা পেয়ে যেতাম। কিন্তু এখন কেউ গোপনে শোনার চেষ্টা করলে সে তার নিজের বিরুদ্ধে নিক্ষেপের জন্য একটা উল্কা নিয়োজিত দেখতে পায়।"[৯]

আর আমাদের বোধগম্য হচ্ছিল না যে, পৃথিবীবাসীদের সাথে কোন খারাপ আচরণ করার সংকল্প করা হয়েছে, নাকি তাদের প্রভু, তাদেরকে সঠিক পথ দেখাতে চান?[১০]

আর আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক আছে নেক্‌কার আর কিছু লোক আছে তার চেয়ে নীচু পর্যায়ের। এভাবে আমরা বিভিন্ন মতে বিভক্ত[১১] ছিলাম।

আর আমরা মনে করতাম যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহকে অক্ষম করে দিতে সক্ষম নই এবং পালিয়েও তাঁকে পরাভূত করতে পারবো না।[১২]

সাল্লাম নামাযের মধ্যে পবিত্র কুরআনের এমন কোন অংশ তিলাওয়াত করছিলেন যা শুনে তাদের কাছে নিজেদের আকীদার ভ্রান্তি ধরা পড়েছিল এবং তারা বুঝতে পেরেছিল যে, মহান আল্লাহর সমুন্নত ও অতি মর্যাদাবান সত্তার সাথে স্ত্রী ও ছেলেমেয়েকে সম্পর্কিত করা চরম অজ্ঞতা ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ।

৫. মূল আয়াতে سَفِيهُنَا শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দটি এক ব্যক্তির জন্যও ব্যবহৃত হতে পারে আবার অনেক লোক বা দলের জন্যও ব্যবহৃত হতে পারে। যদি শব্দটি একজন অজ্ঞ বা মূর্খ লোক অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে তার মানে হবে ইবলীস। আর যদি

অনেক লোক বা দল অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে তার অর্থ হবে জিনদের মধ্য থেকে অনেক নির্বোধ ও বুদ্ধি–বিবেকহীন লোক এ রকম কথা বলতো।

৬. অর্থাৎ তাদের ভ্রান্ত কথাবার্তা দ্বারা আমাদের বিভ্রান্ত হওয়ার কারণ হলো, আমরা কোন সময় চিন্তাও করতে পারিনি যে, মানুষ কিংবা জিন আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলার দুঃসাহসও করতে পারে। কিন্তু এখন এ কুরআন শুনে আমরা জানতে পেরেছি যে, প্রকৃত–পক্ষে তারা ছিল মিথ্যাবাদী।

৭. ইবনে আব্বাস বলেন ঃ জাহেলী যুগে আরবরা যখন কোন জনহীন প্রান্তরে রাত্রি যাপন করতো তখন উচ্চস্বরে বলতো, "আমরা এ প্রান্তরের অধিপতি জিনের আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" জাহেলী যুগের অন্যান্য বর্ণনাতেও এ বিষয়টির বহুল উল্লেখ দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ, কোন জায়গার পানি এবং ঘাস ফুরিয়ে গেলে মরুচারী যাযাবর বেদুইনরা তাদের একজন লোককে এমন আরেকটি জায়গা খুঁজে বের করতে পাঠাতো যেখানে পানি এবং ঘাস পাওয়া যেতে পারে। অতপর উক্ত ব্যক্তির নির্দেশনা মুতাবিক এসব লোক নতুন জায়গায় পৌঁছলে সেখানে অবস্থান নেয়ার আগে চিৎকার করে বলতো ঃ আমরা এ প্রান্তরের মালিকের আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যাতে আমরা এখানে সব রকম বিপদ থেকে নিরাপদ থাকতে পারি।" তাদের বিশ্বাস ছিল, প্রত্যেক জনমানবহীন জায়গা কোন না কোন জিনের দখলে আছে। তার আশ্রয় প্রার্থনা ছাড়াই কেউ যদি সেখানে অবস্থান করে তাহলে সে জিন হয় নিজেই তাদের উত্যক্ত করে কিংবা অন্য জিনদের উত্যক্ত করার জন্য লেলিয়ে দেয়। ঈমান আনয়নকারী এ জিনরা এ বিষয়টির প্রতিই ইংগিত করেছে। তাদের কথার অর্থ হলো এ পৃথিবীর খলীফা বা প্রতিনিধি মানুষ। তারাই যখন উল্টা আমাদের ভয় করতে শুরু করেছে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাদের কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করতে শুরু করেছে তখন আমাদের জাতির লোকদের মস্তিষ্ক বিকৃতি আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের গর্ব, অহংকার এবং কুফরী ও জুলুম অত্যাচারের মাত্রা অত্যধিক বেড়ে গিয়েছে এবং গোমরাহীর ক্ষেত্রে তারা আরো বেপরোয়া হয়ে গিয়েছে।

৮. মূল ভাষ্য হচ্ছে أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا এ আয়াতাংশের দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি আমরা যা অনুবাদ করেছি। অপরটি হলো, "মৃত্যুর পর আল্লাহ তা'আলা কাউকে আর জীবিত করে উঠাবেন না।" যেহেতু কথাটি ব্যাপক অর্থবোধক তাই তার এ অর্থও গ্রহণ করা যেতে পারে যে, মানুষের মত জিনদের মধ্যে একদল আখেরাতকে অস্বীকার করতো। কিন্তু পরবর্তী বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যের দিক থেকে প্রথম অর্থটিই অধিক অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। কারণ, পরবর্তী আয়াতসমূহে এ বিষয়টির উল্লেখ আছে যে, ঈমান আনয়নকারী এসব জিন তাদের কওমকে বলছে, আল্লাহ আর কোন রসূল পাঠাবেন না। তোমাদের এ ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের জন্য আসমানের দরজা বন্ধ করার কারণ হলো আল্লাহ একজন রসূল পাঠিয়েছেন।

৯. এটাই সে কারণ যার ভিত্তিতে জিনরা এ বিষয়টি অনুসন্ধান করতে বেরিয়েছিল যে, পৃথিবীতে এমন কি ঘটনা ঘটেছে বা ঘটতে যাচ্ছে যার খবরাখবর সুরক্ষিত করার জন্য এমন কঠোর ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে এখন আমরা উর্ধ জগতের কোন খবর জানার সুযোগ পাই না এবং যেখানেই যাই আমাদের মেরে তাড়িয়ে দেয়া হয়।

وَّاَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰٓى اٰمَنَّا بِهٖ ؕ فَمَنْ يُّؤْمِنْ بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّلَا رَهَقًا ﴿۱۳﴾ وَّاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقٰسِطُوْنَ ؕ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴿۱۴﴾ وَاَمَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿۱۵﴾ وَّاَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّآءً غَدَقًا ﴿۱۶﴾ لِّنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ؕ وَمَنْ يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿۱۷﴾ وَّاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ﴿۱۸﴾ وَّاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿۱۹﴾

আর আমরা যখন হিদায়াতের বাণী শুনলাম তখন তার প্রতি ঈমান আনলাম। যে ব্যক্তিই তার রবের ওপর ঈমান আনবে তার অধিকার বিনষ্ট হওয়ার কিংবা অত্যাচারিত হওয়ার ভয় থাকবে না।[১৩]

আর আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক আছে মুসলমান (আল্লাহর আনুগত্যকারী) আর কিছু সংখ্যক আছে ন্যায় ও সত্য থেকে বিমুখ। তবে যারা ইসলাম (আনুগত্যের পথ) গ্রহণ করেছে তারা মুক্তির পথ খুঁজে পেতে সক্ষম হয়েছে। আর যারা ন্যায় ও সত্য থেকে বিমুখ তারা হবে জাহান্নামের ইন্ধন।[১৪]

আর[১৫] (হে নবী, বলে দাও, আমাকে অহীর মাধ্যমে এও জানানো হয়েছে যে,) লোকেরা যদি সঠিক পথের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকতো তাহলে আমি তাদের প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করতাম।[১৬] যাতে এ নিয়ামতের মাধ্যমে তাদের পরীক্ষা করতে পারি।[১৭] আর যারা তাদের প্রভুর স্মরণ থেকে বিমুখ হবে[১৮] তিনি তাদের কঠিন আযাবে নিক্ষেপ করবেন। আর মসজিদসমূহ আল্লাহর জন্য। তাই তোমরা আল্লাহর সাথে আর কাউকে ডেকো না।[১৯] আর আল্লাহর বান্দা[২০] যখন তাঁকে ডাকার জন্য দাঁড়ালো তখন তারা সবাই তার ওপর হামলা করতে উদ্যত হলো।

১০. এ থেকে জানা গেল যে, দু'টি পরিস্থিতিতে উর্ধ জগতে এ ধরনের অসাধারণ ব্যবস্থাদি গৃহীত হয়ে থাকে। এক, আল্লাহ যদি পৃথিবীবাসীদের ওপর কোন আযাব নাযিল করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন এবং চান যে, তা নাযিল হওয়ার আগে জিনরা তার পূর্বাভাস পেয়ে তাদের মানুষ বন্ধুদের সাবধান করে না দিক। দুই, আল্লাহ যদি পৃথিবীতে কোন রসূল পাঠিয়ে থাকেন এবং তাঁর কাছে যেসব হিদায়াত ও বাণী পাঠানো হচ্ছে তাতে শয়তানরা

যাতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করতে না পারে এবং রসূলের কাছে কি কি হিদায়াত বা বাণী পাঠানো হচ্ছে তা আগেভাগেই জেনে নিতে না পারে তার নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ কাম্য হয় তখন এ ধরনের অসাধারণ ব্যবস্থাদি গৃহীত হয়। সুতরাং জিনদের একথাটির অর্থ হলো, আমরা যখন আসমানে এরূপ কঠোর প্রহরা দেখলাম এবং অজস্র উল্কা বর্ষণ লক্ষ করলাম তখন এ দু'টি অবস্থার কোনটি সংঘটিত হচ্ছে আমাদের মধ্যে তা জানার উদ্বেগ সৃষ্টি হলো। আল্লাহ তা'আলা কি হঠাৎ করে পৃথিবীর কোন জাতির ওপর আযাব নাযিল করেছেন না কোন এলাকায় কোন রসূল পাঠিয়েছেন? এ বিষয়টি অনুসন্ধানেই আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম। এরি এক পর্যায়ে আমরা এ বিস্ময়কর বাণী শুনতে পেলাম যা সত্য ও সঠিক পথের সন্ধান দান করে। এভাবে আমরা জানতে পেরেছি, আল্লাহ কোন আযাব নাযিল করেননি। বরং তাঁর সৃষ্টিকে সত্য ও সঠিক পথ দেখানোর জন্য একজন রসূল পাঠিয়েছেন। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল হিজর, টীকা ৮ থেকে ১২; সূরা সাফ্ফাত, টীকা ৭ এবং সূরা আল মুলক, টীকা ১১)

১১. অর্থাৎ আমাদের মধ্যে নৈতিক চরিত্রের দিক থেকেও ভাল ও মন্দ দু' প্রকারের জিন আছে এবং আকীদা-বিশ্বাসের দিক থেকেও মত ও পথ একটি নয়। এ ক্ষেত্রেও আমরা বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত। একথা বলে ঈমান আনয়নকারী এসব জিন নিজ জাতির জিনদের বুঝাতে চাচ্ছিল যে, নিসন্দেহে আমরা সত্য ও সঠিক পথ খুঁজে বের করার মুখাপেক্ষী। এর প্রয়োজনীয়তা আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

১২. অর্থাৎ আমাদের এ ধারণাই আমাদের মুক্তির পথ দেখিয়েছে। আমরা যেহেতু আল্লাহ সম্পর্কে নির্ভয় বা বেপরোয়া ছিলাম না এবং এ ব্যাপারে আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে, যদি আমরা তাঁর অবাধ্য হই তাহলে তাঁর পাকড়াও থেকে কোন অবস্থায়ই বাঁচতে পারবো না। তাই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত সত্য ও সঠিক পথ প্রদর্শনকারী বাণী শুনে ন্যায় ও সত্যকে জানার পরও অজ্ঞ ও নির্বোধ লোকদের প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত আকীদা-বিশ্বাসকেই আঁকড়ে থাকার দুঃসাহস আমরা দেখাইনি।

১৩. অধিকার বিনষ্ট হওয়ার অর্থ হলো, নেক কাজের জন্য যতটা পারিশ্রমিক বা পুরস্কার পাওয়ার কথা তার চাইতে কম দেয়া। আর জুলুম বা অত্যাচার হলো নেক কাজের জন্য আদৌ কোন পারিশ্রমিক বা পুরস্কার না দেয়া এবং তার দ্বারা যে ত্রুটি বা অপরাধ হয়েছে তার তুলনায় অধিক শাস্তি দেয়া, কিংবা অপরাধ ছাড়াই কাউকে শাস্তি দেয়া। আল্লাহ তা'আলার দরবারে কোন ঈমানদারের প্রতি এ ধরনের কোন বেইনসাফী হওয়ার আশংকা থাকবে না।

১৪. কুরআনের ভাষ্য অনুসারে জিনেরা আগুন থেকে সৃষ্ট। তাই প্রশ্ন হতে পারে যে, জাহান্নামের আগুন দ্বারা তাদের আবার কি কষ্ট হবে? এর জবাব হলো, কুরআনের ভাষ্য অনুসারে মানুষও মাটি থেকে সৃষ্ট। তা সত্ত্বেও তাদের মাটির ঢিল ছুঁড়ে মারলে ব্যথা পায় কেন? প্রকৃত সত্য হলো মানুষের গোটা দেহ মাটির উপাদান দ্বারা তৈরী হলেও এসব উপাদান থেকে যখন একজন রক্ত-মাংসের জীবন্ত মানুষ অস্তিত্ব লাভ করে তখন সে এসব উপাদান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিসে রূপান্তরিত হয় এবং একই উপাদান থেকে তৈরী অন্যান্য জিনিস তার কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ঠিক তেমনিভাবে গঠনাকৃতির দিক থেকে জিন যদিও আগুনের তৈরী। কিন্তু আগুন থেকে তৈরী একটি জীবন্ত ও চেতনা সম্পন্ন

قُلْ إِنَّمَآ أَدْعُوا رَبِّى وَلَآ أُشْرِكُ بِهِۦٓ أَحَدًا ﴿٢٠﴾ قُلْ إِنِّى لَآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾ قُلْ إِنِّى لَن يُجِيرَنِى مِنَ ٱللَّهِ أَحَدٌ ۙ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلْتَحَدًا ﴿٢٢﴾ إِلَّا بَلَٰغًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَٰلَٰتِهِۦ ۚ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَإِنَّ لَهُۥ نَارَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ﴿٢٣﴾ حَتَّىٰٓ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ﴿٢٤﴾

২ রুকূ’

হে নবী, বলো, "আমি শুধু আমার রবকেই ডাকি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না।"[২১] বলো, "আমি তোমাদের কোন ক্ষতি করারও ক্ষমতা রাখি না, উপকার করারও না। বলো, আল্লাহর পাকড়াও থেকে কেউ আমাকে বাঁচাতে সক্ষম নয় এবং তাঁর কাছে ছাড়া কোন আশ্রয়ও আমি পাব না। আল্লাহর বাণী ও হুকুম–আহকাম পৌছিয়ে দেয়া ছাড়া আমার কাজ আর কিছুই নয়।[২২] এরপর যারাই আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কথা অমান্য করবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। এ ধরনের লোকেরা চিরকাল সেখানে থাকবে।[২৩]

(এসব লোক তাদের এ আচরণ থেকে বিরত হবে না) এমনকি অবশেষে যখন তারা সে জিনিসটি দেখবে যার প্রতিশ্রুতি তাদের দেয়া হচ্ছে, তখন তারা জানতে পারবে যে, কার সাহায্যকারী দুর্বল এবং কার দল সংখ্যায় কম।[২৪]

সৃষ্টি যখন অস্তিত্ব লাভ করে তখন সে আগুনই তার জন্যে কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আর রাহমান, টীক ১৫)

১৫. এর পূর্বে জিনদের কথা শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন এখান থেকে আল্লাহ তা’আলার নিজের কথা শুরু হচ্ছে।

১৬. একথাটিই সূরা নূহে এভাবে বলা হয়েছে, "তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি তোমাদের ওপর আসমান থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন।" (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা নূহ, টীকা ২) প্রচুর পরিমাণ পানিকে নিয়ামতের প্রাচুর্য অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, পানির ওপর নির্ভর করেই জনবসতি গড়ে ওঠে। পানি না থাকলে আদৌ কোন জনপদ গড়ে উঠতে পারে না। পানি না থাকলে মানুষের মৌলিক প্রয়োজন যেমন পূরণ হয় না তেমনি মানুষের বিভিন্ন রকম শিল্পও গড়ে উঠতে পারে না।

১৭. অর্থাৎ তিনি দেখতে চান তারা নিয়ামতলাভ করার পর কৃতজ্ঞ থাকে কিনা এবং আমার দেয়া নিয়ামতসমূহ সঠিকভাবে কাজে লাগায়, না ভ্রান্ত পথে কাজে লাগায়।

১৮. স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার একটা অর্থ হলো, মানুষ আল্লাহর প্রেরিত উপদেশ গ্রহণ করবে না। আরেকটা অর্থ হলো, মানুষ আল্লাহর যিকরের কথা শোনা পছন্দই করবে না। এর আরেকটি অর্থ হলো, সে আল্লাহর ইবাদাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে।

১৯. মুফাস্সিরগণ مَسَاجِد শব্দটি সাধারণভাবে ইবাদাতখানা বা উপাসনালয় অর্থে গ্রহণ করেছেন ঃ 'মাসাজিদ' শব্দটির এ অর্থ গ্রহণ করলে আয়াতটির অর্থ হয় 'উপাসনালয় সমূহে আল্লাহর ইবাদাতের সাথে সাথে আর কারো ইবাদাত যেন করা না হয়। হযরত হাসান বাস্রী বলেন ঃ সমস্ত পৃথিবীটাই ইবাদাতখানা বা উপাসনালয়। তাই আয়াতটির মূল বক্তব্য হলো আল্লাহর এ পৃথিবীতে কোথাও যেন শিরক করা না হয়। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণী থেকে প্রমাণ পেশ করেছেন وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا আমার জন্য সমগ্র পৃথিবীকে ইবাদাতের স্থান এবং পবিত্রতা অর্জনের উপায় বানিয়ে দেয়া হয়েছে। হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর মসজিদ বলতে যেসব অংগ–প্রত্যংগের সাহায্যে মানুষ সিজদা করে সেগুলো অর্থাৎ হাত, হাঁটু, পা ও কপাল বুঝিয়েছেন। এ ব্যাখ্যা অনুসারে আয়াতটির অর্থ হলো, সমস্ত অংগ–প্রত্যংগ আল্লাহর তৈরী। এগুলোর সাহায্যে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সিজদা করা যাবে না।

২০. এখানে আল্লাহর বান্দা অর্থ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

২১. অর্থাৎ আল্লাহকে ডাকা এমন কোন আপত্তিকর কাজ নয় যার জন্য মানুষ এতটা রাগান্বিত ও উত্তেজিত হয়ে পড়বে। তবে কেউ যদি আল্লাহর সাথে তাঁর প্রভুত্ব ও উলুহিয়্যাতের ব্যাপারে কাউকে শরীক করে তাহলে তা নিসন্দেহে খারাপ! আর এ কাজ আমি করিনি। বরং যারা আল্লাহর নাম শুনে আমার ওপর হামলা করতে চায় তারাই এ কাজ করছে।

২২. অর্থাৎ আমি কখনো এ দাবী করি না যে, আল্লাহর প্রভুত্বে আমার কোন দখলদারী বা কর্তৃত্ব আছে। কিংবা মানুষের ভাগ্য ভাঙা বা গড়ার ব্যাপারে আমার কোন ক্ষমতা আছে। আমি তো আল্লাহর একজন রসূল মাত্র। আমার ওপর যে কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে তা তোমাদের কাছে আল্লাহ তা'আলার বাণী পৌছিয়ে দেয়ার অধিক আর কিছুই নয়। আল্লাহর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ব্যাপার তো পুরোপুরি আল্লাহরই করায়ত্ব। অন্য কারো কল্যাণ বা ক্ষতি সাধন তো দূরের কথা নিজের ক্ষতি ও কল্যাণের ব্যাপারটিও আমার নিজের ইচ্ছাধীন নয়। আমি যদি আল্লাহর নাফরমানী করি তাহলে তাঁর পাকড়াও থেকে আত্মরক্ষা করে কোথাও আশ্রয় লাভ করতে পারবো না। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছে ছাড়া আমার আর কোন আশ্রয়স্থল নেই। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আশ্ শূরা, টীকা ৭)

২৩. এর অর্থ এই নয় যে, প্রতিটি গোনাহ ও অপরাধের শাস্তিই হচ্ছে চিরস্থায়ী জাহান্নাম। বরং যে প্রসংগে একথাটি বলা হয়েছে তার আলোকে আয়াতের অর্থ হলো আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে তাওহীদের যে আহবান জানানো হয়েছে তা যে ব্যক্তি

قُلْ إِنْ أَدْرِىٓ أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُۥ رَبِّىٓ أَمَدًا ﴿٢٥﴾ عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِۦٓ أَحَدًا ﴿٢٦﴾ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُۥ يَسْلُكُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ رَصَدًا ﴿٢٧﴾ لِّيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا۟ رِسَٰلَٰتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَىْءٍ عَدَدًۢا ﴿٢٨﴾

বলো, আমি জানি না, যে জিনিসের প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হচ্ছে তা নিকটে, না তার জন্য আমার রব কোন দীর্ঘ মেয়াদ স্থির করছেন।[২৫] তিনি গায়েবী বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী। তিনি তাঁর গায়েবী বিষয়ের জ্ঞান কারো কাছে প্রকাশ করেন না।[২৬] তবে যে রসূলকে (গায়েবী বিষয়ের কোন জ্ঞান দেয়ার জন্য) মনোনীত করেছেন[২৭] তাকে ছাড়া। তিনি তার সামনে ও পেছনে প্রহরী নিয়োজিত করেন।[২৮] যাতে তিনি নিশ্চিতরূপে জানতে পারেন যে, রসূলগণ তাদের রবের বাণীসমূহ পৌঁছিয়ে দিয়েছেন[২৯] তিনি তাদের গোটা পরিবেশ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত। আর তিনি প্রতিটি জিনিস গুণে গুণে হিসেব করে রেখেছেন।[৩০]

মানবে না এবং শির্‌ককেও বর্জন করবে না তার জন্য অবধারিত আছে জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তি।

২৪. এ আয়াতটির পটভূমি হলো, সে যুগে যেসব লোক আল্লাহর পথের দিকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহবান শুনেই তাঁর ওপর মারমুখী হতো তারা এ খোশ খেয়ালে নিমগ্ন ছিল যে, তাদের দলবলই বড়। অপরদিকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আছে আঙুলে গোণা কয়েকজন লোক। সুতরাং তারা অতি সহজেই তাকে পরাভূত করতে সক্ষম হবে। তাই বলা হচ্ছে, আজ এসব লোক রসূলকে (স) অসহায় ও বন্ধুহীন এবং নিজেদের সংখ্যাধিক্য দেখে ন্যায় ও সত্যের কণ্ঠ স্তব্ধ করে দিতে দুঃসাহস দেখাচ্ছে। কিন্তু যে সময় সম্পর্কে তাদের সাবধান করে দেয়া হচ্ছে সে দুঃসময়টি যখন আসবে, তখন তারা বুঝতে পারবে প্রকৃত পক্ষে অসহায় ও বন্ধুহীন কারা।

২৫. বর্ণনাভঙ্গী থেকেই বুঝা যায়, এটি একটি প্রশ্নের জওয়াব। এখানে প্রশ্নটি উল্লেখ না করে শুধু তার জবাব দেয়া হয়েছে। সম্ভবত ওপরে উল্লেখিত কথা শুনে বিরোধীরা বিদ্রূপের ভঙ্গীতে প্রশ্ন করে থাকবে যে, যে সময়ের ভয় তিনি দেখাচ্ছেন সে সময়টি কখন আসবে? তার জবাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তাদের বলো, সে সময়টির আগমন তো নিশ্চিত, তবে তার আগমনের দিনক্ষণ আমাকে জানানো হয়নি। সে সময়টি অতি আসন্ন, না তার জন্য দীর্ঘ সময় নির্দিষ্ট রয়েছে তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন।

২৬. অর্থাৎ গায়েবী বিষয়ের সবটুকু জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। গায়েবী বিষয়ের এ পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান তিনি কাউকেই দেন না।

২৭. অর্থাৎ রসূল নিজে 'আলেমুল গায়েব' বা গায়েবী বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী নন। বরং আল্লাহ তা'আলা যখন তাকে রিসালাতের দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার জন্য মনোনীত করেন তখন তিনি ইচ্ছামত তাঁকে অদৃশ্য বস্তুসমূহের জ্ঞান দান করেন।

২৮. প্রহরী মানে ফেরেশতা। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যখন অহীর মাধ্যমে গায়েবী বিষয়ের গভীর জ্ঞান ও তাৎপর্য তাঁর রসূলের কাছে পাঠান তখন তার রক্ষণাবেক্ষণ ও পাহারাদারীর জন্য সবখানে ফেরেশতা মোতায়েন করেন। যাতে সে জ্ঞানটি অত্যন্ত সুরক্ষিত পন্থায় রসূলের কাছে পৌছতে পারে এবং তার মধ্যে বাইরের কোন কিছু সংমিশ্রিত হতে না পারে। ওপরে ৮ ও ৯নং আয়াতে একথাটিই বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তির পর জিনরা দেখলো তাদের উর্ধ জগতে প্রবেশের সব পথ বন্ধ। তারা দেখলো সব জায়গায় কঠোর প্রহরা বসানো হয়েছে যার কারণে ছিটে ফোঁটা কিছু আভাস লাভের সুযোগও তাদের নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

২৯. এর তিনটি অর্থ হতে পারে। এক, রসূল নিশ্চিতভাবে জানবেন যে, ফেশেতারা তাঁর কাছে আল্লাহ তা'আলার বাণীসমূহ ঠিক ঠিক পৌছিয়ে দিয়েছে। দুই, আল্লাহ তা'আলা জানবেন যে, ফেরেশতারা তাদের রবের বাণীসমূহ তাঁর রসূলের কাছে সঠিকভাবে পৌছিয়ে দিয়েছে। তিন, আল্লাহ তা'আলা জানবেন যে, রসূলগণ তাঁদের রবের বাণীসমূহ তাঁর বান্দাদের কাছে ঠিকমত পৌছিয়ে দিয়েছেন। আয়াতটির শব্দমালা এ তিনটি অর্থেরই ধারক। অসম্ভব নয় যে, এখানে যুগপৎ এ তিনটি অর্থই বুঝানো হয়েছে। এ ছাড়াও আয়াতটির আরো দু'টি অর্থ হয়। প্রথমটি হলো রিসালাতের দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার জন্য রসূলকে যতটুকু 'ইলমে গায়েব' বা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান দান করা জরুরী ততটুকু জ্ঞান দান করা। দ্বিতীয়টি হলো, যেসব ফেরেশতাকে প্রহরা কাজে নিয়োজিত করা হয় তারা রসূল পর্যন্ত সুরক্ষিত পন্থায় অহী পৌছে যাওয়ার ব্যাপারটুকুই শুধু তত্ত্বাবধান করেন না বরং রসূল তাঁর রবের বাণীসমূহ তাঁর বান্দাদের কাছে যাতে পুরোপুরি পৌছিয়ে দিতে পারেন তার তত্ত্বাবধানও করে থাকেন।

৩০. অর্থাৎ আল্লাহর ক্ষমতা রসূল ও ফেরেশতা উভয়কে এমনভাবে পরিব্যাপ্ত করে আছে যে, তারা যদি তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে চুল পরিমাণ কাজও করেন তাহলে সংগে সংগে পাকড়াও হবেন। আর যে বাণীসমূহ আল্লাহ পাঠান তার প্রতিটি বর্ণ গোণা ও হিসেব করা। তার একটি বর্ণের হ্রাস–বৃদ্ধি করার ক্ষমতাও রসূল বা ফেরেশতা কারো নেই।

৭৩

নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতের المزمل শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এটা শুধু সূরাটির নাম, এর বিষয়বস্তুর শিরোনাম নয়।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরার দু'টি রুকূ' দু'টি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নাযিল হয়েছে।

প্রথম রুকূ'র আয়াতগুলো মক্কায় নাযিল হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত। এর বিষয়বস্তু এবং বিভিন্ন হাদীসের বর্ণনা থেকেও তা বুঝা যায়। তবে প্রশ্ন থেকে যায় যে, মক্কী জীবনের কোন্ পর্যায়ে তা নাযিল হয়েছিল? হাদীসের বর্ণনাসমূহ থেকে আমরা এর কোন জবাব পাই না। তবে পুরো রুকূ'টির বিষয়বস্তুর আভ্যন্তরীণ প্রমাণ দ্বারা এর নাযিল হওয়ার সময়–কাল নির্ণয় করতে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যায়।

প্রথমত, এতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাতের বেলা উঠে আল্লাহর ইবাদাত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যাতে তাঁর মধ্যে নবুওয়াতের গুরু দায়িত্ব বহনের শক্তি সৃষ্টি হয়। এ থেকে জানা গেল যে, এ নির্দেশটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের প্রথম যুগে এমন এক সময় নাযিল হয়ে থাকবে যখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এ পদমর্যাদার জন্য তাঁকে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছিল।

দ্বিতীয়ত, এর মধ্যে তাঁকে তাহাজ্জুদ নামাযে অর্ধেক রাত কিংবা তার চেয়ে কম বা বেশী রাত পর্যন্ত কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একথা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তখন পর্যন্ত কুরআন মজীদের অন্তত এতটা পরিমাণ নাযিল হয়েছিল যা দীর্ঘক্ষণ তিলাওয়াত করা যেতো।

তৃতীয়ত, এ 'রুকূ'তে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিরোধীদের অত্যাচার ও বাড়াবাড়ির ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণের উপদেশ এবং মক্কার কাফেরদের আযাবের হুমকি দেয়া হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ রুকূ'টি যখন নাযিল হয়েছিল তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের প্রকাশ্য তাবলীগ বা প্রচার শুরু করে দিয়েছিলেন এবং মক্কায় তাঁর বিরোধিতাও তীব্রতা লাভ করেছিল।

দ্বিতীয় রুকূ' সম্পর্কে মুফাস্সিরগণ যদিও বলেছেন যে, এটিও মক্কায় নাযিল হয়েছে। কিন্তু কিছু সংখ্যক মুফাস্সির একে মদীনায় অবতীর্ণ বলে মত ব্যক্ত করেছেন। এ রুকূ'টির বিষয়বস্তু থেকে এ মতটিরই সমর্থন পাওয়া যায়। কারণ এর মধ্যে আল্লাহর পথে লড়াই করার উল্লেখ আছে। মক্কায় এর কোন প্রশ্নই ছিল না। এতে ফরযকৃত যাকাত আদায়

করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর এটা প্রমাণিত বিষয় যে, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের ওপর একটি নির্দিষ্ট হারে যাকাত দেয়া মদীনাতে ফরয হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

প্রথম সাতটি আয়াতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যে মহান কাজের গুরু দায়িত্ব আপনাকে দেয়া হয়েছে তার দায়–দায়িত্ব ঠিকমত পালনের জন্য আপনি নিজেকে প্রস্তুত করুন। এর বাস্তব পন্থা বলা হয়েছে এই যে, আপনি রাতের বেলা উঠে অর্ধেক রাত কিংবা তার চেয়ে কিছু বেশী সময় বা কিছু কম সময় পর্যন্ত নামায পড়ুন।

৮ থেকে ১৪নং পর্যন্ত আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনি সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সমগ্র বিশ্ব–জাহানের অধিপতি আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়ে যান। নিজের সমস্ত ব্যাপার তাঁর কাছে সোপর্দ করে দিয়ে নিঃশংক ও নিশ্চিন্ত হয়ে যান। বিরোধীরা আপনার বিরুদ্ধে যা বলছে সে ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করুন, তাদের কথায় ভ্রুক্ষেপ করবেন না। তাদের ব্যাপারটা আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিন। তিনিই তাদের সাথে বুঝাপড়া করবেন।

এরপর ১৫ থেকে ১৯ নম্বর পর্যন্ত আয়াতে মক্কার যে সমস্ত মানুষ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা করছিলো তাদের এ বলে হুঁশিয়ারী দেয়া হয়েছে যে, আমি যেমন ফেরাউনের কাছে রসূল পাঠিয়েছিলাম ঠিক তেমনি তোমাদের কাছে একজন রসূল পাঠিয়েছি। কিন্তু দেখো, আল্লাহর রসূলের কথা না শুনে ফেরাউন কিরূপ পরিণামের সম্মুখীন হয়েছিল। মনে করো, এ জন্য দুনিয়াতে তোমাদের কোন শাস্তি দেয়া হলো না। কিন্তু কিয়ামতের দিনের শাস্তি থেকে তোমরা কিভাবে নিষ্কৃতি লাভ করবে?

এ পর্যন্ত যা বর্ণিত হলো তা প্রথম রুকূ'র বিষয়বস্তু। হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়েরের বর্ণনা অনুসারে এর দশ বছর পর দ্বিতীয় রুকূ'টি নাযিল হয়েছিল। তাহাজ্জুদ নামায সম্পর্কে প্রথম রুকূ'র শুরুতেই যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এতে তা সহজ করে দেয়া হয়েছে। এখন নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তাহাজ্জুদ নামায যতটা সহজে ও স্বাচ্ছন্দে আদায় করা সম্ভব সেভাবেই আদায় করবে। তবে মুসলমানদের যে বিষয়টির প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে তাহলো, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায পূর্ণ নিয়মানুবর্তিতাসহ আদায় করবে। যাকাত যেহেতু ফরয তাই তা যথাযথভাবে আদায় করবে এবং আল্লাহর পথে নিজের অর্থ–সম্পদ বিশুদ্ধ নিয়তে খরচ করবে। সবশেষে মুসলমানদের উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, দুনিয়াতে তোমরা যেসব কল্যাণমূলক কাজ আঞ্জাম দেবে তা ব্যর্থ হবে না। বরং তা এমন সব সাজ–সরঞ্জামের মত যা একজন মুসাফির তার স্থায়ী বাসস্থানে আগেই পাঠিয়ে দেয়। আল্লাহর কাছে পৌছার পর তোমরা তার সবকিছুই পেয়ে যাবে যা দুনিয়া থেকে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলে। আগেভাগেই পাঠিয়ে দেয়া এসব সরঞ্জাম–সামগ্রী তোমরা দুনিয়াতে যা ছেড়ে যাবে তার চেয়ে যে শুধু ভাল তাই নয়, বরং আল্লাহর কাছে তোমরা তোমাদের আসল সম্পদের চেয়ে অনেক বেশী পুরস্কারও লাভ করবে।

يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۝١ قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝٢ نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ۝٣ اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ۝٤ اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ۝٥ اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْاً وَّاَقْوَمُ قِيْلًا ۝٦ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا ۝٧ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ۝٨

হে বস্ত্র মুড়ি দিয়ে শয়নকারী[১] রাতের বেলা নামাযে রত থাকো। তবে কিছু সময় ছাড়া[২] অর্ধেক রাত, কিংবা তার চেয়ে কিছু কম করো। অথবা তার ওপর কিছু বাড়িয়ে নাও।[৩] আর কুরআন থেমে থেমে পাঠ করো।[৪] আমি অতি শীঘ্র তোমার ওপর একটি গুরুভার বাণী নাযিল করবো।[৫] প্রকৃতপক্ষে রাতের বেলা জেগে ওঠা[৬] প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে অনেক বেশী কার্যকর[৭] এবং যথাযথভাবে কুরআন পড়ার জন্য উপযুক্ত সময়[৮] দিনের বেলা তো তোমার অনেক ব্যস্ততা রয়েছে। নিজ প্রভুর নাম স্মরণ করতে থাকো[৯] এবং সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁরই জন্য হয়ে যাও।

১. এ শব্দগুলো দ্বারা আল্লাহ তা'আলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি যেন রাতের বেলা ওঠেন এবং ইবাদাতের জন্য দাঁড়িয়ে থাকেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, সে সময় তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন অথবা ঘুমানোর জন্য চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। এ সময় তাঁকে হে নবী (স) অথবা হে রসূল বলে সম্বোধন না করে হে বস্ত্র মুড়ি দিয়ে শয়নকারী বলে সম্বোধন একটি তাৎপর্যপূর্ণ সম্বোধন। এর যে অর্থ দাঁড়ায় তা হলো, এখন আর সে সময় নেই যখন তিনি নিশ্চিন্তে আরামে ঘুমাতেন। এখন তাঁর ওপর এমন এক বিরাট কাজের বোঝা চাপানো হয়েছে যার দাবী ও চাহিদা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের।

২. এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, নামাযে দাঁড়িয়ে রাত অতিবাহিত করো এবং রাতের অল্প কিছু সময় মাত্র ঘুমে কাটাও। দুই, তোমার কাছে সমস্ত রাতই নামায পড়ে কাটিয়ে দেয়ার দাবী করা হচ্ছে না। বরং তুমি বিশ্রামও করো এবং রাতের একটা ক্ষুদ্র

অংশ ইবাদাত–বন্দেগীতেও ব্যয় করো। কিন্তু পরবর্তী বিষয়বস্তুর সাথে প্রথমোক্ত অর্থটাই অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। সূরা দাহরের ২৬নং আয়াত থেকে একথারই সমর্থন পাওয়া যায়। উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيْلاً

"রাতের বেলা আল্লাহর সামনে সিজদায় পড়ে থাকো এবং রাতের বেশীর ভাগ সময় তাঁর তাসবীহ ও প্রশংসায় অতিবাহিত করো।"

৩. যে সময়টুকু ইবাদাত করে কাটাতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল সে সময়ের পরিমাণ কি হবে এটা তারই ব্যাখ্যা। এতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে, তিনি ইচ্ছা করলে অর্ধেক রাত নামায পড়ে কাটাতে পারেন কিংবা তার চেয়ে কিছু কম বা বেশী করতে পারেন। তবে বাচনভঙ্গী থেকে বুঝা যায় যে, অর্ধেক রাত–ই অগ্রাধিকারযোগ্য। কারণ অর্ধেক রাতকে মানদণ্ড নির্ধারিত করে তার থেকে কিছু কম বা তার চেয়ে কিছু বেশী করার ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে।

৪. অর্থাৎ তাড়াতাড়ি ও দ্রুতগতিতে পড়ো না। বরং ধীরে ধীরে প্রতিটি শব্দ সুন্দরভাবে মুখে উচ্চারণ করে পড়ো। এক একটি আয়াত পড়ে থেমে যাও যাতে মন আল্লাহর বাণীর অর্থ ও তার দাবীকে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারে এবং তার বিষয়বস্তু দ্বারা প্রভাবিত হয়। কোন জায়গায় আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীর উল্লেখ থাকলে তার মহত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও ভীতি যেন মনকে ঝাঁকুনি দেয়। কোন জায়গায় তাঁর রহমত ও করুণার বর্ণনা আসলে হৃদয়–মন যেন কৃতজ্ঞতার আবেগে আপ্লুত হয়ে ওঠে। কোন জায়গায় তাঁর গযব ও শাস্তির উল্লেখ থাকলে হৃদয়–মন যেন তার ভয়ে কম্পিত হয়। কোথাও কোন কিছু করার নির্দেশ থাকলে কিংবা কোন কাজ করতে নিষেধ করা হয়ে থাকলে কি কাজ করতে আদেশ করা হয়েছে এবং কোন্ কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে তা যেন ভালভাবে বুঝে নেয়া যায়। মোট কথা কুরআনের শব্দগুলো শুধু মুখ থেকে উচ্চারণ করার নাম কুরআন পাঠ নয়, বরং মুখ থেকে উচ্চারণ করার সাথে সাথে তা উপলব্ধি করার জন্য গভীরভাবে চিন্তা–ভাবনাও করতে হবে। হযরত আনাসকে (রা) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কুরআন পাঠের নিয়ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, শব্দগুলোকে টেনে টেনে পড়তেন। উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়ে বললেন যে, তিনি আল্লাহ, রাহমান এবং রাহীম শব্দকে মদ্দ করে বা টেনে পড়তেন। (বুখারী) হযরত উম্মে সালামাকে একই প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক একটি আয়াত আলাদা আলাদা করে পড়তেন এবং প্রতিটি আয়াত পড়ে থামতেন। যেমন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ পড়ে থামতেন, তারপর الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়ে থামতেন এবং কিছু সময় থেমে থেকে مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ পড়তেন। (মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী) আরেকটি রেওয়ায়াতে হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একেকটি শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ করে পড়তেন। (তিরমিযী, নাসায়ী) হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান বর্ণনা করেছেন যে, একদিন রাতে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নামায পড়তে দাঁড়ালাম। আমি দেখলাম, তিনি

এমনভাবে কুরআন তেলাওয়াত করছেন যে, যেখানে তাসবীহের বিষয় আসছে সেখানে তিনি তাসবীহ পড়ছেন, যেখানে দোয়ার বিষয় আসছে সেখানে দোয়া করছেন এবং যেখানে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনার বিষয় আসছে সেখানে তিনি আশ্রয় প্রার্থনা করছেন। (মুসলিম, নাসায়ী) হযরত আবু যার বর্ণনা করেছেন যে, একবার রাতের নামাযে কুরআন তেলাওয়াত করতে করতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এ আয়াতটির কাছে পৌছলেন إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ "তুমি যদি তাদের শাস্তি দাও, তারা তোমারই বান্দা। আর যদি তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও তাহলে তুমি পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ) তখন তিনি বার বার এ আয়াতটিই পড়তে থাকলেন এবং এভাবে ভোর হয়ে গেল।" (মুসনাদে আহমাদ, বুখারী)

৫. এর অর্থ হলো তোমাকে রাতের বেলা নামায পড়ার এ নির্দেশ এ জন্য দেয়া হচ্ছে যে, আমি একটি অতি গুরুভার বাণী তোমার ওপরে নাযিল করছি। এ ভার বহন করার এবং তা বরদাশত করার শক্তি তোমার মধ্যে সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক। তুমি এ শক্তি অর্জন করতে চাইলে আরাম পরিত্যাগ করে রাতের বেলা নামাযের জন্য ওঠো এবং অর্ধেক রাত কিংবা তার চেয়ে কিছু কম বা বেশী রাত ইবাদাত বন্দেগীতে কাটিয়ে দাও। কুরআনকে গুরুভার বাণী বলার কারণ হলো, তার নির্দেশ অনুসারে কাজ করা, তার শিক্ষার উদাহরণ হিসেবে নিজেকে তুলে ধরা, সারা দুনিয়ার সামনে তার দাওয়াত বা আহবান নিয়ে দাঁড়ানো এবং তদনুযায়ী আকীদা-বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, নৈতিক চরিত্র ও আচার-আচরণ এবং তাহযীব-তামাদ্দুনের গোটা ব্যবস্থায় বিপ্লব সংঘটিত করা এমন একটি কাজ যে, এর চেয়ে বেশী কঠিন ও গুরুভার কাজের কল্পনাও করা যায় না। এ জন্যও একে গুরুভার ও কঠিন বাণী বলা হয়েছে যে, তার অবতরণের ভার বহন করা অত্যন্ত কঠিন কাজ ছিল। হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) বর্ণনা করেছেন যে, একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অহী নাযিল হওয়ার সময় তিনি আমার উরুর ওপর তাঁর উরু ঠেকিয়ে বসেছিলেন। আমার উরুর ওপর তখন এমন চাপ পড়ছিলো যে, মনে হচ্ছিলো তা এখনই ভেঙে যাবে। হযরত আয়েশা বর্ণনা করেন ঃ আমি প্রচণ্ড শীতের দিনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অহী নাযিল হতে দেখেছি। সে সময়ও তাঁর কপাল থেকে ঘাম ঝরতে থাকতো। (বুখারী, মুসলিম, মালিক, তিরমিযী, নাসায়ী) আরেকটি রেওয়ায়াতে হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ উটনীর ওপর সওয়ার থাকা অবস্থায় যখনই তাঁর ওপর অহী নাযিল হতো উটনী তখন তার বুক মাটিতে ঠেকিয়ে দিতো। অহী নাযিল শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে নড়াচড়া পর্যন্ত করতে পারতো না। (মুসনাদে আহমাদ, হাকেম, ইবনে জারীর)।

৬. মূল ইবারাতে نَاشِئَةَ الَّيْلِ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার ব্যাখ্যায় মুফাস্সির ও ভাষাবিদদের চারটি ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। একটি মত হলো, نَاشِئَةً শব্দের মানে রাতের বেলা শয্যা ত্যাগকারী ব্যক্তি। দ্বিতীয় মতটি হলো এর অর্থ রাত্রিকালীন সময়। তৃতীয় মত হলো এর অর্থ রাতের বেলা জেগে থাকা বা ওঠা। আর চতুর্থ মতটি হলো, এর অর্থ শুধু রাতের বেলা ওঠা বা জেগে থাকা নয়। বরং ঘুমিয়ে পড়ার পর জেগে ওঠা। হযরত আয়েশা এবং মুজাহিদ এ চতুর্থ অর্থটিই গ্রহণ করেছেন।

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۝٩ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ۝١٠ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ۝١١ إِنَّ لَدَيْنَآ أَنْكَالًا وَجَحِيمًا ۝١٢ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ۝١٣ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ۝١٤

তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তাই তাঁকেই নিজের উকীল হিসেবে গ্রহণ করো।[১০] *আর লোকেরা যা বলে বেড়াচ্ছে সে বিষয়ে ধৈর্যধারণ করো এবং ভদ্রভাবে তাদের থেকে আলাদা হয়ে যাও।*[১১] *এসব মিথ্যা আরোপকারী সম্পদশালী লোকদের সাথে বুঝাপড়ার ব্যাপারটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও।*[১২] *আর কিছু কালের জন্য এদেরকে এ অবস্থায়ই থাকতো দাও। আমার কাছে (এদের জন্য) আছে শক্ত বেড়ি,*[১৩] *জ্বলন্ত আগুন, গলায় আটকে যাওয়া খাবার এবং যন্ত্রণাদায়ক আযাব। এসব হবে সেদিন যেদিন পৃথিবী ও পর্বতমালা কেঁপে উঠবে এবং পাহাড়গুলোর অবস্থা হবে এমন যেন বালুর স্তূপ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে।*[১৪]

৭. আয়াতে أَشَدُّ وَطْئًا শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ এতো ব্যাপক যে, একটি মাত্র বাক্যে তা বুঝানো সম্ভব নয়। এর একটি অর্থ হলো, রাতের বেলা ইবাদাত–বন্দেগীর জন্য শয্যা ত্যাগ করে ওঠা এবং দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকা যেহেতু মানুষের স্বভাব–বিরুদ্ধ কাজ, মানুষের মন ও প্রবৃত্তি এ সময় আরাম কামনা করে, তাই এটি এমন একটি কাজ ও চেষ্টা–সাধনা যা প্রবৃত্তিকে অবদমিত ও বশীভূত করার জন্য অত্যন্ত কার্যকর পন্থা। যে ব্যক্তি এ পন্থায় নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করতে সক্ষম হয় এবং দেহ ও মন–মগজের ওপর প্রভাব বিস্তার করে নিজের এ শক্তিকে আল্লাহর পথে ব্যবহার করতে সক্ষম হয় সে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সত্য ও শাশ্বত এ দীনের দাওয়াতকে পৃথিবীতে বিজয়ী করার কাজ করতে পারে। দ্বিতীয় অর্থ হলো, এ কাজটি মানুষের হৃদয়–মন ও বক্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করার একটা কার্যকর উপায়। কারণ রাতের এ সময়টিতে বান্দা ও আল্লাহর মধ্যে আর কেউ আড়াল হয় না। এ অবস্থায় মানুষ মুখে যা বলে তা তার হৃদয়ের কথার প্রতিধ্বনি। তৃতীয় অর্থ হলো, এটি মানুষের ভেতর ও বাহিরের মধ্যে সংগতি ও মিল সৃষ্টির অতি কার্যকর একটি উপায়। কারণ যে ব্যক্তি রাতের নির্জন নিথর পরিবেশে আরাম পরিত্যাগ করে ইবাদাত–বন্দেগীর জন্য উঠবে সে নিসন্দেহে খালেস মনেই এরূপ করবে। তাতে প্রদর্শনীর বা লোক দেখানোর আদৌ কোন সুযোগ থাকে না। চতুর্থ অর্থ হলো, মানুষের জন্য এ ধরনের ইবাদাত–বন্দেগী যেহেতু দিনের বেলার ইবাদাত–বন্দেগীর চেয়ে অনেক বেশী কষ্টকর। তাই তা নিয়মিত করার ফলে মানুষের মধ্যে অনেক বেশী দৃঢ়তা সৃষ্টি হয়,

সে অত্যন্ত শক্ত হয়ে আল্লাহর পথে অগ্রসর হতে পারে এবং এ পথের কঠোরতাসমূহকে সে অটল ও অবিচল থেকে বরদাশত করতে পারে।

৮. মূল ইবারতে أَقْوَمُ قِيلًا বলা হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হলো, 'কথাকে আরো বেশী যথার্থ ও সঠিক বানায়।' তবে এর মূল বক্তব্য হলো, সে সময় মানুষ আরো বেশী প্রশান্তি, তৃপ্তি ও মনোযোগ সহকারে বুঝে কুরআন শরীফ পড়তে পারে। ইবনে আব্বাস (রা) এর ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে اجدران يفقه فى القران অর্থাৎ গভীর চিন্তা–ভাবনা ও মনোনিবেশসহ কুরআন পাঠের জন্য এটা একটা অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত সময়। (আবু দাউদ)

৯. দিনের বেলার ব্যস্ততার উল্লেখ করার পর 'তোমার রবের নাম স্মরণ করতে থাকো' এ নির্দেশ দেয়া থেকে আপনা আপনি একথাটি প্রকাশ পায় যে, দুনিয়াতে হাজারো কাজের মধ্যে ডুবে থেকেও তোমার রবের স্মরণ থেকে গাফেল যেন না হও। বরং কোন না কোনভাবে তাকে স্মরণ করতে থাকো। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আহযাব, টীকা ৬৩)

১০. উকীল বলা হয় এমন ব্যক্তিকে যার প্রতি আস্থা রেখে কোন ব্যক্তি নিজের ব্যাপার তার ওপর সোপর্দ করে। উর্দু ভাষাতে প্রায় এ অর্থেই আমরা এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে উকীল শব্দটি ব্যবহার করি আমাদের মামলা–মোকদ্দমা যার হাতে অর্পণ করে কেউ এতটা নিশ্চিন্ত হয়ে যায় যে, সে তার পক্ষ থেকে ভালভাবেই মামলাটি লড়বে এবং তার নিজের এ মামলা লড়ার কোন দরকার হবে না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আয়াতটির অর্থ হলো, দীনের দাওয়াত পেশ করার কারণে তোমার বিরোধিতার যে তূফান সৃষ্টি হয়েছে এবং তোমার ওপর যেসব বিপদ–মুসিবত আসছে সে জন্য তুমি অস্থির বা উৎকণ্ঠিত হয়ো না। তোমার প্রভু তো সেই সত্তা যিনি পূর্ব ও পশ্চিম তথা সমগ্র বিশ্ব–জাহানের মালিক। ইলাহী ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁর ছাড়া আর কারো হাতে নেই। তুমি তোমার সমস্ত ব্যাপার তাঁর হাতে সোপর্দ করে দাও এবং নিশ্চিন্ত হয়ে যাও যে, এখন তোমার মোকদ্দমা তিনি নিজে লড়বেন, তোমার বিরুদ্ধবাদীদের সাথে তিনিই বুঝাপড়া করবেন এবং তোমার সব কাজ তিনিই সম্পন্ন করবেন।

১১. 'আলাদা হয়ে যাও' কথাটির অর্থ এই নয় যে, তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ইসলামের তাবলীগের কাজ বন্ধ করে দাও। বরং এর অর্থ হলো, তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করো না, তাদের অন্যায় ও অর্থহীন আচরণ উপেক্ষা করে চলো এবং তাদের কোন অভদ্র আচরণের জবাব দিও না। তবে তাদের প্রতি এ উপেক্ষা এবং নির্লিপ্ততাও যেন কোন প্রকার ক্ষোভ, ক্রোধ এবং বিরক্তিসহ না হয়। বরং তা যেন এমন উপেক্ষা হয়, যেমন একজন ভদ্র মানুষ কোন অসভ্য বাউণ্ডেলে বা বখাটে লোকের গালি শুনে যেমন তা উপেক্ষা করে এবং মনকে ভারাক্রান্ত হতে পর্যন্ত দেয় না। এ থেকে এরূপ ভুল ধারণা সৃষ্টি হওয়া ঠিক নয় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্মপদ্ধতি বোধ হয় এ থেকে কিছুটা ভিন্ন ধরনের ছিল। তাই আল্লাহ তাঁকে এ আদেশ করেছেন। তিনি মূলত প্রথম থেকেই এ কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করছিলেন। তবে কুরআনে এ নির্দেশ দেয়ার উদ্দেশ্য হলো কাফেরদের একথা জানিয়ে দেয়া যে, তোমরা যে আচরণ করছো তার জবাব না দেয়ার কারণ দুর্বলতা নয়। বরং এরূপ আচরণের জবাবে আল্লাহ তাঁর রসূলকে এ ধরনের ভদ্রজনোচিত পন্থা গ্রহণ করার শিক্ষা দিয়েছেন।।

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا ۙ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ﴿١٦﴾ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿١٧﴾ السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ ۚ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ﴿١٨﴾ إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿١٩﴾

আমি তোমাদের[১৫] নিকট একজন রসূল পাঠিয়েছি তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ[১৬] যেমন ফেরাউনের নিকট একজন রসূল পাঠিয়েছিলাম। দেখো, ফেরাউন যখন সে রসূলের কথা মানলো না তখন আমি তাকে কঠোরভাবে পাকড়াও করলাম। তোমরা যদি মানতে অস্বীকার করো তাহলে সেদিন কিভাবে রক্ষা পাবে যেদিনটি শিশুকে বৃদ্ধ বানিয়ে দেবে?[১৭] যেদিনের কঠোরতায় আকাশ মণ্ডল বিদীর্ণ হয়ে যেতে থাকবে? আল্লাহর প্রতিশ্রুতি তো পূর্ণ হবেই। এ একটি উপদেশ বাণী। অতএব যে চায় সে তার প্রভুর পথ অবলম্বন করুক।

১২. একথা থেকে এ মর্মে স্পষ্ট ইংগিত পাওয়া যায় যে, মক্কায় যেসব লোক রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মিথ্যা আরোপ করছিল এবং নানাভাবে ধোঁকা দিয়ে এবং নানা রকমের স্বার্থপ্রীতি সংকীর্ণতা ও বিদ্বেষ উস্কে দিয়ে তাঁর বিরোধিতায় নামছিল তারা সবাই ছিল জাতির সচ্ছল, সম্পদশালী ও বিলাসপ্রিয় মানুষ। কারণ ইসলামের এ সংস্কার আন্দোলনের আঘাত তাদের স্বার্থের ওপর সরাসরি পড়ছিল। কুরআন আমাদের বলে যে, এ আচরণ শুধু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথেই ছিল না বরং এ গোষ্ঠী চিরদিনই সংস্কার ও সংশোধনের পথ রুদ্ধ করার জন্য জগদ্দল পাথরের মত বাধা সৃষ্টি করে এসেছে। উদাহরণ হিসেবে দেখুন, সূরা আল আ'রাফ, আয়াত ৬০, ৬৬, ৭৫, ৮৮; আল মু'মিনূন, ৩৩; সাবা, ৩৪ ও ৩৫ এবং আয যুখরুফ, ২৩)

১৩. জাহান্নামে পাপী ও অপরাধীদের পায়ে ভারী বেড়ি পরানো হবে। তারা যাতে পালাতে না পারে সে জন্য এ বেড়ি পরানো হবে না, বরং তা পরানো হবে এ জন্য যে, তারা যেন উঠতে না পারে। এ বেড়ি পালিয়ে যাওয়া রোধ করার জন্য নয় বরং শাস্তি বৃদ্ধি করার জন্য।

১৪. সে সময় পাহাড়সমূহের বিভিন্ন অংশকে পরস্পর সংযুক্ত রাখার কেন্দ্রীয় বল নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাই প্রথমে তা মিহি বালুর স্তূপে পরিণত হবে। অতপর ভূমিকম্প গোটা পৃথিবীকে প্রবলভাবে কাঁপিয়ে তুললে বালুর এ স্তূপ বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে এবং গোটা ভূপৃষ্ঠ একটা বিশাল প্রান্তরে রূপান্তরিত হবে। এ অবস্থার একটি চিত্র সূরা ত্বা–হার ১০৫ থেকে ১০৭ আয়াত পর্যন্ত এভাবে তুলে ধরা হয়েছে ঃ "লোকেরা তোমাকে এসব পাহাড়ের অবস্থা কি হবে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তুমি বলো, আমার প্রভু পাহাড়সমূহকে

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۙ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

২ রুকূ'

হে নবী,[১৮] তোমার রব জানেন যে, তুমি কোন সময় রাতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, কোন সময় অর্ধাংশ এবং কোন সময় এক-তৃতীয়াংশ সময় ইবাদাতে দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দাও।[১৯] তোমার সংগী একদল লোকও এ কাজ করে।[২০] রাত এবং দিনের সময়ের হিসেব আল্লাহই রাখেন। তিনি জানেন, তোমরা সময়ের সঠিক হিসেব রাখতে পারো না। তাই তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। এখন থেকে কুরআন শরীফের যতটুকু স্বাচ্ছন্দে পড়তে পারবে ততটুকুই পড়বে।[২১] তিনি জানেন, তোমাদের মধ্যকার কিছু লোক হবে অসুস্থ, কিছু লোক আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে ভ্রমণরত,[২২] এবং কিছু লোক আল্লাহর পথে লড়াই করে।[২৩] তাই কুরআনের যতটা পরিমাণ সহজেই পড়া যায় ততটাই পড়তে থাকো। নামায কায়েম করো, যাকাত দাও[২৪] এবং আল্লাহকে 'করযে হাসানা' দিতে থাকো।[২৫] তোমরা নিজের জন্য যে পরিমাণ কল্যাণ অগ্রিম পাঠিয়ে দেবে তা আল্লাহর কাছে প্রস্তুত পাবে। সেটিই অধিক উত্তম এবং পুরস্কার হিসেবে অনেক বড়।[২৬] আর তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

ধুলির মত করে ওড়াবেন এবং ভূপৃষ্ঠকে এমন সমতল বিশাল প্রান্তরে রূপান্তরিত করবেন যে, তুমি সেখানে উঁচু নীচু বা ভাঁজ দেখতে পাবে না।"

১৫. মক্কার যেসব কাফের রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অস্বীকার করছিলো এবং তাঁর বিরোধিতায় অতি মাত্রায় তৎপর ছিল এখানে তাদের উদ্দেশ করে বলা হচ্ছে।

১৬. লোকদের জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাক্ষী বানিয়ে পাঠানোর একটি অর্থ হলো, তিনি দুনিয়ায় তাদের সামনে নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে সত্যের সাক্ষ পেশ করবেন। আরেকটি হলো আখেরাতে যখন আল্লাহর আদালত কায়েম হবে সে সময় তিনি সাক্ষ দেবেন যে, এসব লোকের কাছে আমি সত্যের আহবান পৌছিয়ে দিয়েছিলাম। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল বাকারা, টীকা ১৪৪; আন নিসা, টীকা ৬৪; আন্ নাহ্ল, আয়াত ৮৪–৮৯; আল আহযাব, টীকা ৮২; আল ফাত্হ, টীকা ১৪)

১৭. অর্থাৎ প্রথম তো তোমাদের এ ভয় করা উচিত যে, আমার প্রেরিত রসূলের কথা যদি তোমরা না মানো তাহলে এ একই অপরাধের কারণে ফেরাউন যে দুর্ভাগ্যজনক পরিণাম ভোগ করেছে অনুরূপ পরিণাম দুনিয়াতেই তোমাদের ভোগ করতে হবে। আর মনে করো, দুনিয়ায় যদি তোমাদের জন্য কোন আযাবের ব্যবস্থা নাও করা হয় তাহলেও কিয়ামতের আযাব থেকে কিভাবে নিষ্কৃতি পাবে?

১৮. ইতিপূর্বে তাহাজ্জুদ নামাযের যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এ আয়াতের মাধ্যমে তা শিথিল ও সহজ করা হয়েছে। এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার সময়–কাল সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন রেওয়ায়াত আছে। মুসনাদে আহমাদ, মুসলিম ও আবু দাউদে এ রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে যে, তাহাজ্জুদ নামায সম্পর্কে প্রথম নির্দেশের পর এ দ্বিতীয় নির্দেশটি এক বছর পর নাযিল হয়েছিল এবং রাতের বেলার ইবাদাত–বন্দেগী ফরয পর্যায়ে না রেখে নফল করে দেয়া হয়েছিল। ইবনে জারীর এবং ইবনে আবী হাতেম হযরত আয়েশা (রা) থেকেই আর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ নির্দেশটি প্রথম নির্দেশের আট মাস পরে দেয়া হয়েছিল। হযরত আয়েশা থেকে ইবনে আবী হাতেম তৃতীয় আরেকটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। এতে পরবর্তী নির্দেশটি ষোল মাস পরে নাযিল হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আবু দাউদ, ইবনে জারীর এবং ইবনে আবী হাতেম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে এক বছর সময়ের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়েরের বর্ণনা হলো, নির্দেশটি দশ বছর পর নাযিল হয়েছিল (ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম)। আমাদের মতে এ বর্ণনাটিই অধিক বিশুদ্ধ। কারণ প্রথম রুকূ'র বিষয়বস্তু থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তা মক্কায় নাযিল হয়েছিল এবং মক্কী যুগেরও একদম প্রথম দিকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতলাভের পর তখন বড়জোর চারটি বছর অতিবাহিত হয়েছিল। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় রুকূ'র বিষয়বস্তুর স্পষ্ট বক্তব্য অনুসারে তা মদীনাতে নাযিল হয়েছিল বলে মনে হয়। তখন কাফেরদের সাথে সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং যাকাত ফরয হওয়ার নির্দেশও দেয়া হয়েছিল। তাই এ দু'টি রুকূ'র নাযিল হওয়ার সময়কালের মধ্যে অনিবার্যভাবে কম করে হলেও দশ বছরের ব্যবধান হওয়া উচিত।

১৯. প্রাথমিক নির্দেশে যদিও অধিক রাত বা তার চেয়ে কিছু কম বা বেশী সময় নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতে বলা হয়েছিল। কিন্তু নামাযে নিমগ্নতার কারণে সময়ের আন্দাজ বা

পরিমাপ ঠিক থাকতো না। আর সে সময় ঘড়িও ছিল না যে, সময় ঠিকমত পরিমাপ করা যাবে। সুতরাং কোন সময় দুই–তৃতীয়াংশ রাত পর্যন্ত ইবাদাতে কেটে যেতো আবার কোন সময় তা হ্রাস পেয়ে শুধু এক–তৃতীয়াংশের মত হতো।

২০. প্রথম পর্যায়ে নির্দেশ দেয়ার সময় শুধু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই সম্বোধন করা হয়েছিল এবং তাঁকেই রাতে নামায পড়তে বলা হয়েছিল। কিন্তু সে সময় মুসলমানদের মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ এবং নেকী অর্জনের যে অস্বাভাবিক উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিল সে কারণে অধিকাংশ সাহাবীও এ নামাযকে গুরুত্ব দিতেন এবং তা পড়তেন।

২১. কুরআন তেলাওয়াত দীর্ঘায়িত হওয়ার কারণেই যেহেতু নামায দীর্ঘায়িত হয় সে জন্য বলেছেন যে, তাহাজ্জুদ নামাযে যতটা পরিমাণ কুরআন সহজে ও স্বাচ্ছন্দে পড়তে পার, ততটাই পড়। এভাবে দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী নামায আপনা থেকেই হ্রাস প্রাপ্ত হবে। এ কথাটির শব্দমালা বাহ্যিকভাবে যদিও নির্দেশের মত, কিন্তু এ বিষয়ে সবাই একমত যে, তাহাজ্জুদের নামায ফরয নয়, বরং নফল। হাদীসেও স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমাদের জন্য দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয। সে জিজ্ঞেস করলো ঃ এ ছাড়া অন্য কিছু কি আমার জন্য অবশ্য করণীয়? জবাবে বলা হলো, 'না'। তবে তুমি স্বেচ্ছায় কিছু পড়লে, তা ভিন্ন কথা। (বুখারী ও মুসলিম)।

এ আয়াত থেকে আরো একটি কথা জানা গেল যে, নামাযে রুকূ' ও সিজদা যেমন ফরয তেমনি কুরআন মজীদ পড়াও ফরয। কারণ আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য স্থানে যেমন রুকূ' ও সিজদা শব্দ নামায অর্থে ব্যবহার করেছেন তেমনি এখানে কুরআন পড়ার কথা উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এর অর্থ নামাযে কুরআন পড়া। এভাবে প্রমাণ পেশ করার ব্যাপারে কেউ যদি একথা বলে আপত্তি উত্থাপন করে যে, তাহাজ্জুদের নামাযই যখন নফল, তখন সে নামাযে কুরআন মজীদ পড়া ফরয হয় কি করে? এর জবাব হলো, কেউ যখন নফল নামায পড়বে তখন নফল নামাযেরও সব শর্ত পূরণ করা এবং তার সব 'রুকন' ও ফরয আদায় করা আবশ্যক। কেউ একথা বলতে পারে না যে, নফল নামাযের জন্য কাপড় ও শরীর পবিত্র হওয়া, অযু করা এবং সতর থাকা ওয়াজিব নয় এবং নফল নামাযে দাঁড়ানো, বসা এবং রুকূ' ও সিজদা করা সবই নফল।

২২. হালাল ও বৈধ উপায়ে রুজি অর্জনের উদ্দেশ্যে সফর করাকে কুরআন মজীদ বিভিন্ন স্থানে আল্লাহর মেহেরবানী ও করুণা অনুসন্ধান বলে আখ্যায়িত করেছে।

২৩. এখানে আল্লাহ তা'আলা হালাল রুজি উপার্জন এবং আল্লাহর পথে জিহাদের উল্লেখ এক সাথে যেভাবে করেছেন এবং অসুস্থতা জনিত অক্ষমতা ছাড়া এ দু'টি কাজকেও তাহাজ্জুদ নামায এবং অব্যাহতি লাভের কিংবা তা কিছুটা লাঘব করার কারণ হিসেবে গণ্য করেছেন তা থেকে বুঝা যায় যে, ইসলামে বৈধ পন্থায় রুজি উপার্জন করা কত বড় মর্যাদার কাজ। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

ما من جالبٍ يجلبُ طعاماً الى بلدٍ من بلدان المسلمين فيبيعه لِسِعْرِ يومِهِ الا كانت منزلته عند الله ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم واخرون يضربون فى الارض ....

যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোন শহর বা জনপদে খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আসে এবং সে দিনের বাজার দরে তা বিক্রি করে সে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে। এরপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতটি পড়লেন واخرون يضربون فى الارض .... (ইবনে মারদুইয়া)

হযরত উমর (রা) বলেছেন ঃ

ما من حال ياتينى عليه الموت بعد الجهاد فى سبيل الله احب الى من ان ياتينى وانا بين شعبتى جبل التمس من فضل الله وقرأ هذه الاية -

আল্লাহর পথে জিহাদ ছাড়া আর কোন অবস্থায় প্রাণ দেয়া আমার কাছে সর্বাধিক পছন্দনীয় হয়ে থাকলে তা হলো এই যে, আমি আল্লাহর অনুগ্রহ বা মেহেরবানী অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে কোন গিরিপথ অতিক্রম কালে সেখানে মৃত্যু এসে আমাকে আলিঙ্গন করছে। তার পর তিনি এ আয়াতটি পড়লেন। (বায়হাকী ফী শু'আবিল ঈমান)

২৪. এখানে নামায কায়েম করা এবং যাকাত দেয়া বলতে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায এবং ফরয যাকাত বুঝানো হয়েছে। এ ব্যাপারে মুফাস্সিরগণ সবাই একমত।

২৫. ইবনে যায়েদ বলেন ঃ এর অর্থ যাকাত দেয়া ছাড়াও নিজের অর্থ-সম্পদ আল্লাহর পথে খরচ করা। এ খরচ আল্লাহর পথে জিহাদ করা, আল্লাহর বান্দাদের সাহায্য করা, জনকল্যাণমূলক কাজ করা কিংবা অন্যান্য কল্যাণকর কাজেও হতে পারে। আল্লাহকে কর্জ এবং উত্তম কর্জ দেয়ার অর্থ কি তার ব্যাখ্যা আমরা ইতিপূর্বে বিভিন্ন স্থানে করেছি। (দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল বাকারাহ, টীকা ২৬৭; আল মা-য়েদাহ, টীকা ৩৩ এবং আল হাদীদ, টীকা ১৬)।

২৬. এর অর্থ হলো, আখেরাতের জন্য যা কিছু তোমরা আগেই পাঠিয়ে দিয়েছো তা তোমাদের ঐ সব জিনিসের চেয়ে অনেক বেশী উপকারী যা তোমরা দুনিয়াতেই রেখে দিয়েছো এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নিমিত্ত কোন কল্যাণকর কাজে ব্যয় করোনি। হাদীসে উল্লেখ আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন যে, এক সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ ايكم ماله احب اليه من مال وارثه "তোমাদের এমন কেউ আছে যার নিজের অর্থ-সম্পদ তার উত্তরাধিকারীর অর্থ-সম্পদের চেয়ে তার কাছে বেশী প্রিয়? জবাবে লোকেরা বললো, "হে আল্লাহর রসূল, আমাদের মধ্যে কেউ-ই এমন নেই যার নিজের অর্থ-সম্পদ তাঁর কাছে তার উত্তরাধিকারীর অর্থ-সম্পদ থেকে বেশী প্রিয় নয়।" তখন তিনি বললেন ঃ 'তোমরা কি

বলছো তা ভেবে দেখো।' লোকেরা বললো ঃ হে আল্লাহর রসূল, আমাদের অবস্থা আসলেই এরূপ। একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

انما مال احدكم ماقدّم ومال وارثه ما اخّر

তোমাদের নিজের অর্থ–সম্পদ তো সেইগুলো যা তোমরা আখেরাতের জন্য অগ্রিম পাঠিয়ে দিয়েছো। আর যা তোমরা রেখে দিয়েছো সেগুলো ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারীদের অর্থ–সম্পদ। (বুখারী, নাসায়ী ও মুসনাদে আবু ইয়ালা)।

আল মুদ্দাস্‌সির

৭৪

নামকরণ

প্রথম আয়াতের اَلْمُدَّثِّر শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এটিও শুধু সূরার নাম। এর বিষয় ভিত্তিক শিরোনাম নয়।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এর প্রথম সাতটি আয়াত পবিত্র মক্কা নগরীতে নবুওয়াতের একেবারে প্রাথমিক যুগে নাযিল হয়েছিল। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণিত বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী এবং মুসনাদে আহমাদ ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের কোন কোন রেওয়ায়াতে এতদূর পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, এগুলো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিল হওয়া সর্বপ্রথম আয়াত। কিন্তু গোটা মুসলিম উম্মার কাছে এ বিষয়টি প্রায় সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সর্বপ্রথম যে অহী নাযিল হয়েছিল তা ছিল اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ থেকে مَالَمْ يَعْلَمْ পর্যন্ত। তবে বিশুদ্ধ রেওয়ায়াতসমূহ থেকে একথা প্রমাণিত যে, এ প্রথম অহী নাযিল হওয়ার পর কিছুকাল পর্যন্ত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর কোন অহী নাযিল হয়নি। এ বিরতির পর নতুন করে আবার অহী নাযিলের ধারা শুরু হলে সূরা মুদ্দাস্‌সিরের এ আয়াতগুলো থেকেই তা শুরু হয়েছিল। ইমাম যুহরী এর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন এভাবে ঃ

"কিছুকাল পর্যন্ত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অহী নাযিল বন্ধ রইলো। সে সময় তিনি এতো কঠিন মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছিলেন যে, কোন কোন সময় পাহাড়ের চূড়ায় উঠে সেখান থেকে নিজেকে নীচে নিক্ষেপ করতে বা গড়িয়ে ফেলে দিতে উদ্যত হতেন। কিন্তু যখনই তিনি কোন চূড়ার কাছাকাছি পৌছতেন তখনই জিবরীল আলাইহিস সালাম তাঁর সামনে এসে বলতেন ঃ 'আপনি তো আল্লাহর নবী' এতে তাঁর হৃদয় মন প্রশান্তিতে ভরে যেতো এবং তাঁর অশস্তি ও অস্থিরতার ভাব বিদূরিত হতো।" (ইবনে জারীর)

এরপর ইমাম যুহরী নিজে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহর রেওয়ায়াতেই এভাবে উদ্ধৃত করছেন ঃ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম فترة الوحى (অহী বন্ধ থাকার সময়)–এর কথা উল্লেখ করে বলেছেন ঃ একদিন আমি পথে চলছিলাম। হঠাৎ আসমান থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। ওপরের দিকে তাকিয়েই দেখতে পেলাম হেরা

গিরি গুহায় যে ফেরেশতা আমার কাছে এসেছিল সে ফেরেশতা আসমান ও যমীনের মাঝখানে একটি আসন পেতে বসে আছে। এ দৃশ্য দেখে আমি অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লাম এবং বাড়ীতে পৌঁছেই বললাম ঃ আমাকে চাদর দিয়ে আচ্ছাদিত করো। আমাকে চাদর দিয়ে আচ্ছাদিত করো। সুতরাং বাড়ীর লোকজন আমাকে লেপ (অথবা কম্বল) দিয়ে আচ্ছাদিত করলো। এ অবস্থায় আল্লাহ অহী নাযিল করলেনঃ .... يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ "এরপর অব্যাহতভাবে অহী নাযিল হতে থাকলো।" (বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ, ইবনে জারীর)।

প্রকাশ্যভাবে ইসলামের প্রচার শুরু হওয়ার পর প্রথমবার মক্কায় হজ্জের মওসুম সমাগত হলে সূরার অবশিষ্ট অংশ অর্থাৎ ৮ আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত নাযিল হয়। 'সীরাতে ইবনে হিশাম' গ্রন্থে এ ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা পরে তা উল্লেখ করবো।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সর্ব–প্রথম যে অহী পাঠানো হয়েছিল তা ছিল সূরা 'আলাকে'র প্রথম পাঁচটি আয়াত। এতে শুধু বলা হয়েছিল ঃ

"পড় তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'জমাট রক্ত' থেকে। পড়, তোমার রব বড় মহানুভব। যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিখিয়েছেন। তিনি মানুষকে এমন জ্ঞান শিখিয়েছেন যা সে জানতো না।"

এটা ছিল অহী নাযিল হওয়ার প্রথম অভিজ্ঞতা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহসা এ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন। কত বড় মহান কাজের জন্য তিনি আদিষ্ট হয়েছেন এবং ভবিষ্যতে আরো কি কি কাজ তাঁকে করতে হবে এ বাণীতে তাঁকে সে বিষয়ে কিছুই জানানো হয়েছিল না। বরং শুধু একটি প্রাথমিক পরিচয় দিয়েই কিছু দিনের জন্য অবকাশ দেয়া হয়েছিল যাতে অহী নাযিলের এ প্রথম অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর মন–মানসিকতার ওপর যে কঠিন চাপ পড়েছিল তার প্রভাব বিদূরিত হয়ে যায় এবং ভবিষ্যতে অহী গ্রহণ ও নবুওয়াতের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য তিনি মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে যান। এ বিরতির পর পুনরায় অহী নাযিলের ধারা শুরু হলে এ সূরার প্রথম সাতটি আয়াত নাযিল হয় এবং এর মাধ্যমে প্রথমবারের মত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ মর্মে আদেশ দেয়া হয় যে, আপনি উঠুন এবং আল্লাহর বান্দারা এখন যেভাবে চলছে তার পরিণাম সম্পর্কে তাদের সাবধান করে দিন। আর এ পৃথিবীতে এখন যেখানে অন্যদের শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্ব জেঁকে বসেছে, সেখানে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্বের ঘোষণা দিন। এর সাথে সাথে তাঁকে দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, এখন থেকে আপনাকে যে কাজ করতে হবে তার দাবী হলো আপনার নিজের জীবন যেন সব দিক থেকে পূত–পবিত্র হয় এবং আপনি সব রকমের পার্থিব স্বার্থ উপেক্ষা করে পূর্ণ নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সাথে আল্লাহর সৃষ্টির সংস্কার–সংশোধনের দায়িত্ব পালন করেন। অতপর শেষ বাক্যটিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, এ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যে

কোন কঠিন পরিস্থিতি এবং বিপদ মুসিবতই আসুক না কেন আপনি আপনার প্রভুর উদ্দেশ্যে ধৈর্য অবলম্বন করুন।

আল্লাহর এ ফরমান কার্যকরী করার জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইসলামের প্রচার শুরু করলেন এবং একের পর এক কুরআন মজীদের যেসব সূরা নাযিল হচ্ছিলো তা শুনাতে থাকলেন তখন মক্কায় রীতিমত হৈ চৈ পড়ে গেল এবং বিরোধিতার এক তুফান শুরু হলো। এ অবস্থায় কয়েক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর হজ্জের মওসূম এসে পড়লে মক্কার লোকেরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো। তারা ভাবলো, এ সময় সমগ্র আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজীদের কাফেলা আসবে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি এসব কাফেলার অবস্থান স্থলে হাজির হয়ে হাজীদের সাথে সাক্ষাত করেন এবং বিভিন্ন স্থানে হজ্জের জনসমাবেশসমূহে দাঁড়িয়ে কুরআনের মত অতুলনীয় ও মর্মস্পর্শী বাণী শুনাতে থাকেন তাহলে সমগ্র আরবের আনাচে কানাচে তাঁর আহবান পৌঁছে যাবে এবং না জানি কত লোক তাতে প্রভাবিত হয়ে পড়বে। তাই কুরাইশ নেতারা একটি সম্মেলনের ব্যবস্থা করলো। এতে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যে, মক্কায় হাজীদের আগমনের সাথে সাথে তাদের মধ্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে প্রচার প্রোপাগাণ্ডা শুরু করতে হবে। এ বিষয়ে ঐকমত্য হওয়ার পর ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা সমবেত সবাইকে উদ্দেশ করে বললো ঃ আপনারা যদি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে লোকদের কাছে বিভিন্ন রকমের কথা বলেন, তাহলে আমাদের সবার বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়ে যাবে। তাই কোন একটি বিষয় স্থির করে নিন যা সবাই বলবে। কেউ কেউ প্রস্তাব করলো, আমরা মুহাম্মাদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গণক বলবো। ওয়ালীদ বললো ঃ তা হয় না। আল্লাহর শপথ, সে গণক নয়। আমরা গণকদের অবস্থা জানি। তারা গুণ গুণ শব্দ করে যেসব কথা বলে এবং যে ধরনের কথা বানিয়ে নেয় তার সাথে কুরআনের সামান্যতম সাদৃশ্যও নেই। তখন কিছু সংখ্যক লোক প্রস্তাব করলো যে, তাকে পাগল বলা হোক। ওয়ালীদ বললো ঃ সে পাগলও নয়। আমরা পাগল ও বিকৃত মস্তিষ্ক লোক সম্পর্কেও জানি। পাগল বা বিকৃত মস্তিষ্ক হলে মানুষ যে ধরনের অসংলগ্ন ও আবোল তাবোল কথা বলে এবং খাপছাড়া আচরণ করে তা কারো অজানা নয়। কে একথা বিশ্বাস করবে যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে বাণী পেশ করছে তা পাগলের প্রলাপ অথবা জিনে ধরা মানুষের উক্তি? লোকজন বললোঃ তাহলে আমরা তাকে কবি বলি। ওয়ালীদ বললো ঃ সে কবিও নয়। আমরা সব রকমের কবিতা সম্পর্কে অবহিত। কোন ধরনের কবিতার সাথে এ বাণীর সাদৃশ্য নেই। লোকজন আবার প্রস্তাব করলো ঃ তাহলে তাকে যাদুকর বলা হোক। ওয়ালীদ বললো ঃ সে যাদুকরও নয়। যাদুকরদের সম্পর্কেও আমরা জানি। যাদু প্রদর্শনের জন্য তারা যেসব পন্থা অবলম্বন করে থাকে সে সম্পর্কেও আমাদের জানা আছে। একথাটিও মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যাপারে খাটে না। এরপর ওয়ালীদ বললো ঃ প্রস্তাবিত এসব কথার যেটিই তোমরা বলবে সেটিকেই লোকেরা অযথা অভিযোগ মনে করবে। আল্লাহর শপথ, এ বাণীতে আছে অসম্ভব রকমের মাধুর্য। এর শিকড় মাটির গভীরে প্রোথিত আর এর শাখা-প্রশাখা অত্যন্ত ফলবান। একথা শুনে আবু জেহেল ওয়ালীদকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। সে বললো ঃ যতক্ষণ না তুমি মুহাম্মাদ সম্পর্কে কোন কথা বলছো ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার কওমের লোকজন তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না। সে বললো

ঃ তাহলে আমাকে কিছুক্ষণ ভেবে দেখতে দাও। এরপর সে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে বললো ঃ তার সম্পর্কে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য যে কথাটি বলা যেতে পারে তা হলো, তোমরা আরবের জনগণকে বলবে যে, এ লোকটি যাদুকর। সে এমন কথা বলে যা মানুষকে তার পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র এবং গোটা পরিবার থেকেই বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ওয়ালীদের একথা সবাই গ্রহণ করলো। অতপর হজ্জের মওসুমে পরিকল্পনা অনুসারে কুরাইশদের বিভিন্ন প্রতিনিধি দল হাজীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো এবং বহিরাগত হজ্জযাত্রীদের তারা এ বলে সাবধান করতে থাকলো যে, এখানে একজন বড় যাদুকরের আবির্ভাব ঘটেছে। তার যাদু পরিবারের লোকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দেয়। তার ব্যাপারে সাবধান থাকবেন। কিন্তু এর ফল দাঁড়ালো এই যে, কুরাইশ বংশীয় লোকেরা নিজেরাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম সমগ্র আরবে পরিচিত করে দিল। (সীরাতে ইবনে হিশাম, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮৮-২৮৯। আবু জেহেলের পীড়াপীড়িতেই যে ওয়ালীদ এ উক্তি করেছিল, সে কথা ইবনে জারীর তার তাফসীরে ইকরিমার রেওয়ায়াত সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন)।

এ সূরার দ্বিতীয় অংশে এ ঘটনারই পর্যালোচনা করা হয়েছে। এর বিষয়বস্তুর বিন্যাস হয়েছে এভাবে ঃ

৮ থেকে ১০ আয়াত পর্যন্ত ন্যায় ও সত্যকে অস্বীকারকারীদের এ বলে সাবধান করা হয়েছে যে, আজ তারা যা করছে কিয়ামতের দিন তারা নিজেরাই তার খারাপ পরিণতির সম্মুখীন হবে।

১১ থেকে ২৬ আয়াত পর্যন্ত ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার নাম উল্লেখ না করে বলা হয়েছেঃ মহান আল্লাহ এ ব্যক্তিকে অঢেল নিয়ামত দান করেছিলেন। কিন্তু এর বিনিময়ে সে ন্যায় ও সত্যের সাথে চরম দুশমনী করেছে। এ পর্যায়ে তার মানসিক দ্বন্দ্বের পূর্ণাঙ্গ চিত্র অংকন করা হয়েছে। একদিকে সে মনে মনে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরআনের সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু অপরদিকে নিজ গোত্রের মধ্যে সে তার নেতৃত্ব, মর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তিও বিপন্ন করতে প্রস্তুত ছিল না। তাই সে শুধু ঈমান গ্রহণ থেকেই বিরত রইলো না। বরং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত নিজের বিবেকের সাথে বুঝা-পড়া ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পর আল্লাহর বান্দাদের এ বাণীর ওপর ঈমান আনা থেকে বিরত রাখার জন্য প্রস্তাব করলো যে, এ কুরআনকে যাদু বলে আখ্যায়িত করতে হবে। তার এ স্পষ্ট ঘৃণ্য মানসিকতার মুখোশ খুলে দেয়ার জন্য বলা হয়েছে যে, নিজের এতো সব অপকর্ম সত্ত্বেও এ ব্যক্তি চায় তাকে আরো পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হোক। অথচ এখন সে পুরস্কারের যোগ্য নয় বরং দোযখের শাস্তির যোগ্য হয়ে গিয়েছে।

এরপর ২৭ থেকে ৪৮ আয়াত পর্যন্ত দোযখের ভয়াবহতার উল্লেখ করা হয়েছে এবং কোন্ ধরনের নৈতিক চরিত্র ও কর্মকাণ্ডের অধিকারী লোকেরা এর উপযুক্ত বলে গণ্য হবে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

অতপর ৪৯-৫৩ আয়াতে কাফেরদের রোগের মূল ও উৎস কি তা বলে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, যেহেতু তারা আখেরাত সম্পর্কে বেপরোয়া ও নির্ভীক এবং এ পৃথিবীকেই

জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ বলে মনে করে, তাই তারা কুরআন থেকে এমনভাবে পালায়, যেমন বন্য গাধা বাঘ দেখে পালায়। তারা ঈমান আনার জন্য নানা প্রকারের অযৌক্তিক পূর্বশর্ত আরোপ করে। অথচ তাদের সব শর্ত পূরণ করা হলেও আখেরাতকে অস্বীকার করার কারণে তারা ঈমানের পথে এক পাও অগ্রসর হতে সক্ষম নয়।

পরিশেষে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে, আল্লাহর কারো ঈমানের প্রয়োজন নেই যে, তিনি তাদের শর্ত পূরণ করতে থাকবেন। কুরআন সবার জন্য এক উপদেশবাণী যা সবার সামনে পেশ করা হয়েছে। কারো ইচ্ছা হলে সে এ বাণী গ্রহণ করবে। আল্লাহই একমাত্র এমন সত্তা, যার নাফরমানী করতে মানুষের ভয় পাওয়া উচিত। তাঁর মাহাত্ম্য ও মর্যাদা এমন যে, যে ব্যক্তিই তাকওয়া ও আল্লাহভীতির পথ অনুসরণ করে তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন। পূর্বে সে যতই নাফরমানী করে থাকুক না কেন।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ① قُمْ فَأَنذِرْ ② وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ③ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ④ وَٱلرُّجْزَ فَٱهْجُرْ ⑤ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ⑥ وَلِرَبِّكَ فَٱصْبِرْ ⑦

হে বস্ত্র মুড়ি দিয়ে শয়নকারী,[১] ওঠো এবং সাবধান করে দাও,[২] তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো,[৩] তোমার পোশাক পবিত্র রাখো,[৪] অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকো,[৫] বেশী লাভ করার জন্য ইহসান করো না[৬] এবং তোমার রবের জন্য ধৈর্য অবলম্বন করো।[৭]

১. ওপরে ভূমিকায় আমরা এসব আয়াত নাযিলের যে পটভূমি বর্ণনা করেছি সে সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করলে একথাটি ভালভাবেই উপলব্ধি করা যায় যে, এখানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ বা يَاَيُّهَا النَّبِىُّ বলে সম্বোধন করার পরিবর্তে يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ বলে সম্বোধন কেন করা হয়েছে। নবী (সা) যেহেতু হঠাৎ জিবরাঈলকে আসমান ও পৃথিবীর মাঝখানে একটি আসনে উপবিষ্ট দেখে ভীত হয়ে পড়েছিলেন এবং সে অবস্থায় বাড়ীতে পৌছে বাড়ীর লোকদের বলেছিলেন ঃ আমাকে চাদর দিয়ে আচ্ছাদিত করো, আমাকে চাদর দিয়ে আচ্ছাদিত করো। তাই আল্লাহ তাঁকে يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ বলে সম্বোধন করেছেন। সম্বোধনের এ সূক্ষ্ম ভংগী থেকে আপনা আপনি এ অর্থ পরিস্ফূটিত হয়ে ওঠে যে, হে আমার প্রিয় বান্দা, তুমি চাদর জড়িয়ে শুয়ে আছো কেন? তোমার ওপরে তো একটি মহত কাজের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। এ দায়িত্ব পালন করার জন্য তোমাকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে উঠে দাঁড়াতে হবে।

২. হযরত নূহ আলাইহিস সালামকে নবুওয়াতের পদমর্যাদায় অভিষিক্ত করার সময় যে আদেশ দেয়া হয়েছিল এটাও সে ধরনের আদেশ। হযরত নূহ আলাইহিস সালামকে বলা হয়েছিল ঃ

اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ –

"তোমার নিজের কওমের লোকদের ওপর এক ভীষণ কষ্টদায়ক আযাব আসার পূর্বেই তাদের সাবধান করে দাও।" (নূহ, ১)

আয়াতটির অর্থ হলো, হে বস্ত্র আচ্ছাদিত হয়ে শয়নকারী, তুমি ওঠো। তোমার চারপাশে আল্লাহর যেসব বান্দারা অবচেতন পড়ে আছে তাদের জাগিয়ে তোল। যদি এ

অবস্থায়ই তারা থাকে তাহলে যে অবশ্যম্ভাবী পরিণতির সম্মুখীন তারা হতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে তাদের সাবধান করে দাও। তাদের জানিয়ে দাও, তারা 'মগের মুল্লুকে' বাস করছে না যে, যা ইচ্ছা তাই করে যাবে, অথচ কোন কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে না।

৩. এ পৃথিবীতে এটা একজন নবীর সর্বপ্রথম কাজ। এখানে এ কাজটিই তাঁকে আঞ্জাম দিতে হয়। তাঁর প্রথম কাজই হলো, অজ্ঞ ও মূর্খ লোকেরা এ পৃথিবীতে যাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতাপ মেনে চলছে তাদের সবাইকে অস্বীকার করবে এবং গোটা পৃথিবীর সামনে উচ্চ কণ্ঠে একথা ঘোষণা করবে যে, এ বিশ্ব-জাহানে এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো কোন শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতাপ নেই। আর এ কারণেই ইসলামে "আল্লাহু আকবার" (আল্লাহই শ্রেষ্ঠ) কথাটিকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। "আল্লাহু আকবার" ঘোষণার মাধ্যমেই আযান শুরু হয়। আল্লাহু আকবার কথাটি বলে মানুষ নামায শুরু করে এবং বার বার আল্লাহু আকবার বলে ওঠে ও বসে। কোন পশুকে জবাই করার সময়ও 'বিসমিল্লাহে আল্লাহু আকবার' বলে জবাই করে। তাকবীর ধ্বনি বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের সর্বাধিক স্পষ্ট ও পার্থক্যসূচক প্রতীক। কারণ, ইসলামের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণার মাধ্যমেই কাজ শুরু করেছিলেন।

এখানে আরো একটি সূক্ষ্ম বিষয় আছে যা ভালভাবে বুঝে নেয়া দরকার। এ সময়ই প্রথমবারের মত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে নবুওয়াতের বিরাট গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য তৎপর হতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এ আয়াতগুলোর 'শানে নুযুল' থেকেই সে বিষয়টি জানা গিয়েছে। একথা তো স্পষ্ট যে, যে শহর ও সমাজপরিবেশে তাঁকে এ উদ্দেশ্য ও লক্ষ নিয়ে কাজ করার জন্য তৎপর হওয়ার নির্দেশ দেয়া হচ্ছিল তা ছিল শিরকের কেন্দ্রভূমি বা লীলাক্ষেত্র। সাধারণ আরবদের মত সেখানকার অধিবাসীরা যে কেবল মুশরিক ছিল, তা নয়। বরং মক্কা সে সময় গোটা আরবের মুশরিকদের সবচেয়ে বড় তীর্থক্ষেত্রের মর্যাদা লাভ করেছিল। আর কুরাইশরা ছিল তার ঘনিষ্ঠতম প্রতিবেশী, সেবায়ত ও পুরোহিত। এমন একটি জায়গায় কোন ব্যক্তির পক্ষে শিরকের বিরুদ্ধে এককভাবে তাওহীদের পতাকা উত্তোলন করা জীবনের ঝুঁকি গ্রহণ করার শামিল। তাই "ওঠো এবং সাবধান করে দাও" বলার পরপরই "তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো" বলার অর্থই হলো, যেসব বড় বড় সন্ত্রাসী শক্তি তোমার এ কাজের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে মনে হয় তাদের মোটেই পরোয়া করো না। বরং স্পষ্ট ভাষায় বলে দাও, যারা আমার এ আহবান ও আন্দোলনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে আমার 'রব' তাদের সবার চেয়ে অনেক বড়। আল্লাহর দীনের কাজ করতে উদ্যত কোন ব্যক্তির হিম্মত বৃদ্ধি ও সাহস যোগানোর জন্য এর চাইতে বড় পন্থা বা উপায় আর কি হতে পারে? আল্লাহর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের নকশা যে ব্যক্তির হৃদয়-মনে খোদিত সে আল্লাহর জন্য একাই গোটা দুনিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করতে সামান্যতম দ্বিধা-দ্বন্দ্বও অনুভব করবে না।

৪. এটি একটি ব্যাপক অর্থ ব্যঞ্জক কথা। এর অর্থ অত্যন্ত বিস্তৃত।

এর একটি অর্থ হলো, তুমি তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ নাপাক বস্তু থেকে পবিত্র রাখো। কারণ শরীর ও পোশাক-পরিচ্ছদের পবিত্রতা এবং 'রূহ' বা আত্মার পবিত্রতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কোন পবিত্র আত্মা ময়লা-নোংরা ও পূতিগন্ধময় দেহ এবং অপবিত্র পোশাকের মধ্যে মোটেই অবস্থান করতে পারে না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সমাজে ইসলামের দাওয়াতের কাজ শুরু করেছিলেন তা শুধু আকীদা-বিশ্বাস ও নৈতিক আবিলতার মধ্যেই নিমজ্জিত ছিল না বরং পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রাথমিক ধারণা সম্পর্কে পর্যন্ত সে সমাজের লোক অজ্ঞ ছিল। এসব লোককে সব রকমের পবিত্রতা শিক্ষা দেয়া ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাজ। তাই তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তিনি যেন তাঁর বাহ্যিক জীবনেও পবিত্রতার সর্বোচ্চ মান বজায় রাখেন। এ নির্দেশের ফল স্বরূপ নবী (সা) মানব জাতিকে শরীর ও পোশাক-পরিচ্ছদের পবিত্রতা সম্পর্কে এমন বিস্তারিত শিক্ষা দিয়েছেন যে, জাহেলী যুগের আরবরা তো দূরের কথা আধুনিক যুগের চরম সভ্য জাতিসমূহও সে সৌভাগ্যের অধিকারী নয়। এমনকি দুনিয়ার অধিকাংশ ভাষাতে এমন কোন শব্দ পর্যন্ত পাওয়া যায় না যা 'তাহারাত' বা পবিত্রতার সমার্থক হতে পারে। পক্ষান্তরে ইসলামের অবস্থা হলো, হাদীস এবং ফিকাহর গ্রন্থসমূহে ইসলামী হুকুম-আহকাম তথা বিধি-বিধান সম্পর্কে সব আলোচনা শুরু হয়েছে "কিতাবুত তাহারাত' বা পবিত্রতা নামে অধ্যায় দিয়ে। এতে পবিত্রতা ও অপবিত্রতার পার্থক্য এবং পবিত্রতা অর্জনের উপায় ও পন্থাসমূহ একান্ত খুঁটিনাটি বিষয়সহ সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

একথাটির দ্বিতীয় অর্থ হলো, নিজের পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখো। বৈরাগ্যবাদী ধ্যান-ধারণা পৃথিবীতে ধর্মাচরণের যে মানদণ্ড বানিয়ে রেখেছিল তাহলো, যে মানুষ যতো বেশী নোংরা ও অপরিচ্ছন্ন হবে সে ততো বেশী পূত-পবিত্র। কেউ কিছুটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরলেই মনে করা হতো, সে একজন দুনিয়াদার মানুষ। অথচ মানুষের প্রবৃত্তি নোংরা ও ময়লা জিনিসকে অপছন্দ করে। তাই ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহর পথে আহবানকারীর বাহ্যিক অবস্থাও এতটা পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া প্রয়োজন যেন মানুষ তাকে সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখে এবং তার ব্যক্তিত্বে এমন কোন দোষ-ত্রুটি যেন না থাকে যার কারণে রুচি ও প্রবৃত্তিতে তার প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি হয়।

একথাটির তৃতীয় অর্থ হলো, নিজের পোশাক পরিচ্ছদ নৈতিক দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র রাখো। তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন তো অবশ্যই থাকবে তবে তাতেও কোন প্রকার গর্ব-অহংকার, প্রদর্শনী বা লোক দেখানোর মনোবৃত্তি, ঠাটবাট এবং জৌলুসের নামগন্ধ পর্যন্ত থাকা উচিত নয়। পোশাক এমন একটি প্রাথমিক জিনিস যা অন্যদের কাছে একজন মানুষের পরিচয় তুলে ধরে। কোন ব্যক্তি যে ধরনের পোশাক পরিধান করে তা দেখে প্রথম দৃষ্টিতেই মানুষ বুঝতে পারে যে, সে কেমন স্বভাব চরিত্রের লোক। নওয়াব, বাদশাহ ও নেতৃ পর্যায়ের লোকদের পোশাক, ধর্মীয় পেশার লোকদের পোশাক, দাম্ভিক ও আত্মম্ভরী লোকদের পোশাক, বাজে ও নীচ স্বভাব লোকদের পোশাক এবং গুণ্ডা-পাণ্ডা ও বখাটে লোকদের পোশাকের ধরন সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে থাকে। এসব পোশাকই পোশাক পরিধানকারীর মেজাজ ও মানসিকতার প্রতিনিধিত্ব করে।

আল্লাহর দিকে আহবানকারীর মেজাজ ও মানসিকতা স্বাভাবিকভাবেই এসব লোকদের থেকে আলাদা হয়ে থাকে। তাই তার পোশাক–পরিচ্ছদ তাদের পোশাক–পরিচ্ছদ থেকে স্বতন্ত্র ধরনের হওয়া উচিত। তাঁর উচিত এমন পোশাক–পরিচ্ছদ পরিধান করা যা দেখে প্রত্যেকেই অনুভব করবে যে, তিনি একজন শরীফ ও ভদ্র মানুষ, যাঁর মন–মানস কোন প্রকার দোষে দুষ্ট নয়।

এর চতুর্থ অর্থ হলো। নিজেকে পবিত্র রাখো। অন্য কথায় এর অর্থ হলো নৈতিক দোষ–ত্রুটি থেকে পবিত্র থাকা এবং উত্তম নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হওয়া। ইবনে আব্বাস, ইবরাহীম নাখয়ী, শা'বী, 'আতা, মুজাহিদ, কাতাদা, সা'ঈদ ইবনে জুবায়ের, হাসান বাসরী এবং আরো অনেক বড় বড় মুফাস্‌সিরের মতে এটিই এ আয়াতের অর্থ। অর্থাৎ নিজের নৈতিক চরিত্রকে পবিত্র রাখো এবং সব রকমের দোষ–ত্রুটি থেকে দূরে থাকো। প্রচলিত আরবী প্রবাদ অনুসারে যদি বলা হয় যে, فلان طاهر الثياب وفلان طاهر الذيل 'অমুক ব্যক্তির কাপড় বা পোশাক পবিত্র অথবা অমুক ব্যক্তি পবিত্র।" তাহলে এর দ্বারা বুঝানো হয় যে, সে ব্যক্তির নৈতিক চরিত্র খুবই ভাল। পক্ষান্তরে যদি বলা হয় فلانٌ دنس الثياب অমুক ব্যক্তির পোশাক নোংরা তাহলে এ দ্বারা বুঝানো হয় যে, লোকটি লেনদেন ও আচার–আচরণের দিক দিয়ে ভাল নয়। তার কথা ও প্রতিশ্রুতির ওপর আস্থা রাখা যায় না।

৫. অপবিত্রতার অর্থ সব ধরনের অপবিত্রতা। তা আকীদা–বিশ্বাস ও ধ্যান–ধারণার অপবিত্রতা হতে পারে, নৈতিক চরিত্র ও কাজ–কর্মের অপবিত্রতা হতে পারে আবার শরীর ও পোশাক–পরিচ্ছদ এবং উঠা বসা চলাফেরার অপবিত্রতাও হতে পারে। অর্থাৎ তোমার চারদিকে গোটা সমাজে হরেক রকমের যে অপবিত্রতা ও নোংরামি ছড়িয়ে আছে তার সবগুলো থেকে নিজেকে মুক্ত রাখো। কেউ যেন তোমাকে একথা বলার সামান্য সুযোগও না পায় যে, তুমি মানুষকে যেসব মন্দ কাজ থেকে নিবৃত্ত করছো তোমার নিজের জীবনেই সে মন্দের প্রতিফলন আছে।

৬. মূল বাক্যাংশ হলো وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ একথাটির অর্থ এতো ব্যাপক যে, একটি মাত্র কথায় অনুবাদ করে এর বক্তব্য তুলে ধরা সম্ভব নয়।

এর একটি অর্থ হলো, তুমি যার প্রতিই ইহ্‌সান বা অনুগ্রহ করবে, নিস্বার্থভাবে করবে। তোমার অনুগ্রহ ও বদান্যতা এবং দানশীলতা ও উত্তম আচরণ হবে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে। ইহ্‌সান বা মহানুভবতার বিনিময়ে কোন প্রকার পার্থিব স্বার্থ লাভের বিন্দুমাত্র আকাংখাও তোমার থাকবে না। অন্য কথায় একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইহ্‌সান করো, কোন প্রকার স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ইহ্‌সান করো না।

দ্বিতীয় অর্থ হলো, নবুওয়াতের যে দায়িত্ব তুমি পালন করছো। যদিও তা একটি বড় রকমের ইহ্‌সান, কারণ তোমার মাধ্যমেই আল্লাহর গোটা সৃষ্টি হিদায়াত লাভ করছে। তবুও এ কাজ করে তুমি মানুষের বিরাট উপকার করছো এমন কথা বলবে না এবং এর বিনিময়ে কোন প্রকার ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধার করবে না।

তৃতীয় অর্থ হলো, তুমি যদিও অনেক বড় ও মহান একটি কাজ করে চলেছো কিন্তু নিজের দৃষ্টিতে নিজের কাজকে বড় কাজ বলে কখনো মনে করবে না এবং কোন সময় এ

فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ﴿٨﴾ فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴿٩﴾ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴿١٠﴾
ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿١١﴾ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ﴿١٢﴾ وَبَنِينَ
شُهُودًا ﴿١٣﴾ وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ﴿١٤﴾ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴿١٥﴾ كَلَّا ۖ إِنَّهُ كَانَ
لِآيَاتِنَا عَنِيدًا ﴿١٦﴾ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا ﴿١٧﴾ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿١٨﴾ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿١٩﴾ ثُمَّ
قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢١﴾ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ
إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ﴿٢٤﴾

তবে যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, সেদিনটি অত্যন্ত কঠিন দিন হবে।[৮] কাফেরদের জন্য মোটেই সহজ হবে না।[৯] আমাকে এবং সে ব্যক্তিকে[১০] ছেড়ে দাও যাকে আমি একা সৃষ্টি করেছি।[১১] তাকে অঢেল সম্পদ দিয়েছি এবং আরো দিয়েছি সবসময় কাছে থাকার মত অনেক পুত্র সন্তান।[১২] তার নেতৃত্বের পথ সহজ করে দিয়েছি। এরপরও সে লালায়িত, আমি যেন তাকে আরো বেশী দান করি।[১৩] তা কখনো নয়, সে আমার আয়াতসমূহের সাথে শত্রুতা পোষণ করে। অচিরেই আমি তাকে এক কঠিন স্থানে চড়িয়ে দেব। সে চিন্তা–ভাবনা করলো এবং একটা ফন্দি উদ্ভাবনের চেষ্টা করলো। অভিশপ্ত হোক সে, সে কি ধরনের ফন্দি উদ্ভাবনের চেষ্টা করলো? আবার অভিশপ্ত হোক সে, সে কি ধরনের ফন্দি উদ্ভাবনের চেষ্টা করলো? অতপর সে মানুষের দিকে চেয়ে দেখলো। তারপর ভ্রুকুঞ্চিত করলো এবং চেহারা বিকৃত করলো। অতপর পেছন ফিরলো এবং দম্ভ প্রকাশ করলো। অবশেষে বললো ঃ এ তো এক চিরাচরিত যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।

চিন্তাও যেন তোমার মনে উদিত না হয় যে, নবুওয়াতের এ দায়িত্ব পালন করে আর এ কাজে প্রাণপণ চেষ্টা–সাধনা করে তুমি তোমার রবের প্রতি কোন অনুগ্রহ করছো।

৭. অর্থাৎ যে কাজ আঞ্জাম দেয়ার দায়িত্ব তোমাকে দেয়া হচ্ছে তা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও জীবনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। এ কাজ করতে গিয়ে তোমাকে কঠিন বিপদাপদ ও দুঃখ–কষ্টের মুখোমুখি হতে হবে। তোমার নিজের কওম তোমার শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। সমগ্র আরব তোমার বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে লাগবে। তবে এ পথে চলতে গিয়ে যে কোন বিপদ–মুসিবতই আসুক না কেন তোমার প্রভুর উদ্দেশ্যে সেসব বিপদের মুখে ধৈর্য অবলম্বন করো এবং অত্যন্ত অটল ও দৃঢ়চিত্ত হয়ে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে থাকো। এ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য ভয়–ভীতি, লোভ–লালসা, বন্ধুত্ব, শত্রুতা এবং

ভালবাসা সব কিছুই তোমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। এসবের মোকাবেলা করতে গিয়ে নিজের অবস্থানে স্থির ও অটল থাকবে।

এগুলো ছিল একেবারে প্রাথমিক দিকনির্দেশনা। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূলকে যে সময় নবুওয়াতের কাজ শুরু করতে আদেশ দিয়েছিলেন সে সময় এ দিকনির্দেশনাগুলো তাঁকে দিয়েছিলেন। কেউ যদি এসব ছোট ছোট বাক্য এবং তার অর্থ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে তাহলে স্বতস্ফূর্তভাবে তার মন বলে উঠবে যে, একজন নবীর নবুওয়াতের কাজ শুরু করার প্রাক্কালে তাঁকে এর চাইতে উত্তম আর কোন দিকনির্দেশনা দেয়া যেতে পারে না। এ নির্দেশনায় তাঁকে কি কাজ করতে হবে একদিকে যেমন তা বলে দেয়া হয়েছে তেমনি এ কাজ করতে গেলে তাঁর জীবন, নৈতিক চরিত্র এবং আচার-আচরণ কেমন হবে তাও তাঁকে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। এর সাথে সাথে তাঁকে এ শিক্ষাও দেয়া হয়েছে যে, তাঁকে কি নিয়ত, কি ধরনের মানসিকতা এবং কিরূপ চিন্তাধারা নিয়ে এ কাজ আঞ্জাম দিতে হবে। আর এতে এ বিষয়েও তাঁকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, এ কাজ করার ক্ষেত্রে কিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে এবং তার মোকাবিলা কিভাবে করতে হবে। বর্তমানেও যারা বিদ্বেষের কারণে স্বার্থের মোহে অন্ধ হয়ে বলে যে, (নাউযুবিল্লাহ) মৃগী রোগে আক্রান্ত হওয়ার মুহূর্তে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে এসব কথা উচ্চারিত হতো, তারা একটু চোখ খুলে এ বাক্যগুলো দেখুক এবং নিজেরাই চিন্তা করুক যে, এগুলো কোন মৃগী রোগে আক্রান্ত মানুষের মুখ থেকে উচ্চারিত কথা না কি মহান আল্লাহর বাণী যা রিসালাতের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য তিনি তাঁর বান্দাকে দিচ্ছেন?

৮. আমরা ভূমিকাতেই উল্লেখ করেছি যে, এ সূরার এ অংশটা প্রথম দিকে নাযিলকৃত আয়াতসমূহের কয়েক মাস পরে এমন সময় নাযিল হয়েছিল যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে ইসলামের তাবলীগ ও প্রচারের কাজ শুরু হওয়ার পর প্রথম বারের মত হজ্জের মওসুম সমাগত হলো এবং কুরাইশ নেতৃবৃন্দ একটি সম্মেলন ডেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে, বহিরাগত হাজীদের মনে কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে খারাপ ধারণা সৃষ্টির জন্য অপপ্রচার ও কুৎসা রটনার এক সর্বাত্মক অভিযান চালাতে হবে। এ আয়াতগুলোতে কাফেরদের এ কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনা করা হয়েছে। আর একথাটি দ্বারাই পর্যালোচনা শুরু করা হয়েছে। এর অর্থ হলো, ঠিক আছে, যে ধরনের আচরণ তোমরা করতে চাচ্ছ তা করে নাও। এভাবে পৃথিবীতে তোমরা কোন উদ্দেশ্য সাধনে সফল হলেও যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং কিয়ামত কায়েম হবে সেদিন তোমরা নিজেদের কৃতকর্মের মন্দ পরিণাম থেকে কিভাবে রক্ষা পাবে? (শিংগা সম্পর্কে ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আন'আম, টীকা ৪৭; ইবরাহীম, টীকা ৫৭; ত্বা-হা, টীকা ৭৮; আল হাজ্জ, টীকা ১, ইয়াসীন, টীকা ৪৬ ও ৪৭, আয্ যুমার, টীকা ৭৯ এবং ক্বাফ, টীক ৫২)

৯. এ বাক্যটি থেকে স্বতঃই প্রতিভাত হয় যে, সেদিনটি ঈমানদারদের জন্য হবে খুবই সহজ এবং এর সবটুকু কঠোরতা সত্যকে অমান্যকারীদের জন্য নির্দিষ্ট হবে। এ ছাড়া বাক্যটি থেকে এ অর্থও প্রতিফলিত হয় যে, সেদিনটির কঠোরতা কাফেরদের জন্য স্থায়ী

إِنْ هَٰذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ ﴿٢٥﴾ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ﴿٢٦﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سَقَرُ ﴿٢٧﴾ لَا تُبْقِى وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ﴿٢٩﴾ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٣٠﴾ وَمَا جَعَلْنَآ أَصْحَٰبَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلَٰٓئِكَةً ۙ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۙ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِيمَٰنًا ۙ وَلَا يَرْتَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۙ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْكَٰفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ وَمَا هِىَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ ﴿٣١﴾

এ তো মানুষের কথা মাত্র।[১৪] শিগগিরই আমি তাকে দোযখে নিক্ষেপ করবো। তুমি কি জানো, সে দোযখ কি? যা জীবিতও রাখবে না আবার একেবারে মৃত করেও ছাড়বে না।[১৫] গায়ের চামড়া ঝলসিয়ে দেবে।[১৬] সেখানে নিয়োজিত আছে উনিশ জন কর্মচারী। আমি[১৭] ফেরেশতাদের দোযখের কর্মচারী বানিয়েছি[১৮] এবং তাদের সংখ্যাকে কাফেরদের জন্য ফিতনা বানিয়ে দিয়েছি।[১৯] যাতে আহলে কিতাবদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে।[২০] ঈমানদারদের ঈমান বৃদ্ধি পায়,[২১] আহলে কিতাব ও ঈমানদাররা সন্দেহ পোষণ না করে[২২] আর যাদের মনে রোগ আছে তারা এবং কাফেররা যেন বলে, এ অভিনব কথা দ্বারা আল্লাহ কি বুঝাতে চেয়েছে?[২৩] এভাবে আল্লাহ যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে চান হিদায়াত দান করেন।[২৪] তোমার রবের বাহিনী সম্পর্কে তিনি ছাড়া আর কেউ অবহিত নয়।[২৫] আর দোযখের এ বর্ণনা এ ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যেই নয় যে, মানুষ তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে।[২৬]

হয়ে যাবে। তা এমন ধরনের কঠোরতা হবে না যা পরে কোন সময়ে হালকা বা লঘু হয়ে যাওয়ার আশা করা যাবে।

১০. এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে ঃ হে নবী, কাফেরদের সে সম্মেলনে যে ব্যক্তি (ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা) তোমাকে বদনাম করার উদ্দেশ্যে পরামর্শ দিয়েছিল যে, সমগ্র আরব থেকে আগত হাজীদের কাছে তোমাকে যাদুকর বলে প্রচার করতে হবে তার ব্যাপারটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও। এখন

আমার কাজ হলো, তার সাথে বুঝাপড়া করা। তোমার নিজের এ বিষয়ে চিন্তা–ভাবনা করার কোন প্রয়োজন নেই।

১১. একথাটির দু'টি অর্থ হতে পারে এবং দু'টি অর্থই সঠিক। এক, আমি যখন তাকে সৃষ্টি করেছিলাম সে সময় সে কোন প্রকার ধন–সম্পদ, সন্তান–সন্ততি এবং মর্যাদা ও নেতৃত্বের অধিকারী ছিল না। দুই, একমাত্র আমিই তার সৃষ্টিকর্তা। অন্য যেসব উপাস্যের খোদায়ী ও প্রভুত্ব কায়েম রাখার জন্য সে তোমার দেয়া তাওহীদের দাওয়াতের বিরোধিতায় এত তৎপর, তাদের কেউই তাকে সৃষ্টি করার ব্যাপারে আমার সাথে শরীক ছিল না।

১২. ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার দশ বারটি পুত্র সন্তান ছিল। তাদের মধ্যে হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ ইতিহাসে অনেক বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এসব পুত্র সন্তানদের জন্য شُهُود শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক, রুযী রোজগারের জন্য তাদের দৌড় ঝাপ করতে বা সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকতে কিংবা বিদেশ যাত্রা করতে হয় না। তাদের বাড়ীতে এত খাদ্য মজুদ আছে যে, তারা সর্বক্ষণ বাপের কাছে উপস্থিত থাকে এবং তাকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকে। দুই, তার সবগুলো সন্তানই নামকরা এবং প্রভাবশালী, তারা বাপের সাথে দরবার ও সভা–সমিতিতে উপস্থিত থাকে। তিন, তারা সবাই এমন সামাজিক পদমর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের সাক্ষ বা মতামত গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

১৩. একথার একটি অর্থ হলো, এসব সত্ত্বেও তার লালসা ও আকাংখার শেষ নেই। এত কিছু লাভ করার পরও সে সর্বক্ষণ এ চিন্তায় বিভোর যে, দুনিয়ার সব নিয়ামত ও ভোগের উপকরণ সে কিভাবে লাভ করতে পারবে। দুই, হযরত হাসান বাসরী ও আরো কয়েকজন মনীষী বর্ণনা করেছেন যে, সে বলতো ঃ মুহাম্মাদের (সা) একথা যদি সত্য হয়ে থাকে যে, মৃত্যুর পর আরো একটি জীবন আছে এবং সেখানে জান্নাত বলেও কিছু একটা থাকবে তাহলে সে জান্নাত আমার জন্যই তৈরী করা হয়েছে।

১৪. মক্কায় কাফেরদের যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, এখানে সে সম্মেলনে সংঘটিত ঘটনার কথা বলা হচ্ছে। সূরার ভূমিকায় ঘটনাটির যে বিস্তারিত বিবরণ আমরা উল্লেখ করেছি তা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, এ ব্যক্তি মনে প্রাণে যে বিশ্বাস করে নিয়েছিল যে, কুরআন আল্লাহর বাণী। কিন্তু নিজের গোত্রের মধ্যে তার মর্যাদা, প্রভাব প্রতিপত্তি ও নেতৃত্ব বজায় রাখার জন্যে ঈমান আনতে প্রস্তুত ছিল না। কাফেরদের সে সম্মেলনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে কুরাইশ নেতাদের প্রস্তাবিত অভিযোগসমূহ সে নিজেই যখন খণ্ডন করলো তখন আরবের লোকদের মধ্যে রটিয়ে দিয়ে নবীকে (সা) বদনাম করা যায় এমন কোন অভিযোগ তৈরি করে পেশ করতে খোদ তাকেই বাধ্য করা হলো। এ সময় সে যেভাবে তার বিবেকের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে এবং বেশ কিছু সময় কঠিন মানসিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকার পর পরিশেষে সে যেভাবে একটি অভিযোগ তৈরি করলো, তার একটা পূর্ণাংগ চিত্র এখানে পেশ করা হয়েছে।

১৫. এর দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হলো, যাকেই এর মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে তাকেই সে জ্বালিয়ে ছাই করে দেবে। কিন্তু জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়েও সে রক্ষা পাবে না। বরং আবার তাকে জীবিত করা হবে এবং আবার জ্বালানো হবে। আরেক জায়গায় কথাটা এভাবে বলা হয়েছে ঃ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى 'সেখানে সে মরে নিঃশেষ হয়েও যাবে না আবার বেঁচেও থাকবে না' (আল আ'লা, ১৩)। এর দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে এই যে, আযাবের উপযুক্ত কেউ–ই তার কবল থেকে রক্ষা পাবে না। আর যে তার কবলে পড়বে তাকেই আযাব থেকে রেহাই দেবে না।

১৬. 'তা দেহের কোন অংশই না জ্বালিয়ে ছাড়বে না' একথা বলে আবার "চামড়া ঝলসিয়ে দেবে" কথাটি আলাদা করে উল্লেখ করাটা বাহ্যত অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। কিন্তু এ বিশেষ ধরনের আযাবের কথা আলাদাভাবে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো, মূলত মুখমণ্ডল ও দেহের চামড়াই মানুষের ব্যক্তিত্বকে সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরে বা প্রকাশ করে। তাই চেহারা ও গাত্রচর্মের কুৎসিত দর্শন ও কুশ্রী হওয়া তার জন্য সর্বাধিক মানসিক যন্ত্রণার কারণ হবে। শরীরের আভ্যন্তরীণ অংগ–প্রত্যংগে তার যত কষ্ট ও যন্ত্রণাই হোক না কেন সে তাতে ততটা মানসিক যাতনাক্লিষ্ট হয় না। যতটা হয় তার চেহারা কুৎসিৎ হলে কিংবা শরীরের খোলা মেলা অংশের চামড়া বা ত্বকের ওপর বিশ্রী দাগ পড়লে। কারণ কোন মানুষের চেহারা ও গাত্র চর্মে বিশ্রী দাগ থাকলে সবাই তাকে ঘৃণা করে। তাই বলা হয়েছে ঃ এ সুদর্শন চেহারা এবং অত্যন্ত নিটোল ও কান্তিময় দেহধারী যেসব মানুষ নিজেদের ব্যক্তিত্ব গৌরবে আত্মহারা তারা যদি আল্লাহর আয়াতের সাথে ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার মত শত্রুতার আচরণ করতেই থাকে তাহলে তাদের মুখমণ্ডল ঝলসিয়ে বিকৃত করে দেয়া হবে আর তাদের গাত্রচর্ম পুড়িয়ে কয়লার মত কাল করে দেয়া হবে।

১৭. এখান থেকে "তোমরা রবের বাহিনী সম্পর্কে তিনি ছাড়া আর কেউ অবহিত নয়" পর্যন্ত বাক্যগুলোতে একটি ভিন্ন প্রসংগ আলোচিত হয়েছে। "দোযখের কর্মচারীর সংখ্যা শুধু উনিশ জন হবে" একথা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে শুনে যারা সমালোচনামুখর হয়ে উঠেছিল এবং কথাটা নিয়ে হাসি ঠাট্টা করতে শুরু করেছিল প্রাসংগিক বক্তব্যের মাঝখানে বক্তব্যের ধারাবাহিকতায় ছেদ টেনে তাদের কথার জবাব দেয়া হয়েছে। তাদের কাছে একথাটি বিস্ময়কর মনে হয়েছে যে, এক দিকে আমাদের বলা হচ্ছে, আদম আলাইহিস সাল্লামের সময় থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ কুফরী করেছে এবং কবীরা গোনাহে লিপ্ত হয়েছে তাদের সবাইকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। অপর দিকে আমাদের জানানো হচ্ছে যে, এত বড় বিশাল দোযখে অসংখ্য মানুষকে আযাব দেয়ার জন্য মাত্র উনিশ জন কর্মচারী নিয়োজিত থাকবে। একথা শুনে কুরাইশ নেতারা অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। আবু জেহেল বললো ঃ আরে ভাই, তোমরা কি এতই অকর্মা ও অথর্ব হয়ে পড়েছো যে, তোমাদের মধ্য থেকে দশ দশ জনে মিলেও দোযখের এক একজন সিপাইকে কাবু করতে পারবে না? বনী জুমাহ্ গোত্রের এক পালোয়ান সাহেব তো বলতে শুরু করলোঃ সতের জনকে আমি একাই দেখে নেব। আর তোমরা সবাই মিলে অবশিষ্ট দুই জনকে কাবু করবে। এসব কথার জবাব হিসেবে সাময়িকভাবে প্রসংগ পাল্টে একথাগুলো বলা হয়েছে।

১৮. অর্থাৎ মানুষের দৈহিক শক্তির সাথে তুলনা করে তাদের শক্তি সম্পর্কে অনুমান করা তোমাদের বোকামী ও নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা মানুষ নয়, বরং ফেরেশতা। তোমাদের পক্ষে অনুমান করাও সম্ভব নয় যে, কি সাংঘাতিক শক্তিধর ফেরেশতা আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন।

১৯. অর্থাৎ দোযখের কর্মচারীদের সংখ্যা বর্ণনা করার বাহ্যত কোন প্রয়োজনই ছিল না। কিন্তু তাদের সংখ্যা আমি এ জন্য উল্লেখ করলাম যাতে তা সেসব লোকের জন্য ফিতনা হয়ে যায় যারা নিজেদের মনের মধ্যে এখনও কুফরী লুকিয়ে রেখেছে। এ ধরনের লোক বাহ্যিকভাবে ঈমানের প্রদর্শনী যতই করুক না কেন তার অন্তরের কোন গভীরতম প্রদেশেও যদি সে আল্লাহর উলুহিয়াত ও তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা কিংবা অহী ও রিসালাত সম্পর্কে সামান্যতম সন্দেহ বা দ্বিধা–দ্বন্দ্বও পোষণ করে থাকে তাহলে আল্লাহর এত বড় জেলখানায় অসংখ্য অপরাধী মানুষ ও জিনকে শুধু উনিশ জন সিপাই সামলে রাখবে এবং আলাদাভাবে প্রত্যেককে শাস্তিও দেবে একথা শোনামাত্র তার লুকিয়ে রাখা কুফরী স্পষ্ট বেরিয়ে পড়বে।

২০. কোন কোন মুফাস্সির এর এ অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, আহলে কিতাবের (ইয়াহুদ ও খৃষ্টান) ধর্মগ্রন্থেও যেহেতু দোযখের ফেরেশতাদের এ সংখ্যাটিই উল্লেখ করা হয়েছে। তাই একথা শোনামাত্র তাদের দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি হবে যে, প্রকৃতপক্ষে এটা আল্লাহর কথাই হবে। কিন্তু আমাদের মতে দু'টি কারণে এ ব্যাখ্যা সঠিক নয়। প্রথম কারণটি হলো, ইয়াহুদ ও খৃষ্টানদের যে ধর্মগ্রন্থ বর্তমানে দুনিয়ায় পাওয়া যায় তাতে অনেক খোঁজাখুঁজির পরও দোযখের কর্মচারী ফেরেশতার সংখ্যা উনিশ জন একথা কোথাও পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয় কারণটি হলো, কুরআনের বহুসংখ্যক বক্তব্য আহলে কিতাবের ধর্মীয় গ্রন্থে বর্ণিত বক্তব্যের অনুরূপ। কিন্তু ইয়াহুদ ও খৃষ্টানরা এসব বক্তব্যের ব্যাখ্যা করে বলে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব কথা তাদের ধর্মগ্রন্থ থেকে গ্রহণ করেছেন। এসব কারণে আমাদের মতে একথাটির সঠিক অর্থ হলো ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাল করেই জানতেন যে, তাঁর মুখে দোযখের কর্মচারী ফেরেশতার সংখ্যা উনিশ, একথা উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে তাঁর প্রতি হাসি–তামাসা ও ঠাট্টা–বিদ্রূপের অসংখ্য বাণ নিক্ষিপ্ত হবে। তা সত্ত্বেও আল্লাহর প্রেরিত অহীতে যে কথা বলা হয়েছে, তা তিনি কোন প্রকার ভয়–ভীতি বা দ্বিধা–দ্বন্দ্ব ছাড়াই প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে সবার সামনে পেশ করলেন এবং কোন প্রকার ঠাট্টা–বিদ্রূপের আদৌ পরোয়া করলেন না। জাহেল আরবরা নবীদের মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট সম্পর্কে অবহিত ছিল না ঠিকই, কিন্তু আহলে কিতাব গোষ্ঠী ভাল করেই জানতো যে, প্রত্যেক যুগে নবীদের নীতি ও পদ্ধতি এটাই যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদের কাছে যা কিছু আসতো মানুষ পছন্দ করুক বা না করুক তারা তা হুবহু মানুষের কাছে পৌছিয়ে দিতেন। তাই আশা করা গিয়েছিল যে, এ চরম প্রতিকূল পরিবেশে রসূলকে (সা) বাহ্যত অদ্ভুত একথাটি কোন প্রকার দ্বিধা–সংকোচ না করে সরাসরি পেশ করতে দেখে অন্তত আহলে কিতাব গোষ্ঠীর দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাবে যে, এটি একজন নবীর কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। এ ক্ষেত্রে অন্যদের তুলনায় আহলে কিতাব গোষ্ঠীর কাছ থেকে এ আচরণ লাভের প্রত্যাশা ছিল বেশী।

উল্লেখ্য যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে এ কর্মনীতি বেশ কয়েকবার প্রতিফলিত হয়েছে। এর মধ্যে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য হলো মি'রাজের ঘটনা। তিনি কাফেরদের সমাবেশে নিসংকোচে ও দ্বিধাহীন চিত্তে মি'রাজের ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন। এ বিস্ময়কর ঘটনা শুনে তাঁর বিরোধীরা কত রকমের কাহিনী ফাঁদবে তার এক বিন্দু পরোয়াও তিনি করেননি।

২১. একথাটি ইতিপূর্বে কুরআন মজীদের কয়েকটি স্থানে বলা হয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেকটি পরীক্ষার সময় একজন ঈমানদার যদি তার ঈমানে অটল ও অচল থাকে এবং সন্দেহ–সংশয় কিংবা আনুগত্য পরিহার কিংবা দীনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার পথ বর্জন করে দৃঢ় প্রত্যয়, আস্থা, আনুগত্য ও অনুসরণ এবং দীনের প্রতি আস্থা পোষণের পথ অনুসরণ করে তাহলে তার ঈমান দৃঢ়তা ও সমৃদ্ধি লাভ করে। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৭৩; আল আনফাল, আয়াত ২; টীকা ২; আত্ তাওবা, আয়াত ১৪৪ ও ১৪৫; টীকা ১২৫; আল আহযাব, আয়াত ২২; টীকা ৩৮; আল ফাত্‌হ, আয়াত ৪; টীকা ৭)।

২২. কুরআন মজীদে সাধারণত 'মনের রোগ' কথাটি মুনাফেকী অর্থে ব্যবহার করা হয়। তাই এ ক্ষেত্রে এ শব্দটির ব্যবহার দেখে কোন কোন মুফাস্‌সির মনে করেছেন, এ আয়াতটি মদীনাতে নাযিল হয়েছে। কারণ, মদীনাতেই মুনাফিকদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। কিন্তু এ ধারণা কয়েকটি কারণে ঠিক নয়। প্রথমত এ দাবী ঠিক নয় যে, মক্কায় মুনাফিক ছিল না। আমরা তাফহীমুল কুরআন সূরা আনকাবুতের ভূমিকায় এবং ১, ১৩, ১৪, ১৫, ও ১৬নং টীকায় এ ভ্রান্তি স্পষ্ট করে তুলে ধরেছি। দ্বিতীয়ত বিশেষ পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে ধারাবাহিকভাবে অবতীর্ণ আয়াতসমূহের কোন একটি আয়াত সম্পর্কে একথা বলা যে, তা অন্য কোন পরিস্থিতিতে নাযিল হয়েছে এবং কোন পূর্বাপর সম্পর্ক ছাড়াই এখানে জুড়ে দেয়া হয়েছে, এভাবে কুরআনের কোন আয়াতের তাফসীর করা আমরা সঠিক মনে করি না। নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াতসমূহ থেকেই আমরা সূরা মুদ্দাস্‌সিরের এ অংশের ঐতিহাসিক পটভূমি জানতে পারি। মক্কী যুগের প্রাথমিক পর্যায়ের একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে এ অংশটি নাযিল হয়েছিল। ঘটনার সাথে বক্তব্যের ধারাবাহিকতার পুরোপুরি সামঞ্জস্য রয়েছে। যদি এ একটি বাক্য কয়েক বছর পর মদীনাতেই নাযিল হয়ে থাকে তাহলে তাকে এ বিশেষ বিষয়ের মধ্যে এনে জুড়ে দেয়ার কি এমন অবকাশ বা যুক্তি আছে? এখন একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, 'মনের রোগ' বলতে তাহলে কি বুঝানো হয়েছে? এর জবাব হলো, এর অর্থ সন্দেহের রোগ। অকাট্যভাবে এবং নিসংশয়ে আল্লাহ, আখেরাত, অহী, রিসালাত, জান্নাত ও দোযখ অস্বীকার করে এমন লোক শুধু মক্কায় নয় গোটা পৃথিবীতে আগেও যেমন কম ছিল এখনও তেমনি কম আছে। আল্লাহ আছেন কিনা, আখেরাত হবে কি হবে না, ফেরেশতা, জান্নাত ও দোযখ বাস্তবিকই আছে না কল্পকাহিনী মাত্র? রসূল কি প্রকৃতই রসূল ছিলেন? তাঁর কাছে কি সত্যিই অহী আসতো? প্রত্যেক যুগে এ ধরনের সন্দেহ পোষণকারী লোকের সংখ্যাই অধিক ছিল। এ সন্দেহই অধিকাংশ মানুষকে শেষ পর্যন্ত কুফরীতে নিমজ্জিত করেছে। তা

না হলে যারা এসব সত্য অকাট্যভাবে অস্বীকার করে পৃথিবীতে এরূপ নির্বোধের সংখ্যা কোন সময়ই বেশী ছিল না। কেননা যার মধ্যে বিন্দু পরিমাণ বিবেক–বুদ্ধিও আছে সেও জানে যে, এসব বিষয়ের সত্য ও সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে বাতিল করে দেয়া এবং অকাট্যভাবে অসম্ভব ও অবাস্তব বলে সিদ্ধান্ত দেয়ার আদৌ কোন ভিত্তি নেই।

২৩. এর অর্থ এ নয় যে, তারা একে আল্লাহর বাণী বলে মেনে নিচ্ছিলো ঠিকই কিন্তু বিস্ময় প্রকাশ করছিলো এ জন্য যে, আল্লাহ তা'আলা একথা বললেন কেন? বরং প্রকৃতপক্ষে তারা বলতে চাচ্ছিলো যে, যে বাণীতে এরূপ বিবেক–বুদ্ধি বিরোধী ও দুর্বোধ্য কথা বলা হয়েছে তা আল্লাহর বাণী কি করে হতে পারে?

২৪. অর্থাৎ এভাবে আল্লাহ তা'আলা মাঝে মধ্যে তাঁর বাণী ও আদেশ–নির্দেশে এমন কিছু কথা বলেন যা মানুষের জন্য পরীক্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যে কথা শুনে একজন সত্যপন্থী, সৎপ্রকৃতির এবং সঠিক চিন্তার লোক সহজ সরল অর্থ গ্রহণ করে সঠিক পথ অনুসরণ করে একজন হঠকারী বক্রচিন্তাধারী এবং সত্যকে এড়িয়ে চলার মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি সে একই কথার বাঁকা অর্থ করে তাকে ন্যায় ও সত্য থেকে দূরে সরে যাওয়ার একটা নতুন বাহানা হিসেবে ব্যবহার করে। প্রথমোক্ত ব্যক্তি নিজে যেহেতু সত্যপন্থী তাই আল্লাহ তা'আলা তাকে হিদায়াত দান করেন। কারণ, হিদায়াত প্রার্থী ব্যক্তিকে জোর করে গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট করা আল্লাহর নীতি নয়। শেষোক্ত ব্যক্তি যেহেতু নিজেই হিদায়াত চায় না, বরং গোমরাহীকেই পছন্দ করে তাই আল্লাহ তাকে গোমরাহীর পথেই ঠেলে দেন। কারণ যে ন্যায় ও সত্যকে ঘৃণা করে তাকে জোর করে হকের পথে টেনে আনা আল্লাহর নীতি নয়। (আল্লাহ তা'আলার হিদায়াত দান করা এবং গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করার বিষয়টি সম্পর্কে এ তাফসীর গ্রন্থের বিভিন্ন জায়গায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ নিচে উল্লেখিত জায়গাসমূহে দেখুন, সূরা আল বাকারাহ, টীকা ১০, ১৬, ১৯, ও ২০; আন নিসা, টীকা ১৭৩; আল আন'য়াম, টীকা ১৭, ২৮ ও ৯০; ইউনুস, টীকা ১৩; আল কাহ্‌ফ, টীকা ৫৪ এবং আল কাসাস, টীকা ৭১)

২৫. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এ বিশ্ব–জাহানে ভিন্ন ভিন্ন কত শত রকমের জীব–জন্তু যে সৃষ্টি করে রেখেছেন, তাদের কত রকম শক্তি সামর্থ যে দান করেছেন এবং তাদের দ্বারা কত রকম কাজ যে আঞ্জাম দিচ্ছেন একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না। পৃথিবীর মত ক্ষুদ্র একটি গ্রহে বসবাসকারী মানুষ তার সীমাবদ্ধ দৃষ্টি দিয়ে চার পাশের ক্ষুদ্র পৃথিবীকে দেখে যদি এ ভুল ধারণা করে বসে যে, সে তার ইন্দ্রিয়সমূহের সাহায্যে যা কিছু দেখছে ও অনুভব করছে কেবল মাত্র সেগুলোই আল্লাহর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বাধীন তাহলে এটা তার মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই না। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বাধীন এ বিশ্ব–জাহান এত ব্যাপক ও বিশাল যে, মানুষের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে এর ব্যাপকতা ও বিশালতার সবটুকু জ্ঞানের স্থান সংকুলান তো দূরের কথা এর কোন একটি জিনিস সম্পর্কেও পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা তার সাধ্যাতীত।

২৬. অর্থাৎ দোযখের উপযুক্ত হয়ে যাওয়া এবং তার শাস্তিলাভের পূর্বেই লোকেরা যেন তা থেকে নিজেদের রক্ষার চিন্তা করে।

كَلَّا وَالْقَمَرِ ﴿٣٢﴾ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ﴿٣٣﴾ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ﴿٣٤﴾ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ ﴿٣٥﴾ نَذِيرًا
لِّلْبَشَرِ ﴿٣٦﴾ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴿٣٧﴾ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ
رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴿٣٩﴾ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٤٠﴾ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٤١﴾
مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ
الْمِسْكِينَ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴿٤٥﴾ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٤٦﴾
حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ ﴿٤٧﴾ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴿٤٨﴾

২ রুকূ’

কখ্‌খনো না,[২৭] চাঁদের শপথ, আর রাতের শপথ যখন তার অবসান ঘটে। ভোরের শপথ যখন তা আলোকোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এ দোযখও বড় জিনিসগুলোর একটি।[২৮] মানুষের জন্য ভীতিকর। যে অগ্রসর হতে চায় বা পেছনে পড়ে থাকতে চায়[২৯] তাদের সবার জন্য।

প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের কাছে দায়বদ্ধ।[৩০] তবে ডান দিকের লোকেরা ছাড়া[৩১] যারা জান্নাতে অবস্থান করবে। সেখানে তারা অপরাধীদের জিজ্ঞেস করতে থাকবে[৩২] "কিসে তোমাদের দোযখে নিক্ষেপ করলো।" তারা বলবে ঃ আমরা নামায পড়তাম না।[৩৩] অভাবীদের খাবার দিতাম না।[৩৪] সত্যের বিরুদ্ধে অপবাদ রটনাকারীদের সাথে মিলে আমরাও রটনা করতাম; প্রতিফল দিবস মিথ্যা মনে করতাম। শেষ পর্যন্ত আমরা সে নিশ্চিত জিনিসের মুখোমুখি হয়েছি।[৩৫] সে সময় সুপারিশকারীদের কোন সুপারিশ তাদের কাজে আসবে না।[৩৬]

২৭. অর্থাৎ এটা কোন ভিত্তিহীন কথা নয় যে তা নিয়ে এভাবে হাসি তামাসা বা ঠাট্টা–বিদ্রূপ করা যাবে।

২৮. অর্থাৎ চন্দ্র এবং রাত–দিন যেমন আল্লাহর কুদরতের বিরাট বিরাট নিদর্শন ঠিক তেমনি দোযখও আল্লাহর বিশাল সৃষ্টিসমূহের একটি। চাঁদের অস্তিত্ব যদি অসম্ভব না হয়ে থাকে। রাত ও দিনের নিয়মানুবর্তিতার সাথে আগমন তথা আবর্তন যদি অসম্ভব না হয় তাহলে তোমাদের মতে দোযখের অস্তিত্ব অসম্ভব হবে কি কারণে? রা· দিন সব সময় যেহেতু তোমরা এসব জিনিস দেখছো তাই এগুলো সম্পর্কে তোমাদের মনে কোন বিস্ময় জাগে না। অন্যথায় এগুলোর প্রত্যেকটি আল্লাহর কুদরতের একেকটি বিস্ময়কর মু’জিযা।

কোন সময় এসব জিনিস যদি তোমরা না দেখতে। আর এ অবস্থায় কেউ যদি তোমাদের বলতো যে, চাঁদের মত একটি জিনিস এ পৃথিবীতে আছে অথবা সূর্য এমন একটি বস্তু যা আড়ালে চলে গেলে দুনিয়া আঁধারে ঢাকা পড়ে এবং আড়াল থেকে বেরিয়ে আসলে দুনিয়া আলোকোদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তাহলে একথা শুনেও তোমাদের মত লোকেরা অট্টহাসিতে ঠিক তেমনি ফেটে পড়তে যেমন দোযখের কথা শুনে আজ ফেটে পড়ছো।

২৯. এর অর্থ হলো, এ জিনিসটি দ্বারা মানুষকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। এখন কেউ ইচ্ছা করলে এ জিনিসটিকে ভয় করে কল্যাণের পথে আরো এগিয়ে যেতে পারে। আবার কেউ ইচ্ছা করলে পেছনে সরে যেতে পারে।

৩০. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন সূরা তূরের ১৬নং টীকা।

৩১. অন্য কথায় বাম দিকের লোকেরা তাদের কৃতকর্মের বিনিময়ে পাকড়াও হবে। কিন্তু ডান দিকের লোকেরা দায়বদ্ধ অবস্থা থেকে নিজেদের মুক্ত করে নেবে। (ডান ও বাঁ দিকের ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা ওয়াকিয়া, টীকা ৫ ও ৬)

৩২. ইতিপূর্বে কুরআন মজীদের কয়েকটি স্থানে এ বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে যে, জান্নাত ও জাহান্নামের অধিবাসীরা পরস্পর থেকে লাখ লাখ মাইল দূরে অবস্থান করা সত্ত্বেও যখনই ইচ্ছা করবে কোন যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই একে অপরকে দেখতে পাবে এবং সরাসরি কথাবার্তাও বলতে পারবে। উদাহরণ হিসেবে দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আ'রাফ, আয়াত ৪৪ থেকে ৫০, টীকা ৩৫; আস সাফ্‌ফাত, আয়াত ৫০ থেকে ৫৭, টীকা ৩২।

৩৩. এর অর্থ হলো, যেসব মানুষ আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং তাঁর কিতাবকে মেনে নিয়ে মানুষের কাছে আল্লাহর প্রাথমিক হক অর্থাৎ নামায ঠিকমত আদায় করেছে আমরা তাদের মধ্যে অন্তরভুক্ত ছিলাম না। এ ক্ষেত্রে একথাটি খুব ভাল করে বুঝে নেয়া দরকার যে, কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত নামায পড়তেই পারে না যতক্ষণ না সে ঈমান আনে। তাই নামাযী হওয়ার অনিবার্য অর্থ হচ্ছে ঈমানদার হওয়া। কিন্তু নামাযী না হওয়াকে দোযখে যাওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করার মাধ্যমে স্পষ্ট করে একথাই বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি নামায না পড়লে ঈমানদার হওয়া সত্ত্বেও সে দোযখ থেকে বাঁচতে পারবে না।

৩৪. এ থেকে জানা যায় কোন মানুষকে ক্ষুধার্ত দেখার পর সামর্থ থাকা সত্ত্বেও খাবার না দেয়া ইসলামের দৃষ্টিতে কত বড় গোনাহ যে, মানুষের দোযখে যাওয়ার কারণসমূহের মধ্যে এটাকেও একটা কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩৫. অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত আমরা এ নীতি ও কর্মপন্থা অনুসরণ করেছি। শেষ পর্যন্ত সে নিশ্চিত বিষয়টি আমাদের সামনে এসে হাজির হয়েছে যে সম্পর্কে আমরা গাফিল হয়ে পড়েছিলাম। নিশ্চিত বিষয় বলে মৃত্যু ও আখেরাত উভয়টিকেই বুঝানো হয়েছে।

৩৬. অর্থাৎ যারা মৃত্যু পর্যন্ত এ নীতি অনুসরণ করেছে তাদের জন্য শাফায়াত করলেও সে ক্ষমা লাভ করতে পারবে না। শাফায়াত সম্পর্কে কুরআন মজীদের বহু স্থানে এত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কে শাফায়াত করতে সক্ষম আর কে সক্ষম নয়, কোন

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿٤٩﴾ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ ﴿٥٠﴾ فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ ﴿٥١﴾ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ﴿٥٢﴾ كَلَّا ۖ بَل لَّا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ﴿٥٣﴾ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ﴿٥٤﴾ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ ﴿٥٥﴾ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ۚ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿٥٦﴾

এদের হলো কি যে এরা এ উপদেশ বাণী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে যেন তারা বাঘের ভয়ে পলায়নপর বন্য গাধা।[৩৭] বরং তারা প্রত্যেকে চায় যে, তার নামে খোলা চিঠি পাঠানো হোক।[৩৮] তা কখ্‌খনো হবে না। আসল কথা হলো, এরা আখেরাতকে আদৌ ভয় করে না।[৩৯] কখ্‌খনো না[৪০] এ তো একটা উপদেশ বাণী। এখন কেউ চাইলে এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুক। আর আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তারা কোন শিক্ষা গ্রহণ করবে না।[৪১] একমাত্র তিনিই তাকওয়া বা ভয়ের যোগ্য।[৪২] এবং (তাকওয়ার নীতি গ্রহণকারীদের) ক্ষমার অধিকারী।[৪৩]

অবস্থায় শাফায়াত করা যায় আর কোন্ অবস্থায় যায় না। কার জন্য করা যায় আর কার জন্য যায় না এবং কার জন্য তা কল্যাণকর আর কার জন্য তা কল্যাণকর নয় তা জানা কারো জন্য কঠিন নয়। পৃথিবীতে মানুষের গোমরাহীর বড় বড় কারণের মধ্যে একটি হলো শাফায়াত সম্পর্কে ভ্রান্ত আকীদা–বিশ্বাস পোষণ। তাই বিষয়টি কুরআন এত খোলামেলা ও স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছে যে, এ ক্ষেত্রে সন্দেহের আর কোন অবকাশই বাকি রাখেনি। উদাহরণ স্বরূপ নিচে নির্দেশিত আয়াতসমূহ দেখুন, সূরা আল বাকারাহ, ২৫৫; আল আন'আম, ৯৪; আল আ'রাফ, ৫৩; ইউনুস, ৩ ও ১৮; মারয়াম, ৮৭; ত্বা–হা, ১০৯; আল আম্বিয়া, ২৮; সাবা ২৩, আয্ যুমার, ৪৩ ও ৪৪, আল মু'মিন, ১৮; আদ্ দুখান, ৮৬; আন নাজ্ম, ২৬ এবং আন নাবা, ৩৭ ও ৩৮। যেসব স্থানে এসব আয়াত আছে তাফহীমুল কুরআনের সেসব জায়গায় আমরা বিস্তারিতভাবে তার ব্যাখ্যা পেশ করেছি।

৩৭. এটা প্রচলিত একটি আরবী প্রবাদ। বন্য গাধার বৈশিষ্ট হলো বিপদের আভাস পাওয়া মাত্র এত অস্থির হয়ে পালাতে থাকে যে আর কোন জন্তু তেমন করে না। এ জন্য আরবরা অস্বাভাবিক রকম অস্থির ও দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পলায়নপর ব্যক্তিকে বাঘের গন্ধ বা শিকারীর মৃদু পদশব্দ শোনামাত্র পলায়নরত বন্য গাধার সাথে তুলনা করে থাকে।

৩৮. অর্থাৎ তারা চায় যে, আল্লাহ তা'আলা যদি সত্যি সত্যিই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী হিসেবে পাঠিয়ে থাকেন তাহলে তিনি মক্কার প্রত্যেক নেতা ও সমাজপতিদের কাছে যেন একখানা করে পত্র লিখে পাঠান যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ

আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যিই আমার নবী, তোমরা তাঁর আনুগত্য করো। পত্রখানা এমন হবে যেন তা দেখে তারা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে যে, আল্লাহই এ পত্র লিখে পাঠিয়েছেন। কুরআন মজীদের অন্য এক জায়গায় মক্কার কাফেরদের এ উক্তিরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, "আল্লাহর রসূলদের যা দেয়া হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত তা আমাদের দেয়া না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা মেনে নেব না।" (আল আন'আম, ২৪) অন্য এক জায়গায় তাদের এ দাবীও উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, "আপনি আমাদের চোখের সামনে আসমানে উঠে যান এবং সেখান থেকে লিখিত কিতাব নিয়ে আসেন, আমরা তা পড়ে দেখবো।" (বনী ইসরাঈল, ৯৩)

৩৯. অর্থাৎ এদের ঈমান না আনার আসল কারণ এটা নয় যে, তাদের এ দাবী পূরণ করা হচ্ছে না। বরং এর আসল কারণ হলো এরা আখেরাতের ব্যাপারে বেপরোয়া ও নির্ভীক। এরা এ পৃথিবীকেই পরম পাওয়া মনে করে নিয়েছে। তাই তাদের এ ধারণাটুকু পর্যন্ত নেই যে, এ দুনিয়ার জীবন শেষ হওয়ার পর আরেকটি জীবন আছে যেখানে তাদেরকে নিজ নিজ কৃতকর্মের হিসেব দিতে হবে। এ জিনিসটিই তাদেরকে এ পৃথিবীতে নিরুদ্বিগ্ন ও দায়িত্বহীন বানিয়ে দিয়েছে। হক ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যার প্রশ্নকে তারা অর্থহীন মনে করে। কারণ দুনিয়াতে এমন কোন সত্য তারা দেখতে পায় না যা অনুসরণ করার ফলাফল এ দুনিয়াতে সবসময় ভালই হয়ে থাকে এবং এমন কোন বাতিল বা মিথ্যাও তারা দুনিয়াতে দেখতে পায় না যার ফলাফল এ দুনিয়াতে সবসময় মন্দই হয়ে থাকে। তাই প্রকৃতপক্ষে সত্য কি আর মিথ্যা কি তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা তারা নিরর্থক মনে করে। যে ব্যক্তি দুনিয়ার এ জীবনকে অস্থায়ী জীবন বলে মনে করে এবং সাথে সাথে এও বিশ্বাস করে যে, সত্যিকার এবং চিরস্থায়ী জীবন হলো আখেরাতের জীবন যেখানে সত্যের ফলাফল অনিবার্যরূপে ভাল এবং মিথ্যার ফলাফল অনিবার্যরূপে মন্দ হবে, হক ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যার প্রশ্নটি কেবলমাত্র সে ব্যক্তির কাছেই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হতে পারে। এ প্রকৃতির লোক কুরআনের পেশকৃত যুক্তিপূর্ণ দলীল-প্রমাণ এবং পবিত্র শিক্ষাসমূহ দেখেই তার প্রতি ঈমান আনবে এবং নিজের বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে বুঝার চেষ্টা করবে যে, কুরআন যেসব আকীদা-বিশ্বাস এবং কাজ-কর্মকে ভ্রান্ত বলছে তার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কি কি ভুল-ভ্রান্তি আছে। কিন্তু আখেরাতকে অস্বীকারকারী, যে সত্যের অনুসন্ধানে নিষ্ঠাবান নয় সে ঈমান গ্রহণ না করার জন্য নতুন নতুন দাবী পেশ করতে থাকবে। অথচ তার যে কোন দাবীই পূরণ করা হোক না কেন সত্যকে অস্বীকার করার জন্য সে আরেকটি নতুন বাহানা খাড়া করবে। এ কথাটিই সূরা আন'আমে এভাবে বলা হয়েছে ঃ "হে নবী, আমি যদি কাগজে লিখিত কোন গ্রন্থও তোমার প্রতি নাযিল করতাম আর এসব লোকেরা তা হাত দিয়ে স্পর্শ করে দেখতো তার পরও যারা সত্যকে অস্বীকার করেছে তারা বলতো, এতো স্পষ্ট যাদু।" (সূরা আল আন'আম, ৭)

৪০. অর্থাৎ তাদের এ ধরনের কোন দাবী কখ্‌খনো পূরণ করা হবে না।

৪১. অর্থাৎ নসীহত গ্রহণ করা শুধু কোন ব্যক্তির নিজের ইচ্ছার ওপরই নির্ভর করে না বরং নসীহত গ্রহণ করার সৌভাগ্য সে তখনই লাভ করে যখন আল্লাহর ইচ্ছা তাকে নসীহত গ্রহণ করার সুমতি ও সুবুদ্ধি দান করে। অন্য কথায় এখানে এ সত্য তুলে ধরা

হয়েছে যে, বান্দার কোন কাজই এককভাবে বান্দার নিজের ইচ্ছায় সংঘটিত হয় না। বরং প্রতিটি কাজ কেবল তখনই পূর্ণতা লাভ করে যখন আল্লাহর ইচ্ছা বান্দার ইচ্ছার অনুকূল হয়। এ সূক্ষ্ম বিষয়টি সঠিকভাবে না বুঝার কারণে মানুষের ধ্যান–ধারণা ও চিন্তা–ভাবনা অনেক ক্ষেত্রেই হোঁচট খায়। অল্প কথায় বিষয়টি এভাবে বুঝা যেতে পারে, প্রতিটি মানুষ যদি পৃথিবীতে এতটা ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী হতো যে, সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে তাহলে গোটা পৃথিবীর নিয়ম শৃংখলা ভেঙে পড়তো। বর্তমানে এ পৃথিবীতে যে নিয়ম শৃংখলা আছে তা এ কারণেই আছে যে, আল্লাহর ইচ্ছা সব ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। মানুষ যা–ই করতে ইচ্ছা করুক না কেন তা সে কেবল তখনই করতে পারে যখন আল্লাহর ইচ্ছা হয় যে, সে তা করুক। হিদায়াত ও গোমরাহীর ব্যাপারটিও ঠিক অনুরূপ। নিজের জন্য হিদায়াত কামনা করাই মানুষের হিদায়াত পাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং সে হিদায়াত কেবল তখনই লাভ করে যখন আল্লাহ তার এ আকাংখা পূরণ করার ফায়সালা করেন। একইভাবে বান্দার পক্ষ থেকে গোমরাহীর পথে চলার ইচ্ছাই তার গোমরাহীর জন্য যথেষ্ট নয়। বরং তার মধ্যে গোমরাহীর দাবী ও আকাংখা দেখে আল্লাহর ইচ্ছা যখন তাকে গোমরাহী ও ভ্রান্তির পথে চলার মঞ্জুরী ও ফায়সালা দেন তখনই কেবল সে ভ্রান্তি ও গোমরাহীর পথে চলতে থাকে। এভাবে সে গোমরাহীর সেসব পথে চলতে পারে যেসব পথে চলার অবকাশ আল্লাহ তাকে দেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কেউ যদি চোর হতে চায়, তাহলে তার এ ইচ্ছাটুকুই এ জন্য যথেষ্ট নয় যে, সে যেখানে ইচ্ছা, যে ঘর থেকে ইচ্ছা এবং যা ইচ্ছা চুরি করে নিয়ে যেতে পারবে। বরং আল্লাহ তাঁর নিজের ব্যাপক জ্ঞান, যুক্তি ও প্রজ্ঞা অনুসারে তার এ ইচ্ছাকে যখন, যতটা এবং যেভাবে পূরণ করার সুযোগ দেন সে কেবল ততটুকুই পূরণ করতে পারে।

৪২. অর্থাৎ আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যে নসীহত তোমাদের করা হচ্ছে তা এ জন্য নয় যে, তাতে আল্লাহর নিজের কোন প্রয়োজন আছে এবং তোমরা তা না করলে আল্লাহর কোন ক্ষতি হবে। বরং এ নসীহত করা হচ্ছে এ জন্য যে, বান্দা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করুক এবং তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে না চলুক এটা আল্লাহর হক বা অধিকার।

৪৩. অর্থাৎ কেউ আল্লাহর নাফরমানী যতই করে থাকুক না কেন যখনই সে এ আচরণ থেকে বিরত হয় তখনই আল্লাহ তার প্রতি নিজের রহমতের হাত বাড়িয়ে দেন। যেহেতু তিনি বান্দা থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের কোন ইচ্ছা আদৌ পোষণ করেন না তাই এমন হঠকারী তিনি নন যে, কোন অবস্থায়ই তাকে ক্ষমা করবেন না বা শাস্তি না দিয়ে ছাড়বেন না।

আল কিয়ামাহ

৭৫

নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতের اَلْقِيٰمَةِ শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এটি শুধু সূরাটির নামই নয়, বরং বিষয়ভিত্তিক শিরোনামও। কারণ এ সূরায় শুধু কিয়ামত সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

কোন হাদীস থেকে যদিও এ সূরার নাযিল হওয়ার সময়–কাল জানা যায় না। কিন্তু এর বিষয়বস্তুর মধ্যেই এমন একটি প্রমাণ বিদ্যমান যা থেকে বুঝা যায়, এটি নবুওয়াতের একেবারে প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম। সূরার ১৫ আয়াতের পর হঠাৎ ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে ঃ এ অহীকে দ্রুত মুখস্ত করার জন্য তুমি জিহবা নাড়বে না। এ বাণীকে স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং পড়িয়ে দেয়া আমার দায়িত্ব। অতএব আমি যখন তা পড়ি তখন তুমি তা মনযোগ দিয়ে শুনতে থাকো। এর অর্থ বুঝিয়ে দেয়াও আমার দায়িত্ব। এরপর ২০ নম্বর আয়াত থেকে আবার সে পূর্বের বিষয়ে আলোচনা শুরু হচ্ছে যা প্রথম থেকে ১৫ নম্বর আয়াত পর্যন্ত চলেছিল। যে সময় হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এ সূরাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শুনাচ্ছিলেন পরে ভুলে যেতে পারে এ আশংকায় তিনি এর কথাগুলো বার বার মুখে আওড়াচ্ছিলেন। এ কারণে পূর্বাপর সম্পর্কহীন এ বাক্যটি পরিবেশ ও পরিস্থিতি এবং হাদীসের বর্ণনা উভয় দিক থেকেই বক্তব্যের মাঝখানে সন্নিবেশিত হওয়া যথার্থ হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, এ ঘটনা সে সময়ের যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবেমাত্র অহী নাযিলের নতুন নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করছেন এবং অহী গ্রহণের পাকাপোক্ত অভ্যাস তাঁর তখনও গড়ে ওঠেনি। কুরআন মজীদে এর আরো দু'টি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। একটি সূরা ত্বা–হা যেখানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ

"আর দেখো, কুরআন পড়তে তাড়াহুড়া করো না, যতক্ষণ না তোমাকে অহী পূর্ণরূপে পৌছিয়ে দেয়া হয়। (আয়াত ১১৪)

দ্বিতীয়টি সূরা আ'লায়। এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে ঃ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰى "আমি অচিরেই তোমাকে পড়িয়ে দেব তারপর

তুমি আর ভুলে যাবে না।" (আয়াত, ৬) পরবর্তী সময়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহী গ্রহণে ভালভাবে অভ্যস্ত হয়ে গেলে এ ধরনের নির্দেশনা দেয়ার আর প্রয়োজন থাকেনি। তাই কুরআনের এ তিনটি স্থান ছাড়া এর আর কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য

এ সূরা থেকে কুরআন মজীদের শেষ পর্যন্ত যতগুলো সূরা আছে তার অধিকাংশের বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গী থেকে বুঝা যায় যে, সূরা মুদ্দাস্‌সিরের প্রথম সাতটি আয়াত নাযিল হওয়ার পর যখন অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি বর্ষণের মত কুরআন নাযিলের সিলসিলা শুরু হলো, এ সূরাটিও তখনকার অবতীর্ণ বলে মনে হয়। পর পর নাযিল হওয়া এসব সূরায় জোরালো এবং মর্মস্পর্শী ভাষায় অত্যন্ত ব্যাপক কিন্তু সংক্ষিপ্ত বাক্যে ইসলাম এবং তার মৌলিক আকীদা–বিশ্বাস ও নৈতিক শিক্ষাসমূহ পেশ করা হয়েছে এবং মক্কাবাসীদেরকে তাদের গোমরাহী সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে। এ কারণে কুরাইশ নেতারা অস্থির হয়ে যায় এবং প্রথম হজ্জের মওসুম আসার আগেই তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরাভূত বা ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য নানা রকম ফন্দি–ফিকির ও কৌশল উদ্ভাবনের জন্য একটি সম্মেলনের আয়োজন করে। সূরা মুদ্দাস্‌সিরের ভূমিকায় আমরা এ বিষয়ের উল্লেখ করেছি।

এ সূরায় আখেরাত অবিশ্বাসীদের সম্বোধন করে তাদের একেকটি সন্দেহ ও একেকটি আপত্তি ও অভিযোগের জওয়াব দেয়া হয়েছে। অত্যন্ত মজবুত প্রমাণাদি পেশ করে কিয়ামত ও আখেরাতের সম্ভাব্যতা, সংঘটন ও অনিবার্যতা প্রমাণ করা হয়েছে। আর একথাও স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তিই আখেরাতকে অস্বীকার করে, তার অস্বীকৃতির মূল কারণ এটা নয় যে, তার জ্ঞানবুদ্ধি তা অসম্ভব বলে মনে করে। বরং তার মূল কারণ ও উৎস হলো, তার প্রবৃত্তি তা মেনে নিতে চায় না। সাথে সাথে মানুষকে এ বলে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, যে সময়টির আগমনকে তোমরা অস্বীকার করছো তা অবশ্যই আসবে। তোমাদের সমস্ত কৃতকর্ম তোমাদের সামনে পেশ করা হবে। প্রকৃতপক্ষে আমলনামা দেখার পূর্বেই তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই জানতে পারবে যে, সে পৃথিবীতে কি কি কাজ করে এসেছে। কেননা কোন মানুষই নিজের ব্যাপারে অজ্ঞ বা অনবহিত নয়। দুনিয়াকে প্রতারিত করার জন্য এবং নিজের বিবেককে ভুলানোর জন্য নিজের কাজকর্ম ও আচরণের পক্ষে যত যুক্তি, বাহানা ও ওযর সে পেশ করুক না কেন।

لَآ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ ﴿١﴾ وَلَآ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴿٢﴾ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴿٣﴾ بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰٓى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ ﴿٤﴾ بَلْ يُرِيْدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴿٥﴾ يَسْئَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ﴿٦﴾ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ﴿٧﴾ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ﴿٨﴾ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴿٩﴾ يَقُوْلُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ ﴿١٠﴾ كَلَّا لَا وَزَرَ ﴿١١﴾ إِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِنِ الْمُسْتَقَرُّ ﴿١٢﴾ يُنَبَّؤُا الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴿١٣﴾ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهِ بَصِيْرَةٌ ﴿١٤﴾ وَلَوْ أَلْقٰى مَعَاذِيْرَهُ ﴿١٥﴾

না,[১] আমি শপথ করছি কিয়ামতের দিনের। আর না, আমি শপথ করছি তিরস্কারকারী নফসের।[২] মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার হাড়সমূহ একত্র করতে পারবো না?[৩] কেন পারবো না? আমি তো তার আংগুলের জোড়গুলো পর্যন্ত ঠিকমত পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম।[৪] কিন্তু মানুষ ভবিষ্যতেও কুকর্ম করতে চায়।[৫] সে জিজ্ঞেস করে, কবে আসবে কিয়ামতের সেদিন?[৬] অতপর চক্ষু যখন স্থির হয়ে যাবে।[৭] চাঁদ আলোহীন হয়ে পড়বে এবং চাঁদ ও সূর্যকে একত্র করে একাকার করে দেয়া হবে।[৮] সেদিন এ মানুষই বলবে, পালাবার স্থান কোথায়? কখ্খনো না, সেখানে কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না। সেদিন তোমার রবের সামনেই গিয়ে দাঁড়াতে হবে। সেদিন মানুষকে তার আগের ও পরের কৃতকর্মসমূহ জানিয়ে দেয়া হবে।[৯] বরং মানুষ নিজে নিজেকে খুব ভাল করে জানে। সে যতই অজুহাত পেশ করুক না কেন।[১০]

১. 'না' শব্দ দ্বারা বক্তব্য শুরু করাই প্রমাণ করে যে, আগে থেকেই কোন বিষয়ে আলোচনা চলছিল যার প্রতিবাদ করার জন্য এ সূরা নাযিল হয়েছে। পরবর্তী বক্তব্য স্বতঃই স্পষ্ট করে দেয় যে, আলোচনার বিষয় ছিল কিয়ামত ও আখেরাতের জীবন। আর মক্কার লোকেরা এটি শুধু অস্বীকারই করে আসছিলো না বরং অস্বীকৃতির সাথে সাথে তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপও করে আসছিলো। একটি উদাহরণ দ্বারা এ বর্ণনাভঙ্গি ভাল করে বুঝা যেতে পারে। আপনি যদি শুধু রসূলের সত্যতা অস্বীকার করতে চান তাহলে বলবেন ঃ আল্লাহর কসম রসূল সত্য। "কিন্তু কিছু লোক যদি রসূলকে অস্বীকার করতে থাকে তবে তার উত্তরে আপনি কথা বলতে শুরু করবেন এভাবে ঃ না, আল্লাহর কসম, রসূল সত্য। এর অর্থ হবে, তোমরা যা বলছো তা ঠিক নয়। আমি কসম করে বলছি, প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এটি।

২. কুরআন মজীদে মানুষের নফসের তিনটি রূপ উল্লেখ করা হয়েছে। এক, একটি 'নফস' মানুষকে মন্দ কাজে প্ররোচিত করে। এটির নাম 'নফসে আম্মারা'। দুই, একটি 'নফস' ভুল বা অন্যায় কাজ করলে অথবা ভুল বা অন্যায় বিষয়ে চিন্তা করলে কিংবা খারাপ নিয়ত রাখলে লজ্জিত হয় এবং সে জন্য মানুষকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করে। এটির নাম 'নফসে লাউয়ামাহ্'। আধুনিক পরিভাষায় একেই আমরা বিবেক বলে থাকি। তিন, যে নফসটি সঠিক পথে চললে এবং ভুল ও অন্যায়ের পথ পরিত্যাগ করলে তৃপ্তি ও প্রশান্তি অনুভব করে তাকে বলে 'নফসে মুত্মাইন্নাহ'।

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কি কারণে কিয়ামতের দিন এবং তিরস্কারকারী নফসের কসম করেছেন তা বর্ণনা করেননি। কারণ পরবর্তী আয়াতটি সে বিষয়টির প্রতিই ইংগিত করছে। যে জন্য কসম করা হয়েছে তাহলো, মানুষের মরার পর আল্লাহ তা'আলা পুনরায় তাকে অবশ্যই সৃষ্টি করবেন। তা করতে তিনি পুরোপুরি সক্ষম। এখন প্রশ্ন হলো এ বিষয়টির জন্য এ দু'টি জিনিসের কসম করার পেছনে কি যৌক্তিকতা আছে?

কিয়ামতের দিনের কসম খাওয়ার কারণ হলো, কিয়ামতের আগমন নিশ্চিত ও অনিবার্য। গোটা বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থাপনাই প্রমাণ করছে যে, এ ব্যবস্থাপনা অনাদী ও অন্তহীন নয়। এর বৈশিষ্ট ও প্রকৃতিই বলে দিচ্ছে এটা চিরদিন ছিল না এবং চিরদিন থাকতেও পারে না। মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি এ ভিত্তিহীন ধ্যান-ধারণার সপক্ষে ইতিপূর্বেও কোন মজবুত দলীল-প্রমাণ খুঁজে পায়নি যে, প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনশীল এ পৃথিবী কখনো অনাদি ও অবিনশ্বর হতে পারে। কিন্তু এ পৃথিবী সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে এ বিষয়টি তার কাছে ততই নিশ্চিত হতে থাকে যে, এ চাঞ্চল্য মুখর বিশ্ব- জাহানের একটি শুরু বা সূচনা বিন্দু আছে যার পূর্বে এটি ছিল না। আবার অনিবার্যরূপে এর একটি শেষও আছে যার পরে এটি আর থাকবে না। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে কিয়ামতেরই কসম করেছেন। এ কসমটির ধরন এরূপ যেমন আমরা অতিশয় সন্দেহবাদী কোন মানুষকে—যে তার আপন অস্তিত্ব সম্পর্কেও সন্দেহ করছে—সম্বোধন করে বলি ঃ তোমার প্রাণ সত্তার কসম, তুমি তো বর্তমান। অর্থাৎ তোমার অস্তিত্বই সাক্ষী যে তুমি আছ।

কিয়ামতের দিনের কসম শুধু এ বিষয়টি প্রমাণ করে যে, একদিন বিশ্ব-জাহানের এ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাবে। এরপর মানুষকে পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে। তাকে

নিজের সমস্ত কাজের হিসেবে দিতে হবে এবং সে নিজের কৃতকর্মের ভাল বা মন্দ ফলাফল দেখবে। এর জন্য পুনরায় 'নফসে লাউয়ামার" কসম করা হয়েছে। পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ নেই যার মধ্যে বিবেক বলে কোন জিনিস নেই। এ বিবেকের মধ্যে অনিবার্যরূপে ভাল এবং মন্দের একটি অনুভূতি বিদ্যমান। মানুষ ভাল এবং মন্দ যাচাইয়ের যে মানদণ্ডই স্থির করে থাকুক না কেন এবং তা ভুল হোক বা নির্ভুল হোক, চরম অধঃপতিত ও বিভ্রান্ত মানুষের বিবেকও মন্দ কাজ করলে কিংবা ভাল কাজ না করলে তাকে তিরস্কার করে। এটাই প্রমাণ করে যে, মানুষ নিছক একটি জীব নয়, বরং একটি নৈতিক সত্ত্বাও বটে। প্রকৃতিগতভাবেই তার মধ্যে ভাল এবং মন্দের উপলব্ধি বিদ্যমান। সে নিজেই ভাল এবং মন্দ কাজের জন্য নিজেকে দায়ী মনে করে। সে অন্যের সাথে যখন কোন খারাপ আচরণ করে তখন সে ব্যাপারে নিজের বিবেকের দংশনকে দমন করে আত্মতৃপ্তি লাভ করলেও অন্য কেউ যখন তার সাথে একই আচরণ করে তখন আপনা থেকেই তার বিবেক দাবী করে যে, এ ধরনের আচরণকারীর শাস্তি হওয়া উচিত। এখন কথা হলো, মানুষের নিজ সত্তার মধ্যেই যদি এ ধরনের একটি 'নফসে লাউওয়ামা' বা তিরস্কারকারী বিবেকের উপস্থিতি একটি অনস্বীকার্য সত্য হয়ে থাকে, তাহলে এ সত্যটিও অনস্বীকার্য যে, এ 'নফসে লাউয়ামা'ই মৃত্যুর পরের জীবনের এমন একটি প্রমাণ যা মানুষের আপন সত্তার মধ্যে বিদ্যমান। কেননা যেসব ভাল এবং মন্দ কাজের জন্য মানুষ দায়ী সেসব কাজের জন্য পুরস্কার বা শাস্তি তার অবশ্যই পাওয়া উচিত। এটাই প্রকৃতির স্বাভাবিক দাবী। কিন্তু মৃত্যুর পরের জীবন ছাড়া আর কোনভাবেই তার এ দাবী পূরণ হতে পারে না। মৃত্যুর পরে মানুষের সত্তা যদি বিলীন ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তাহলে তার অনেক ভাল কাজের পুরস্কার থেকে সে নিশ্চিতরূপে বঞ্চিত থেকে যাবে। আবার এমন অনেক মন্দ কাজ আছে যার ন্যায্য শাস্তি থেকে সে অবশ্যই নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে। বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন কোন মানুষই এ সত্য অস্বীকার করতে পারে না। অযৌক্তিক একটি বিশ্বে বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ জন্মলাভ করে বসেছে এবং নৈতিক উপলব্ধি সম্পন্ন মানুষ এমন এক পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে বসেছে মৌলিকভাবে যার পুরা ব্যবস্থাপনায় নৈতিকতার কোন অস্তিত্বই নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ এ অর্থহীন ও অযৌক্তিক কথাটি স্বীকার না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে মৃত্যুর পরের জীবনকে অস্বীকার করতে পারে না। একইভাবে পুনর্জন্ম বা জন্মান্তরবাদী দর্শন প্রকৃতির এ দাবীর যথার্থ জবাব নয়। কারণ মানুষ যদি নিজের নৈতিক কাজ-কর্মের পুরস্কার বা শাস্তিলাভের জন্য একের পর এক এ পৃথিবীতে জন্ম নিতে থাকে তাহলে প্রত্যেক জন্মে সে পুনরায় আরো কিছু নৈতিক কাজ-কর্ম করতে থাকবে যা নতুন করে পুরস্কার বা শাস্তির দাবী করবে। আর এ অন্তহীন ধারাবাহিকতার ঘূর্ণিপাকে পড়ে তার হিসেব-নিকেশের কোন ফায়সালা হবে না। বরং তা ক্রমাগত বাড়তেই থাকবে। সুতরাং প্রকৃতির এ দাবী কেবল একটি অবস্থায়ই পূরণ হতে পারে। তা হলো, এ পৃথিবীতে মানুষের একটি মাত্র জীবন হবে এবং গোটা মানব জাতির আগমনের ধারা শেষ হয়ে যাওয়ার পর আরেকটি জীবন হবে। সে জীবনে মানুষের সমস্ত কাজকর্ম যথাযথভাবে হিসেব-নিকেশ করে তাকে তার প্রাপ্য পুরো পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া হবে। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আ'রাফ, টীকা ৩০)

৩. কসম আকারে ওপরে বর্ণিত দু'টি দলীল শুধু দু'টি বিষয় প্রমাণ করে। এক, এ দুনিয়ার পরিসমাপ্তি (অর্থাৎ কিয়ামতের প্রথম পর্যায়) একটি নিশ্চিত ও অনিবার্য ব্যাপার।

দুই, মৃত্যুর পরে আরেকটি জীবন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ তা ছাড়া মানুষের একটি নৈতিক সত্তা হওয়ার যৌক্তিক ও প্রকৃতিগত দাবী পূরণ হতে পারে না। আর এ ব্যাপারটি অবশ্যই সংঘটিত হবে। মানুষের মধ্যে বিবেক থাকাটাই তা প্রমাণ করে। মৃত্যুর পরের জীবন যে সম্ভব একথা প্রমাণ করার জন্যই এ তৃতীয় দলীলটি পেশ করা হয়েছে। মক্কার যেসব লোক মৃত্যুর পরের জীবনকে অস্বীকার করতো তারা বার বার একথা বলতো যে, যেসব লোকের মৃত্যুর পর হাজার হাজার বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে, যাদের দেহের প্রতিটি অণু–পরমাণু মাটিতে মিশে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে, যাদের হাড়গোড় পচে গলে পৃথিবীর কত জায়গায় যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে তার কোন হদিস নেই, যাদের কেউ মরেছে আগুনে পুড়ে, কেউ হিংস্র জন্তুর আহারে পরিণত হয়েছে। আবার কেউ সমুদ্রে ডুবে মাছের খোরাক হয়েছে তাদের সবার দেহের বিভিন্ন অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ আবার একত্র হবে এবং প্রতিটি মানুষ আবার হুবহু সে মানুষটি হয়ে জীবনলাভ করবে, যে মানুষটি দশ–বিশ হাজার বছর আগে কোন এক সময় ছিল, এটা কি করে সম্ভব? মক্কার লোকদের এসব কথার জবাব আল্লাহ তা'আলা একটি ছোট প্রশ্নের আকারে অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য ও বলিষ্ঠভাবে দিয়েছেন। তিনি বলছেন ঃ "মানুষ কি মনে করছে যে, আমি তার হাড়গোড় আদৌ একত্রিত করতে পারবো না"? অর্থাৎ যদি তোমাদেরকে বলা হতো, তোমাদের দেহের বিক্ষিপ্ত এসব অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ কোন এক সময় আপনা থেকেই একত্রিত হয়ে যাবে এবং তোমরাও আপনা থেকেই হুবহু এই দেহ নিয়েই জীবিত হয়ে যাবে তাহলে এরূপ হওয়াটাকে অসম্ভব মনে করা তোমাদের জন্য নিসন্দেহে যুক্তিসংগত হতো। কিন্তু তোমাদের তো বলা হয়েছে এ কাজটি আপনা থেকেই হবে না। বরং তা করবেন আল্লাহ তা'আলা নিজে। তাহলে কি তোমরা প্রকৃতপক্ষেই মনে করো যে, সারা বিশ্ব–জাহানের সৃষ্টিকর্তা—যাকে তোমরা নিজেরাও সৃষ্টিকর্তা বলে স্বীকার করে থাকো—এ কাজ করতে অক্ষম? এটি এমন একটি প্রশ্ন যে, যারা আল্লাহ তা'আলাকে বিশ্ব–জাহানের স্রষ্টা বলে স্বীকার করে, সে যুগেও তারা বলতে পারতো না এবং বর্তমান যুগেও বলতে পারে না যে, আল্লাহ তা'আলা নিজেও এ কাজ করতে চাইলে করতে পারবেন না। আর কোন নির্বোধ যদি এমন কথা বলেও ফেলে তাহলে তাকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে যে, তুমি আজ যে দেহের অধিকারী তার অসংখ্য অঙ্গ–প্রত্যঙ্গকে বাতাস, পানি, মাটি এবং অজ্ঞাত আরো কত জায়গা থেকে এনে একত্রিত করে সে আল্লাহ এ দেহটি কিভাবে তৈরী করলেন যার সম্পর্কে তুমি বলছো যে, তিনি পুনরায় এসব অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ একত্রিত করতে সক্ষম নন?

৪. অর্থাৎ বড় বড় হাড়গুলো একত্রিত করে পুনরায় তোমার দেহের কাঠামো প্রস্তুত করা এমন কিছুই নয়। আমি তো তোমার দেহের সূক্ষ্মতম অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ এমনকি তোমার আঙ্গুলের জোড়গুলোও পুনরায় ঠিক তেমন করে বানাতে সক্ষম যেমন তা এর আগে ছিল।

৫. এ ছোট বাক্যটিতে আখেরাত অবিশ্বাসকারীদের আসল রোগ কি তা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে। যেসব জিনিস এসব লোককে আখেরাত অস্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ করতো তা মূলত এ নয় যে, প্রকৃতই তারা কিয়ামত ও আখেরাতকে অসম্ভব মনে করতো। বরং তারা যে কিয়ামত ও আখেরাতকে অস্বীকার করে তার মূল কারণ হলো, আখেরাতকে মেনে নিলে তাদের ওপর অনিবার্যভাবে কিছু নৈতিক বাধ্যবাধকতা আরোপিত

হয়। সে বাধ্যবাধকতা মেনে নেয়া তাদের কাছে মোটেই মনঃপুত নয়। তারা চায় আজ পর্যন্ত তারা পৃথিবীতে যেরূপ লাগামহীন জীবন যাপন করে এসেছে ভবিষ্যতেও ঠিক তেমনি করতে পারে। আজ পর্যন্ত তারা যে ধরনের জুলুম-অত্যাচার, বেঈমানী, পাপাচার ও দুষ্কর্ম করে এসেছে ভবিষ্যতেও তা করার অবাধ স্বাধীনতা যেন তাদের থাকে। একদিন তাদেরকে আল্লাহর বিচারালয়ে দাঁড়িয়ে এসব কাজের জবাবদিহি করতে হবে এ বিশ্বাস যেন তাদের অবৈধ লাগামহীন স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতার পথ রোধ করতে না পারে। তাই প্রকৃতপক্ষে তাদের বিবেক-বুদ্ধি তাদেরকে আখেরাতের প্রতি ঈমান আনতে বাধা দিচ্ছে না। বরং তাদের প্রবৃত্তির কামনা বাসনাই এ পথের প্রতিবন্ধক।

৬. এ প্রশ্ন প্রকৃতপক্ষে জানার জন্যে নয়। বরং তা অস্বীকৃতিমূলক ও বিদ্রূপাত্মক প্রশ্ন অর্থাৎ কিয়ামত কবে আসবে তা জানতে চায়নি তারা। বরং তারা একথা বলছিলো বিদ্রূপ করে যে, জনাব, আপনি যে দিনটির আসার খবর দিচ্ছেন তা আসার পথে আবার কোথায় আটকে রইলো?

৭. মূল আয়াতে بـرق الـبـصـر শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হলো বিদ্যুতের ঝলকে চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়া। কিন্তু প্রচলিত আরবী বাকরীতিতে একথাটি শুধু এ একটি অর্থ জ্ঞাপকই নয়। বরং ভীতি-বিহবলতা, বিস্ময় অথবা কোন দুর্ঘটনার আকস্মিকতায় যদি কেউ হতবুদ্ধি হয়ে যায় এবং সে ভীতিকর দৃশ্যের প্রতি তার চক্ষু স্থির-নিবদ্ধ হয়ে যায় যা সে দেখতে পাচ্ছে তাহলে এ অবস্থা বুঝাতেও একথাটি বলা হয়ে থাকে। একথাটিই কুরআন মজীদের আরেক জায়গায় এভাবে বলা হয়েছেঃ

إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ

"আল্লাহ তো তাদের অবকাশ দিচ্ছেন সেদিন পর্যন্ত যেদিন চক্ষুসমূহ স্থির হয়ে যাবে।" (সূরা ইবরাহীম, ৪২)

৮. এটা কিয়ামতের প্রথম পর্যায়ে বিশ্ব-জাহানের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ। চাঁদের আলোহীন হয়ে যাওয়া এবং চাঁদ ও সূর্যের পরস্পর একাকার হয়ে যাওয়ার অর্থ এও হতে পারে যে, সূর্য থেকে প্রাপ্ত চাঁদের আলোই শুধু ফুরিয়ে যাবে না। বরং সূর্য নিজেও অন্ধকার হয়ে যাবে এবং আলোহীন হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে উভয়ের অবস্থা হবে একই। দ্বিতীয় অর্থ এও হতে পারে যে, হঠাৎ পৃথিবী উল্টা দিকে চলতে শুরু করবে এবং সেদিন চাঁদ ও সূর্য একই সাথে পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। এর তৃতীয় আরেকটি অর্থ এও গ্রহণ করা যেতে পারে যে, চাঁদ অকস্মাত পৃথিবীর মহাকর্ষ থেকে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে যাবে এবং সূর্যের ওপরে গিয়ে আছড়ে পড়বে। এ ছাড়া এর আরো কোন অর্থ হতে পারে যা বর্তমানে আমাদের বোধগম্য নয়।

৯. মূল বাক্যটি হলো بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ । এটা একটা ব্যাপক অর্থব্যঞ্জক বাক্য। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে এবং সম্ভবত সবগুলোই এখানে প্রযোজ্য। এর একটি অর্থ হলো, দুনিয়ার জীবনে মানুষ মৃত্যুর পূর্বে কি কি নেক কাজ বা বদ কাজ করে আখেরাতের জন্য অগ্রিম পাঠিয়ে দিয়েছিল সেদিন তাকে তা জানিয়ে দেয়া হবে। আর দুনিয়াতে সে নিজের ভাল এবং মন্দ কাজের কি ধরনের প্রভাব সৃষ্টি করে এসেছিল যা তার দুনিয়া ছেড়ে চলে আসার পরও পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত চলেছিল সে হিসেবও তার

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿١٦﴾ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ
فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴿١٨﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿١٩﴾ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ﴿٢٠﴾ وَتَذَرُونَ
الْآخِرَةَ ﴿٢١﴾ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴿٢٤﴾

হে নবী,[১১] এ অহীকে দ্রুত আয়ত্ত করার জন্য তোমার জিহবা দ্রুত সঞ্চালন করো না। তা মুখস্ত করানো ও পড়ানো আমারই দায়িত্ব। তাই আমি যখন তা পড়ি[১২] তখন এর পড়া মনযোগ দিয়ে শুনবে। অতপর এর অর্থ বুঝিয়ে দেয়াও আমার দায়িত্ব।[১৩] কখ্‌খনো না[১৪] আসল কথা হলো, তোমরা দ্রুত লাভ করা যায় এমন জিনিসকেই (অর্থাৎ দুনিয়া) ভালবাস এবং আখেরাতকে উপেক্ষা করে থাক।[১৫] সেদিন কিছু সংখ্যক চেহারা তরতাজা থাকবে।[১৬] নিজের রবের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে।[১৭] আর কিছু সংখ্যক চেহারা থাকবে উদাস–বিবর্ণ।

সামনে পেশ করা হবে। দ্বিতীয় অর্থ হলো, তার যা কিছু করা উচিত ছিল অথচ সে তা করেনি আর যা কিছু করা উচিত ছিল না অথচ সে তা করেছে তাও সব তাকে জানিয়ে দেয়া হবে। তৃতীয় অর্থ হলো, যেসব কাজ সে আগে করেছে এবং যেসব কাজ সে পরে করেছে দিন তারিখ সহ তার পুরো হিসেব তার সামনে পেশ করা হবে। চতুর্থ অর্থ হলো, যেসব ভাল বা মন্দ কাজ সে করেছে তাও তাকে জানিয়ে দেয়া হবে। আর যেসব ভাল বা মন্দ কাজ করা থেকে সে বিরত থেকেছে তাও তাকে অবহিত করা হবে।

১০. মানুষের সামনে তার আমলনামা পেশ করার উদ্দেশ্য আসলে অপরাধীকে তার অপরাধ সম্পর্কে অবহিত করা নয়। বরং এরূপ করা জরুরী এই কারণে যে, প্রকাশ্য আদালতে অপরাধের প্রমাণ পেশ করা ছাড়া ইনসাফের দাবী পূরণ হয় না। প্রত্যেক মানুষই জানে, সে নিজে কি? সে কি, একথা তাকে অন্য কারো বলে দিতে হয় না। একজন মিথ্যাবাদী গোটা দুনিয়াকে ধোঁকা দিতে পারে। কিন্তু সে নিজে একথা জানে যে, সে যা বলছে তা মিথ্যা। একজন চোর তার চৌর্যবৃত্তিকে ঢাকার জন্য অসংখ্য কৌশল অবলম্বন করতে পারে। কিন্তু সে যে চোর তা তার নিজের কাছে গোপন থাকে না। একজন পথভ্রষ্ট লোক হাজারো প্রমাণ পেশ করে মানুষকে একথা বিশ্বাস করাতে পারে যে, সে যে কুফরী, নাস্তিকতা ও শিরকের সমর্থক তা তার মনের বিশ্বাসভিত্তিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু তার নিজের বিবেক একথা ভাল করেই জানে যে, সে ঐ সব আকীদা–বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে আছে কেন এবং তার মধ্যকার ভুল বুঝতে ও মেনে নিতে কিসে তাকে বাধা দিচ্ছে? জালেম, অসচ্চরিত্র, দুষ্কর্মশীল এবং হারামখোর মানুষ নিজের অপকর্মের পক্ষে নানা রকম ওজর–আপত্তি ও কৌশল পেশ করে নিজের বিবেকের মুখ পর্যন্ত বন্ধ করার চেষ্টা চালাতে পারে যাতে বিবেক তাকে তিরস্কার করা থেকে বিরত থাকে এবং স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, সত্যিকারভাবেই কিছু বাধ্যবাধকতা, কিছু বৃহত্তর কল্যাণ এবং কিছু অনিবার্য প্রয়োজনে সে এসব করছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সর্বাবস্থায় তার এটা জানা থাকে যে,

সে কার প্রতি কতটা জুলুম করেছে, কার হক মেরে খেয়েছে, কার সতীত্ব নষ্ট করেছে, কাকে প্রতারণা করেছে এবং কোন্ অবৈধ পন্থায় কি কি স্বার্থ উদ্ধার করেছে। তাই আখেরাতের আদালতে হাজির করার সময় প্রত্যেক কাফের, মুনাফিক, পাপী ও অপরাধী নিজেই বুঝতে পারবে যে, সে কি কাজ করে এসেছে এবং কোন অবস্থায় নিজ প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

১১. এখান থেকে শুরু করে "এর অর্থ বুঝিয়ে দেয়াও আমার দায়িত্ব" কথাটি পর্যন্ত পুরা বাক্যটি একটি ভিন্ন প্রসংগের বাক্য, যা মূল কথার ধারাবাহিকতা ছিন্ন করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে। আমরা সূরার ভূমিকাতেই উল্লেখ করেছি যে, নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগে—যে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অহী গ্রহণ করার অভ্যাস পুরোপুরি রপ্ত হয়নি—যখন তাঁর ওপর অহী নাযিল হতো তখন তিনি আশংকা করতেন যে, আল্লাহর যে বাণী জিবরাঈল আলাইহিস সালাম তাঁকে শুনাচ্ছেন তা হয়তো তিনি ঠিকমত স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারবেন না। তাই অহী শোনার সাথে সাথে তিনি তা মুখস্থ করার চেষ্টা করতেন। জিবরাঈল আলাইহিস সালাম যখন সূরা কিয়ামার এ আয়াতগুলো তাঁকে শুনাচ্ছিলেন তখনও ঠিক একই অবস্থার সৃষ্টি হয়। তাই কথার ধারাবাহিকতা ছিন্ন করে তাঁকে বলা হয় যে, আপনি অহীর কথা মুখস্থ করার চেষ্টা করবেন না, বরং গভীর মনযোগ সহকারে তা শুনতে থাকুন। তা স্মরণ করানো এবং পরবর্তী সময়ে আপনাকে তা পড়িয়ে দেয়া আমার দায়িত্ব। আপনি নিশ্চিত থাকুন, এ বাণীর একটি শব্দও আপনি ভুলবেন না এবং তা উচ্চারণ করা বা পড়ার ব্যাপারে আপনার কোন ভুল হবে না। এ নির্দেশনামা দেয়ার পর পুনরায় মূল কথার ধারাবাহিকতা "কখনো না, আসল কথা হলো" কথাটি দ্বারা শুরু হয়েছে। যারা এ পটভূমি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয় তারা এখানে এ বাক্যাংশ দেখে মনে করে যে, এখানে একথাটি একেবারেই খাপ ছাড়া। কিন্তু এ পটভূমি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর কথার মধ্যে কোন অসংলগ্নতা আছে বলে মনে হয় না। এর উদাহরণ এভাবে দেয়া যায়, একজন শিক্ষক পাঠদানের সময় হঠাৎ দেখলেন যে, তাঁর ছাত্রের মন অন্য কোন দিকে আকৃষ্ট। তাই তিনি পাঠ দানের ধারাবাহিকতা ছিন্ন করে বললেন ঃ "আমার কথা মনযোগ দিয়ে শোন।" এরপর তিনি পুনরায় নিজের কথা শুরু করলেন। এ পাঠ দান যদি হুবহু ছাপিয়ে প্রকাশ করা হয় তাহলে যেসব লোক এ ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নন তারা বক্তৃতার ধারাবাহিকতার মধ্যে একথাটাকে খাপছাড়া মনে করবেন। কিন্তু যে কারণে একথাটি বাক্যের মধ্যে সংযোজিত হয়েছে যে ব্যক্তি সে আসল ঘটনা সম্পর্কে অবহিত থাকবেন তিনি নিশ্চিত হয়ে যাবেন যে, পাঠ দানের বক্তব্যটি আসলে হুবহু উদ্ধৃত করা হয়েছে। তা বর্ণনা বা উদ্ধৃত করতে কোন প্রকার কমবেশী করা হয়নি।

এসব আয়াতের মাঝখানে এ বাক্যাংশটির অপ্রাসঙ্গিকভাবে আনারও যে কারণ আমরা ওপরে বিশ্লেষণ করেছি তা শুধু অনুমান নির্ভর নয়। বরং নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াতসমূহে তার এ একই কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে জারীর, তাবারানী, বায়হাকী এবং অন্যসব মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন সনদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের এ বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন যে, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি কুরআন নাযিল হতো তখন পাছে তিনি ভুলে যান এ ভয়ে

জিবরাঈল আলাইহিস সালামের সাথে কথাগুলো বার বার আওড়াতে থাকতেন। তাই বলা হয়েছে.......... لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ শা'বী, ইবনে যায়েদ, দ্বাহ্হাক, হাসান বাসরী, কাতাদা, মুজাহিদ এবং আরো অনেক বড় বড় মুফাস্সির থেকেও একথাটিই উদ্ধৃত হয়েছে।

১২. জিবরাঈল আলাইহিস সালাম যদিও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কুরআন পাঠ করে শুনাতেন। কিন্তু যেহেতু তিনি নিজের পক্ষ থেকে তা শুনাতেন না, বরং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে পড়ে শুনাতেন। তাই একথাটিও আল্লাহ তা'আলাই বলেছেন ঃ "যখন আমি তা পাঠ করতে থাকবো।"

১৩. এ থেকে ধারণা জন্মে যে, সম্ভবত নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগেই অহী নাযিল হওয়ার সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের কোন আয়াত অথবা কোন শব্দ অথবা কোন বিষয়ের অর্থ জিবরাঈল আলাইহিস সালামের কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতেন। তাই তাঁকে শুধু এ নির্দেশই দেয়া হয়নি যে, যখন অহী নাযিল হতে থাকবে তখন নিরবে তিনি তা শুনবেন, কিংবা শুধু এ নিশ্চয়তা ও সান্ত্বনাই দেয়া হয়নি যে, অহীর প্রতিটি শব্দ তাঁর স্মৃতিতে অবিকল সংরক্ষিত করে দেয়া হবে এবং কুরআনকে তিনি ঠিক সেভাবে পাঠ করতে সক্ষম হবেন যেভাবে তা নাযিল হয়েছে। বরং সাথে সাথে তাঁকে প্রতিশ্রুতিও দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার প্রতিটি নির্দেশ ও বাণীর মর্ম এবং উদ্দেশ্যও তাঁকে পুরোপুরি বুঝিয়ে দেয়া হবে।

এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আয়াত। এ আয়াত দ্বারা এমন কয়েকটি মৌলিক বিষয় প্রমাণিত হয়, যা কোন ব্যক্তি ভালভাবে বুঝে নিলে এমন কিছু গোমরাহী থেকে রক্ষা পেতে পারে যা ইতিপূর্বেও কিছুলোক ছড়িয়েছে এবং বর্তমানেও ছড়াচ্ছে।

প্রথমত, এ আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, শুধু কুরআনে লিপবদ্ধ অহী–ই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিল হতো না। বরং এ অহী ছাড়াও তাঁর প্রতি আরো অহী নাযিল হতো এবং সে অহীর মাধ্যমে তাঁকে এমন জ্ঞান দেয়া হতো যা কুরআনে লিপিবদ্ধ নেই। তাই কুরআনের হুকুম–আহকাম ও নির্দেশাবলী, তার ইংগিত, তার শব্দমালা এবং তার বিশেষ পরিভাষার যে অর্থ ও মর্ম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হতো তা যদি কুরআনের মধ্যেই সংযোজিত থাকবে তাহলে একথা বলার কোন প্রয়োজনই ছিল না যে, তার অর্থ বুঝিয়ে দেয়া বা তার ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ করে দেয়া আমারই দায়িত্ব। কারণ এমতাবস্থায় তা আবার কুরআনের মধ্যেই পাওয়া যেতো। অতএব, একথা মানতে হবে যে, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে কুরআনের শব্দমালা বহির্ভূত অন্য কিছু। এটা "অহীয়ে খফীর" আরো একটি প্রমাণ যা খোদ কুরআন থেকেই পাওয়া যায়। (কুরআন মজীদ থেকে এর আরো প্রমাণ আমি আমার "সুন্নাত কি আইনী হাইসিয়াত" গ্রন্থের ৯৪–৯৫ এবং ১১৮ থেকে ১২৫ পৃষ্ঠায় তুলে ধরেছি।)

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কুরআনের অর্থ ও মর্ম এবং হুকুম–আহকামের যে ব্যাখ্যা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছিল তা তো এ জন্যই দেয়া হয়েছিল যে, তিনি তদনুযায়ী নিজের কথা ও কাজ দ্বারা মানুষকে কুরআন

বুঝিয়ে দেবেন এবং তার আদেশ–নিষেধ অনুযায়ী কাজ করা শেখাবেন। একথার মর্ম ও অর্থ যদি তা না হয় এবং নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যদি শুধু এ জন্য এ ব্যাখ্যা বলে দেয়া হয়ে থাকে যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে নিজের কাছেই সে জ্ঞান সীমাবদ্ধ রাখবেন তাহলে এটা হতো একটা অর্থহীন কাজ। কারণ, নবুওয়াতের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে তা থেকে কোন সাহায্যই পাওয়া যেতো না। সুতরাং কোন নির্বোধই কেবল একথা বলতে পারে যে, ব্যাখ্যামূলক এ জ্ঞানের শরীয়াতের বিধান রচনার ক্ষেত্রে আদৌ কোন ভূমিকা ছিল না। সূরা 'নাহ্লের" ৪৪ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নিজেই বলেছেন ঃ

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ

"হে নবী, আমি তোমার কাছে এ 'যিকর' নাযিল করেছি এ জন্য, যেন তুমি মানুষের জন্য নাযিলকৃত শিক্ষার ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ করতে থাকো।" (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন নাহ্ল, টীকা ৪০)

কুরআন মজীদের চারটি স্থানে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাজ শুধু আল্লাহর কিতাবের আয়াতসমূহ শুনিয়ে দেয়াই ছিল না। বরং এ কিতাবের শিক্ষা দেয়াও ছিল তাঁর দায়িত্বের অন্তরভুক্ত। (আল বাকারাহ, আয়াত ১২৯ ও ১৫১; আলে ইমরান, ১৬৪ এবং আল জুম'আ, ২। আমি 'সুন্নাত কি আইনী হাইসিয়াত' গ্রন্থের ৭৪ থেকে ৭৭ পৃষ্ঠায় এসব আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছি।) এরপর কোন মানুষ কি করে একথা অস্বীকার করতে পারে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে কুরআনের যে ব্যাখ্যা পেশ করেছেন তা–ই প্রকৃতপক্ষে কুরআনের সঠিক, নির্ভরযোগ্য ও সরকারী ব্যাখ্যা। কেননা, তা তাঁর নিজের মনগড়া ব্যাখ্যা নয়, বরং কুরআন নাযিলকারী আল্লাহর বলে দেয়া ব্যাখ্যা। এ ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে কিংবা তা পাশ কাটিয়ে যে ব্যক্তিই কুরআনের কোন আয়াতের অথবা কোন শব্দের মনগড়া অর্থ বর্ণনা করে সে এমন ধৃষ্টতা দেখায় যা কোন ঈমানদার ব্যক্তি দেখাতে পারে না।

তৃতীয়ত, কেউ যদি সাধারণভাবেও কুরআন অধ্যয়ন করে থাকে তাহলেও সে দেখবে যে, তাতে এমন অনেক বিষয় আছে একজন আরবী জানা লোক শুধু কুরআনের শব্দ বা বাক্য পড়ে তার অর্থ বা মর্ম উদ্ধার করতে এবং তার মধ্যে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা কিভাবে মেনে চলবে তা জানতে পারবে না। উদাহরণ হিসেবে صلوة (সালাত) শব্দটির কথাই ধরুন। কুরআন মজীদে যদি ঈমানের পরে অন্য কোন আমলের ওপরে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়ে থাকে তবে তা হলো সালাত বা নামায। কিন্তু কেবল আরবী ভাষার সাহায্যে কেউ এর অর্থ পর্যন্ত নির্ণয় করতে পারতো না। কুরআন মজীদে এ শব্দটির বার বার উল্লেখ দেখে কেউ বড়জোর এতটুকু বুঝতে সক্ষম যে, আরবী ভাষার এ শব্দটিকে কোন বিশেষ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এর অর্থ সম্ভবত এমন কোন বিশেষ কাজ যা আঞ্জাম দেয়ার জন্য ঈমানদারদের কাছে দাবী জানানো হচ্ছে। কিন্তু শুধু কুরআন পাঠ করে কোন আরবী জানা লোক এ সিদ্ধান্তে পৌছতে সক্ষম হবে না যে, সে বিশেষ কাজটি কি এবং কিভাবে তা আঞ্জাম দিতে হবে। এখন প্রশ্ন হলো, কুরআন

প্রেরণকারী যদি তাঁর পক্ষ থেকে একজন শিক্ষক নিয়োগ করে এ পারিভাষিক অর্থ তাঁকে যথাযথভাবে না বলে দিতেন এবং 'সালাত' আদায় করার নির্দেশ পালনের পন্থা–পদ্ধতি স্পষ্টভাবে তাঁকে না শেখাতেন তাহলে দুনিয়াতে দু'জন মুসলমানও এমন পাওয়া যেতো না যারা শুধু কুরআন পাঠ করে 'সালাত' আদায় করার নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে কোন একটি পন্থা মেনে নিতে একমত হতে পারতো? দেড় হাজার বছর ধরে মুসলমানরা যে পুরুষাণুক্রমে একই নিয়ম ও পন্থায় নামায পড়ে আসছে এবং দুনিয়ার আনাচে–কানাচে কোটি কোটি মুসলমান একই নিয়ম–পন্থায় যেভাবে নামাযের হুকুম পালন করছে তার কারণ তো শুধু এই যে, মহান আল্লাহ অহীর মাধ্যমে শুধু কুরআনের শব্দ বা বাক্যই নাযিল করেননি। বরং ঐ সব শব্দ এবং বাক্যের অর্থ এবং মর্মও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পুরোপুরি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। আর যারা তাঁকে আল্লাহর রসূল এবং কুরআনকে আল্লাহর কিতাব হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন তিনি সেসব লোককেই এর অর্থ ও মর্ম শিক্ষা দিয়েছিলেন।

চতুর্থত, কুরআনের শব্দসমূহের যে ব্যাখ্যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূলকে (সা) বুঝিয়েছেন এবং রসূল (সা) তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে উম্মতকে যে শিক্ষা দিয়েছেন, হাদীস এবং সুন্নাত ছাড়া তা জানার আর কোন উপায় আমাদের কাছে নেই। হাদীস বলতে বুঝায় নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা ও কাজ সম্পর্কে যেসব বর্ণনা সনদসহ তৎকালীন লোকদের নিকট থেকে আমাদের কালের লোকদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। আর সুন্নাত বলতে বুঝায় সেসব নিয়ম–কানুনকে যা নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৌখিক ও বাস্তব শিক্ষার দ্বারা মুসলিম সমাজের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনে চালু হয়েছে, যার বিস্তারিত বিবরণ নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াতের মাধ্যমে পূর্ববর্তী লোকদের নিকট থেকে পরবর্তী লোকেরা লাভ করেছে এবং পরবর্তী যুগের লোকেরা পূর্ববর্তী যুগের লোকদের মধ্যে তা কার্যকর হতে দেখেছে। জ্ঞানের এ উৎসকে যে ব্যক্তি অস্বীকার করে প্রকারান্তরে সে যেন একথাই বলে ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ বলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূলকে (সা) কুরআনের অর্থ ও মর্ম বুঝিয়ে দেয়ার যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তা পূরণ করতে (না'উযুবিল্লাহ) তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ, শুধু রসূলকে ব্যক্তিগতভাবে কুরআনের অর্থ বুঝিয়ে দেয়ার জন্য এ দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়েছিল না। বরং এর উদ্দেশ্য ছিল রসূলের মাধ্যমে উম্মতকে আল্লাহর কিতাবের অর্থ বুঝানো। হাদীস ও সুন্নাত আইনের উৎস একথা অস্বীকার করলে আপনা থেকেই তার অনিবার্য অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আল্লাহ তা'আলা সে দায়িত্ব পালন করতে পারেননি। না'উযুবিল্লাহ! এর জবাবে যারা বলে যে, অনেক লোক তো মিথ্যা হাদীস রচনা করেছিল, তাকে আমরা বলবো, মিথ্যা হাদীস রচনা করাই সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে গোটা মুসলিম উম্মাহ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা ও কাজকে আইনের মর্যাদা দান করতো। তা না হলে গোমরাহী বিস্তারকারীদের মিথ্যা হাদীস রচনার প্রয়োজন হবে কেন? মুদ্রা জালকারীরা কেবল সে মুদ্রাই জাল করে যা বাজারে চালু থাকে। বাজারে যেসব নোটের কোন মূল্য নেই কে এমন নির্বোধ আছে যে, সেসব নোট জাল করে ছাপাবে? তাছাড়াও এ ধরনের কথা যারা বলে তারা হয়তো জানে না যে, যে পবিত্র সত্তার (সা) কথা ও কাজ আইনের মর্যাদা সম্পন্ন তাঁর সাথে যাতে কোন মিথ্যা কথা সম্পর্কিত হতে না পারে প্রথম দিন থেকেই মুসলিম উম্মাহ গুরুত্বসহ সে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। এ পবিত্র

সত্তার (সা) প্রতি কোন মিথ্যা কথা আরোপের আশংকা যতই বৃদ্ধি পাচ্ছিল এ উম্মতের কল্যাণকামীরা তত অধিক মাত্রায় কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করছিলেন সত্য ও মিথ্যাকে আলাদা করে চিহ্নিত করার জন্য। সত্য ও মিথ্যা হাদীস পৃথকীকরণের এ জ্ঞান এমন একটি অত্যুচ্চ পর্যায়ের জ্ঞান যা একমাত্র মুসলিম জাতি ছাড়া আজ পর্যন্ত পৃথিবীর আর কেউ আবিষ্কার করেনি। যারা এ জ্ঞান অর্জন না করেই শুধু মাত্র পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদদের প্রতারণা ও প্রলোভনের শিকার হয়ে হাদীস ও সুন্নাতকে অনির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করে এবং একথাও জানে না যে, তারা তাদের এ মূর্খতানির্ভর ধৃষ্টতা দ্বারা ইসলামের কত মারাত্মক ক্ষতি সাধন করছে। তারা আসলেই বড় হতভাগা।

১৪. মাঝের অপ্রাসংগিক কথাটির আগে বক্তব্যের যে ধারাবাহিকতা ছিল এখানে এসে আবার সে ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে। কখখ্নো না, অর্থ হলো, তোমাদের আখেরাতকে অস্বীকার করার আসল কারণ এটা নয় যে, বিশ্ব–জাহানের সৃষ্টিকর্তা কিয়ামত সংঘটিত করতে কিংবা মৃত্যুর পর তোমাদেরকে আবার জীবিত করতে পারবেন না বলে তোমরা মনে করো বরং আসল কারণ হলো এটি।

১৫. এটি আখেরাতকে অস্বীকার করার দ্বিতীয় কারণ। প্রথম কারণটি ৫নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছিল। কারণটি হলো, মানুষ যেহেতু অবাধে পাপাচার চালাতে চায় এবং আখেরাতকে মেনে নিলে অনিবার্যরূপে যেসব নৈতিক বিধিবন্ধন মেনে চলার দায়িত্ব বর্তায় তা থেকে বাঁচতে চায়। তাই তার কুপ্রবৃত্তি তাকে আখেরাতকে অস্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং তার এ অস্বীকৃতিকে যুক্তিসংগত বলে প্রমাণ করার জন্য সে সুন্দর করে সাজিয়ে যৌক্তিক প্রমাণাদি পেশ করে। এখন দ্বিতীয় কারণটি বর্ণনা করা হচ্ছে। আখেরাত অস্বীকারকারীরা যেহেতু সংকীর্ণমনা ও স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন হয় তাই তাদের দৃষ্টি কেবল এ দুনিয়ার ফলাফলের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। আর আখেরাতে যে ফলাফলের প্রকাশ ঘটবে তাকে তারা আদৌ কোন গুরুত্ব দেয় না। তারা মনে করে, যে স্বার্থ বা ভোগের উপকরণ বা আনন্দ এখানে লাভ করা সম্ভব তারই অন্বেষণে সবটুকু পরিশ্রম করা এবং প্রচেষ্টা চালানো উচিত। কারণ, তা যদি তারা লাভ করে তাহলে যেন সবকিছুই তারা পেয়ে গেল। এতে আখেরাতে তাদের পরিণাম যত খারাপই হোক না কেন। একইভাবে তারা এ ধারণাও পোষণ করে যে, যে ক্ষতি, কষ্ট বা দুঃখ–বেদনা এখানে হবে তা থেকে মূলত নিজেদের রক্ষা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে দেখার দরকার নেই যে, তা বরদাশত করে নিলে আখেরাতে তার বিনিময়ে কত বড় পুরস্কার লাভ করা যাবে। তারা চায় নগদ সওদা। আখেরাতের মত বহু দূরের জিনিসের জন্য তারা আজকের কোন স্বার্থ যেমন ছাড়তে চায় না তেমনি কোন ক্ষতিও বরদাশত করতে পারে না। এ ধরনের চিন্তাধারা নিয়ে যখন তারা আখেরাত সম্পর্কে যৌক্তিক বিতর্কে অবতীর্ণ হয় তখন আর তা খাঁটি যুক্তিবাদ থাকে না। বরং তখন তার পেছনে এ ধ্যান–ধারণাটিই কাজ করতে থাকে। আর সে কারণে সর্বাবস্থায় তার সিদ্ধান্ত এটাই থাকে যে, আখেরাতকে মানা যাবে না। যদিও ভেতর থেকে তার বিবেক চিৎকার করে বলতে থাকে যে, আখেরাত সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা এবং তার অনিবার্যতা সম্পর্কে কুরআনে যেসব দলীল–প্রমাণ পেশ করা হয়েছে তা অত্যন্ত যুক্তিসংগত আর তার বিপক্ষে যেসব যুক্তি তারা দেখাচ্ছে তা অত্যন্ত ভোঁতা ও অন্তসার–শূন্য।

১৬. অর্থাৎ খুশীতে তারা দীপ্তিময় হয়ে উঠবে। কারণ, তারা যে আখেরাতের প্রতি ঈমান এনেছিল তা হুবহু তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী চোখের সামনে বিদ্যমান থাকবে। যে আখেরাতের প্রতি ঈমান আনার কারণে তারা দুনিয়ার যাবতীয় অবৈধ স্বার্থ পরিত্যাগ করেছিল এবং সত্যিকার অর্থেই ক্ষতি স্বীকার করেছিল তা চোখের সামনে বাস্তবে সংঘটিত হতে দেখে নিশ্চিত হয়ে যাবে যে, তারা নিজেদের জীবনাচরণ সম্পর্কে অত্যন্ত সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। এখন তার সর্বোত্তম ফলাফল দেখার সময় এসে গেছে।

১৭. মুফাস্সিরগণের কেউ কেউ একথাটিকে রূপক অর্থে গ্রহণ করেছেন। তারা বলেন ঃ "কারো প্রতি তাকিয়ে থাকা" কথাটি প্রচলিত প্রবাদ হিসেবে তার কাছে কোন কিছু আশা করা, তার সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করা এবং তার দয়া প্রার্থী হওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়। এমন কি অন্ধ ব্যক্তিও অনেক সময় বলে যে, আমি তো অমুকের দিকে তাকিয়ে আছি, তিনি আমার জন্য কি করেন তা দেখার জন্য। কিন্তু বহু সংখ্যক হাদীসে এর যে ব্যাখ্যা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে তাহলো, আখেরাতে আল্লাহর নেক্‌কার বান্দাদের আল্লাহর সাক্ষাত লাভের সৌভাগ্য হবে। বুখারী শরীফের বর্ণনায় আছে ঃ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا "তোমরা প্রকাশ্যে সুস্পষ্টভাবে তোমাদের রবকে দেখতে পাবে।" মুসলিম এবং তিরমিযীতে হযরত সুহাইব থেকে বর্ণিত হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বেহেশতবাসীরা বেহেশতে প্রবেশ করার পর আল্লাহ তা'আলা তাদের জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কি চাও যে, আমি তোমাদের আরো কিছু দান করি? তারা আরয করবে, আপনি কি আমাদের চেহারা দীপ্তিময় করেননি? আপনি কি আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করাননি এবং জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেননি? তখন আল্লাহ তা'আলা পর্দা সরিয়ে দেবেন। ইতিপূর্বে তারা যেসব পুরস্কার লাভ করেছে তার কোনটিই তাদের কাছে তাদের 'রবের' সাক্ষাতলাভের সম্মান ও সৌভাগ্য থেকে অধিক প্রিয় হবে না। এটিই সে অতিরিক্ত পুরস্কার যার কথা কুরআনে এভাবে বলা হয়েছে ঃ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ অর্থাৎ "যারা নেক কাজ করেছে তাদের জন্য উত্তম পুরস্কার রয়েছে। আর এ ছাড়া অতিরিক্ত পুরস্কারও রয়েছে।" (ইউনুস, ২৬) বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবু সাঈদ খুদরী এবং হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রসূল, আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদের রবকে দেখতে পাবো? জবাবে নবী (সা) বললেন ঃ যখন মেঘের আড়াল থাকে না তখন সূর্য ও চাঁদকে দেখতে তোমাদের কি কোন কষ্ট হয়? সবাই বললো 'না।' তিনি বললেন ঃ তোমরা তোমাদের রবকে এ রকমই স্পষ্ট দেখতে পাবে। বুখারী ও মুসলিমে হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ থেকে এ বিষয়ের প্রায় অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, দারকুতনী, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, তাবারানী, বায়হাকী, ইবনে আবী শায়বা এবং আরো কিছু সংখ্যক মুহাদ্দিস কিছুটা শাব্দিক তারতম্যসহ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরের একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, যার বিষয়বস্তু হলো, জান্নাতবাসীদের মধ্যে সর্বনিম্ন মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিও দুই হাজার বছরের দূরত্ব পর্যন্ত তার সাম্রাজ্যের বিস্তার দেখতে পাবে এবং সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি প্রতিদিন দুই বার তার রবকে দেখতে পাবে। একথা বলার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতটি পাঠ করলেন যে, 'সেদিন কিছু সংখ্যক চেহারা তরতাজা থাকবে। নিজের রবের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে।' ইবনে মাজাতে হযরত

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণিত একটি হাদীসে আছে যে, আল্লাহ তাদের প্রতি তাকাবেন আর তারাও আল্লাহর প্রতি তাকাবে। অতপর যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে অন্তর্হিত না হবেন ততক্ষণ তারা জান্নাতের কোন নিয়ামতের প্রতি মনযোগ দেবে না এবং আল্লাহর প্রতি তাকিয়ে থাকবে। এটি এবং অন্য আরো বহু হাদীসের ভিত্তিতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসারীগণ প্রায় সর্বসম্মতভাবেই এ আয়াতের যে অর্থ করেন তাহলো, জান্নাতবাসীগণ আখেরাতে মহান আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হবে। কুরআন মজীদের এ আয়াত থেকেও তার সমর্থন পাওয়া যায়। كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ "কখ্খনো নয়, তারা (অর্থাৎ পাপীগণ) সেদিন তাদের রবের সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত হবে।" (আল মুতাফ্ফিফীন, ১৫) এ থেকে স্বতই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, এ বঞ্চনা হবে পাপীদের জন্য, নেক্কারদের জন্য নয়।

এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়। তাহলো, মানুষের পক্ষে আল্লাহকে দেখা কিভাবে সম্ভব? কোন জিনিসকে দেখতে পাওয়ার জন্য যা অনিবার্যরূপে প্রয়োজন তাহলো, সে জিনিসটিকে কোন বিশেষ দিক, স্থান, আকৃতি ও বর্ণ নিয়ে সামনে বিদ্যমান থাকতে হবে। আলোক রশ্মি তাতে প্রতিফলিত হয়ে চোখের ওপর পড়বে এবং চোখ থেকে তার ছবি বা প্রতিবিম্ব মস্তিষ্কের দর্শনকেন্দ্রে পৌঁছবে। মানুষের আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পবিত্র সত্তাকে এভাবে দেখতে পওয়ার কল্পনাও কি করা যায়? কিন্তু এ ধরনের প্রশ্ন মূলত একটি বড় ভ্রান্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ ক্ষেত্রে দু'টি জিনিসের মধ্যে পার্থক্য করা হয়নি। একটি হলো, দেখার তাৎপর্য। আর অপরটি হলো দেখার কাজটি সংঘটিত হওয়ার সেই বিশেষ অবস্থা বা প্রক্রিয়াটি যার সাথে আমরা এ পৃথিবীতে পরিচিত। দেখার তাৎপর্য হলো, দর্শনকারী ব্যক্তির মধ্যে দৃষ্টিশক্তি থাকতে হবে। অর্থাৎ সে অন্ধ হবে না। দৃশ্যমান বস্তু তার কাছে স্পষ্ট হবে, অদৃশ্য বা চোখের আড়াল হবে না। কিন্তু দুনিয়াতে আমরা যে জিনিসের অভিজ্ঞতা লাভ করি বা তা পর্যবেক্ষণ করে থাকি তা দেখার সে বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয় যার সাহায্যে কোন মানুষ বা পশু কার্যত কোন জিনিসকে দেখে থাকে। এ জন্য অনিবার্যরূপে যা প্রয়োজন তা হলো, দর্শনকারীর দেহে চোখ নামক একটি অংগ থাকবে। সে অংগটিতে দেখার শক্তি বর্তমান থাকবে। তার সামনে একটি সসীম রঙিন বা বর্ণময় দেহ বিদ্যমান থাকবে যা থেকে আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে চোখের পর্দার ওপর পড়বে এবং চোখের পর্দায় তার আকৃতির স্থান সংকুলান হতে হবে। এখন যদি কেউ মনে করে যে, দেখতে পাওয়ার মূলে এ দুনিয়াতে যে প্রক্রিয়াটি কার্যকর বলে আমরা জানি শুধু সে প্রক্রিয়াতেই দেখার কাজটি কার্যত প্রকাশ পেতে বা ঘটতে পারে তাহলে তা তার নিজের মন-মগজ তথা ধী-শক্তির সংকীর্ণতা। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলার নিজের সাম্রাজ্যে দেখার জন্য এত অসংখ্য উপায় ও প্রক্রিয়া থাকা সম্ভব যা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। এ প্রশ্ন নিয়ে যে ব্যক্তি বিতর্কে লিপ্ত হয় সে নিজেই বলুক, তার রব চক্ষুষ্মান না অন্ধ? তিনি যদি চক্ষুষ্মান তথা দৃষ্টিশক্তির অধিকারী হয়ে থাকেন এবং গোটা বিশ্ব-জাহান ও তার প্রতিটি বস্তু দেখে থাকেন তাহলে কি তিনি চোখ নামের একটি অংগ দিয়ে দেখছেন যা দিয়ে দুনিয়ায় মানুষ ও অন্য সব জীবজন্তু দেখে থাকে এবং আমাদের দ্বারা যেভাবে দেখার কাজটা সংঘটিত হচ্ছে তাঁর দ্বারাও কি সেভাবেই সংঘটিত হচ্ছে? সবারই জানা যে, এর জবাব হবে নেতিবাচক। এর জবাব যখন নেতিবাচক, তখন কোন বিবেক ও বোধ সম্পন্ন মানুষের একথা বুঝতে কষ্ট হবে কেন যে, দুনিয়ায় মানুষ যে নির্দিষ্ট

تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٥﴾ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴿٢٦﴾ وَقِيلَ مَنْ ۜ رَاقٍ ﴿٢٧﴾
وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿٢٨﴾ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿٢٩﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴿٣٠﴾

মনে করতে থাকবে যে, তাদের সাথে কঠোর আচরণ করা হবে। কখ্খনো না,[১৮] যখন প্রাণ কন্ঠনালীতে উপনীত হবে এবং বলা হবে, ঝাঁড় ফুঁক করার কেউ আছে কি?[১৯] মানুষ বুঝে নেবে এটা দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার সময়। উভয় পায়ের গোছা বা নলা একত্র হয়ে যাবে।[২০] সেদিনটি হবে তোমার প্রভুর কাছে যাত্রা করার দিন।

প্রক্রিয়ায় কোন জিনিসকে দেখে থাকে জান্নাতবাসীগণ সে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় আল্লাহর দর্শন লাভ করবেন না। বরং সেখানে দেখার ধরন, প্রকৃতি ও প্রক্রিয়া হবে অন্য রকম যা এখানে আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। দাম্পত্য জীবন কি এবং কেমন একটি দুই বছরের শিশুর পক্ষে তা বুঝা যতটা কঠিন, প্রকৃতপক্ষে আখেরাতের সবকিছু সঠিকভাবে বুঝা আমাদের জন্য তার চেয়েও অনেক বেশী কঠিন। অথচ যৌবনে উপনীত হয়ে এ শিশু নিজেই দাম্পত্য জীবন যাপন করবে।

১৮. এ 'কখ্খনো না' কথাটি সেই ধারাবাহিক কথাটির সাথে সম্পৃক্ত যা আগে থেকে চলে আসছে। অর্থাৎ তোমাদের এ ধারণা ভুল যে, তোমরা মরে বিলীন ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এবং নিজ প্রভুর সামনে তোমাদের ফিরে যেতে হবে না।

১৯. মূল আয়াতে رَاقٍ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এটি رُقْيَة ধাতু থেকেও উৎপন্ন হতে পারে। এর অর্থ তাবীজ-কবচ এবং ঝাড়-ফুঁক। আবার رَقْى ধাতু থেকেও উৎপন্ন হতে পারে। এর অর্থ ওপর দিকে ওঠা। যদি প্রথম অর্থটি গ্রহণ করা হয় তাহলে যা বুঝাবে তাহলো, শেষ মুহূর্তে যে সময় রোগীর সেবা শুশ্রূসাকারীরা সব রকমের ওষুধ পত্র সম্পর্কে নিরাশ হয়ে যাবে তখন বলবে ঃ আরে, কোন ঝাড় ফুঁককারীকেই অন্তত খুঁজে আনো যে এর জীবনটা রক্ষা করবে। আর যদি দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করা হয় তাহলে যা বুঝাবে তা হলো, সে সময় ফেরেশতারা বলবে ঃ কে এ রূহটা নিয়ে যাবে? আযাবের ফেরেশতারা না রহমতের ফেরেশতারা? অন্য কথায় সে সময় সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে, ঐ ব্যক্তি আখেরাতের দিকে কি মর্যাদা নিয়ে যাত্রা করছে। সৎ মানুষ হলে রহমতের ফেরেশতারা নিয়ে যাবে। অসৎ মানুষ হলে রহমতের ফেরেশতারা তার ছায়াও মাড়াবে না। আযাবের ফেরেশতারাই তাকে পাকড়াও করে নিয়ে যাবে।

২০. তাফসীরকারদের অনেকেই سَاق (পায়ের নলা) শব্দটির সাধারণ আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করেছেন। এ হিসেবে কথাটির অর্থ হয় মরার সময় যখন পা শুকিয়ে একটি আরেকটির সংগে লেগে যাবে। আবার কেউ কেউ প্রচলিত আরবী বাকরীতি অনুসারে শব্দটিকে কঠোরতা, রূঢ়তা ও বিপদাপদ অর্থে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ সে সময় দু'টি বিপদ একসাথে এসে হাজির হবে। একটি এ পৃথিবী এবং এর সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার বিপদ। আরেকটি, একজন অপরাধী হিসেবে গ্রেফতার হয়ে পরকালীন জগতে যাওয়ার বিপদ যার মুখোমুখি হতে হবে প্রত্যেক কাফের মুনাফিক এবং পাপীকে।

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ﴿٣١﴾ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿٣٢﴾ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ
يَتَمَطَّىٰ ﴿٣٣﴾ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ﴿٣٤﴾ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ﴿٣٥﴾ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ
أَن يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ﴿٣٧﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً
فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿٣٨﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٣٩﴾ أَلَيْسَ
ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ﴿٤٠﴾

২ রুকূ'

কিন্তু সে সত্যকে অনুসরণও করেনি। নামাযও পড়েনি। বরং সে অস্বীকার করেছে ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তারপর গর্বিত ভঙ্গিতে নিজের পরিবার পরিজনের কাছে ফিরে গিয়েছে।[২১] এ আচরণ তোমার পক্ষেই শোভনীয় এবং তোমার পক্ষেই মানানসই। হাঁ, এ আচরণ তোমার পক্ষেই শোভনীয় এবং তোমার পক্ষেই মানানসই।[২২]

মানুষ[২৩] কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে?[২৪] সে কি বীর্যরূপ এক বিন্দু নগণ্য পানি ছিল না যা (মায়ের জরায়ুতে) নিক্ষিপ্ত হয়। অতপর তা মাংস–পিণ্ডে পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তার সুন্দর দেহ বানালেন এবং তার অংগ–প্রত্যংগগুলো সুসামঞ্জস্য করলেন। তারপর তা থেকে নারী ও পুরুষ দু' রকম মানুষ বানালেন। সেই স্রষ্টা কি মৃতদের পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম নন?[২৫]

২১. অর্থ হলো, যে ব্যক্তি আখেরাতকে মানতে প্রস্তুত ছিল না সে পূর্ব বর্ণিত আয়াতগুলোতে উল্লেখিত সবকিছু শোনার পরেও তা অস্বীকার করে যেতে থাকলো এবং এসব আয়াত শোনার পর দর্প ভরে নিজের বাড়ীর দিকে চলে গেল। মুজাহিদ, কাতাদা ও ইবনে যায়েদের মতে এ লোকটি ছিল আবু জেহেল। আয়াতের শব্দসমূহ থেকেও এটাই প্রকাশ পায় যে, সে এমন কোন ব্যক্তি ছিল যে সূরা কিয়ামার ওপরে বর্ণিত আয়াতগুলো শোনার পর এ আচরণ ও কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিল।

এ আয়াতের "সে সত্যকে অনুসরণও করেনি, নামাযও পড়েনি" কথাটি বিশেষভাবে মনযোগলাভের যোগ্য। এর থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, আল্লাহ এবং তাঁর রসূল ও তাঁর কিতাবের সত্যতা স্বীকার করার পর তার প্রাথমিক এবং অনিবার্য দাবী হলো, মানুষ যেন নামায পড়ে। আল্লাহর দেয়া শরীয়াতের অন্য সব হুকুম–আহকাম তামীল করার পর্যায় বা অবকাশ তো আসে আরো পরে। কিন্তু ঈমান আনার পর কিছু সময় যেতে না যেতেই নামাযের সময় এসে হাজির হয়। আর তখনই জানা যায় সে যা মেনে নেয়ার অঙ্গীকার মুখ

থেকে উচ্চারণ করেছিল তা সত্যিই তার হৃদয়ের প্রতিধ্বনি, না কি কয়েকটি শব্দের আকারে মুখ থেকে উচ্চারিত ফাঁকা বুলি মাত্র।

২২. তাফসীরকারগণ أَوْلَى لَكَ আয়াতাংশের কয়েকটি অর্থ বর্ণনা করেছেন। যেমন, ঠিক তোমাকে! সর্বনাশ হোক তোমার! মন্দ, ধ্বংস এবং দুর্ভাগ্য হোক তোমার! তবে বাক্যটির অবস্থান বিবেচনা করলে আমার মতে এর দু'টি উপযুক্ত অর্থ হতে পারে যা হাফেয ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীরে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ "তুমি যখন তোমার সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছো তখন তোমার মত মানুষের পক্ষে এ আচরণই শোভা পায় যা তুমি করছো।" এটি একটি শ্লেষ বাক্য। কুরআন মজীদের আরো এক জায়গায় এ ধরনের বাক্য প্রয়োগ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, দোযখে আযাব দেয়ার সময় পাপী লোকদের বলা হবে ঃ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ "নাও, এর মজা চাখো। তুমি অতি বড় সম্মানী মানুষ কিনা।" (আদ দুখান, ৪৯)

২৩. এখানে বক্তব্যের সমাপ্তি টানতে গিয়ে সেই একই বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে যা দিয়ে বক্তব্য শুরু করা হয়েছিল। অর্থাৎ মৃত্যুর পরের জীবন অনিবার্যও এবং তা সম্ভবও।

২৪. আরবী ভাষায় ابل سدى বলা হয় এমন উটকে যা বেঁধে রাখা হয় না, উদ্দেশ্যহীনভাবে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়, এবং তার খোঁজ-খবর নেয়ার কেউ থাকে না। লাগামহীন উট বলে আমরা এ অর্থটিই প্রকাশ করে থাকি। অতএব, আয়াতের অর্থ হলো, মানুষ কি নিজেকে লাগামহীন উট মনে করে যে, তার স্রষ্টা তাকে এ পৃথিবীতে দায়িত্বহীন করে ছেড়ে দিয়েছেন? তার কোন দায়িত্ব ও কর্তব্য নেই? কোন জিনিস তার জন্য নিষিদ্ধ নয়? আর এমন কোন সময়ও কি তার আসবে না যখন তাকে তার কাজ-কর্মের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে? একথাটিই কুরআন মজীদের অন্য একস্থানে এভাবে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের বলবেন ঃ

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَٰكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

"তোমরা কি মনে করেছো যে, আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি? তোমাদেরকে কখনো আমার কাছে ফিরে আসতে হবে না?" (আল মু'মিনূন, ১১৫)

এ দু'টি স্থানে মৃত্যুর পরের জীবনের অনিবার্যতার প্রমাণ প্রশ্নের আকারে পেশ করা হয়েছে। প্রশ্নের সারমর্ম হলো, তোমরা কি প্রকৃতই নিজেদেরকে নিছক পশু বলে মনে করে নিয়েছো? তোমরা কি তোমাদের ও পশুদের মধ্যে এ স্পষ্ট পার্থক্য দেখতে পাও না যে, পশুদের কোন ইখতিয়ার বা স্বাধীনতা নেই, কিন্তু তোমাদের ইখতিয়ার ও স্বাধীনতা আছে? পশুর কাজ-কর্মে নৈতিক ভাল-মন্দের প্রশ্ন থাকে না। কিন্তু তোমাদের কাজ-কর্মের ক্ষেত্রে এ প্রশ্ন অনিবার্যরূপে ওঠে। এসব সত্ত্বেও তোমরা নিজেদের ব্যাপারে কি করে মনে করতে পারলে যে, পশুরা যেমন দায়িত্বমুক্ত, তাদের যেমন কোন জবাবদিহি করতে হবে না, তোমাদের ব্যাপারটাও ঠিক তাই? পশুদের পুনরায় জীবিত করে না উঠানোর যুক্তিগ্রাহ্য কারণ বুঝা যায়। তারা তাদের সহজাত ও প্রকৃতিগত ধরাবাঁধা দাবী পূরণ করেছে মাত্র। নিজেদের বুদ্ধি-বিবেক খাটিয়ে কোন দর্শন রচনা করেনি, কোন

বিশেষ মত ও পথের অনুসারী গোষ্ঠীর সৃষ্টি করেনি, কাউকে উপাস্য বানায়নি এবং নিজেও কারো উপাস্য হয়নি, এমন কোন কাজ করেনি যাকে নেক্‌কাজ বা বদকাজ বলে অভিহিত করা যায়। কোন ভাল বা মন্দ রীতি–প্রথার প্রচলন করেনি যার প্রভাব পুরুষাণুক্রমে চলেছে এবং সে জন্য সে পুরস্কার বা শাস্তিলাভের উপযুক্ত। তাই তারা যদি মরার পর নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তাহলে সেটা বোধগম্য ব্যাপার। কারণ তার ওপর কোন কাজের দায়–দায়িত্ব বর্তায় না যে, তার জবাবদিহির জন্য পুনরায় তাকে জীবিত করে উঠানোর প্রয়োজন হবে। কিন্তু তোমাদেরকে মৃত্যুর পরের জীবন থেকে কিভাবে অব্যাহতি দেয়া যেতে পারে? কারণ মৃত্যুর ঠিক পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্তও তোমরা এমন সব নৈতিক কাজ–কর্ম করতে থাকো যার ভাল বা মন্দ হওয়া এবং পুরস্কার বা শাস্তির উপযুক্ত হওয়ার ব্যাপারে তোমাদের বিবেক–বুদ্ধিই সিদ্ধান্ত দেয়। যে ব্যক্তি কোন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করেছে এবং পরক্ষণেই আকস্মিক কোন দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে তোমাদের মতে কি তার অবাধে (Scoufree) বেঁচে যাওয়া এবং এ জুলুমের প্রতিফল কোন দিনই না পাওয়া উচিত? যে ব্যক্তি দুনিয়ায় এমন কোন বিপর্যয়ের বীজ বপন করে গিয়েছে মানব সন্তানেরা শত শত বছর ধরে যার বিষময় ফল ভোগ করলো বা দুর্ভোগ পোহালো সে–ও নগণ্য পোকা মাকড় ও কীট পতঙ্গের মত মৃত্যুর পর বিলীন ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক, যার কৃতকর্মের ফলে হাজার হাজার ও লাখ লাখ মানুষের জীবন বরবাদ হয়ে গিয়েছে পুনরায় জীবিত হয়ে তাকে সেসব কৃতকর্মের জবাবদিহি করতে না হোক এরূপ ব্যবস্থায় কি তোমাদের বুদ্ধি–বিবেক সত্যিই সন্তুষ্ট হতে পারবে? পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি জীবন ব্যাপী হক ও ইনসাফ এবং কল্যাণ ও সৎকর্মশীলতার জন্য নিজের জীবনপাত করলো এবং জীবনভর শুধু বিপদ–মুসিবতই পোহালো তোমাদের বিবেচনায় কি সে পোকা–মাকড় ও কীট–পতঙ্গের মতই কোন নগণ্য সৃষ্টি, যার নিজের ভালকাজের পুরস্কার লাভের কোন অধিকারই নেই?

২৫. এটি মৃত্যুর পরের জীবনের সম্ভাব্যতার প্রমাণ। যারা একথা বিশ্বাস করে যে, প্রাথমিক পর্যায়ে বীর্য দ্বারা সৃষ্টির সূচনা করে পূর্ণাঙ্গ মানুষ সৃষ্টি করা পর্যন্ত গোটা কাজটাই মহান আল্লাহর শক্তি ও কৌশলের একটা বিস্ময়কর নমুনা, তাদের কাছে প্রকৃতপক্ষে এ প্রমাণের কোন জবাব নেই। কেননা, তারা যতই ঔদ্ধত্য দেখাক না কেন তাদের বিবেক–বুদ্ধি একথা না মেনে পারে না যে, যে আল্লাহ এভাবে দুনিয়ায় মানুষ সৃষ্টি করেন তিনি পুনরায় এ মানুষকে অস্তিত্ব দান করতেও সক্ষম। তবে যারা এ স্পষ্ট জ্ঞানগর্ভ ও যুক্তিসংগত কাজকে কেবল আকস্মিকতার ফল বলে মনে করে তারা যদি হঠকারী আচরণ করতে বদ্ধপরিকর না হয়ে থাকে তাহলে একটি বিষয়ের ব্যাখ্যা তাদের দিতে হবে। বিষয়টি হলো, একই ধরনের সৃষ্টি প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর প্রতিটি অংশে প্রত্যেক জাতির মধ্যে নারী ও পুরুষের জন্মের যে অনুপাত চলে আসছে তাতে কোথাও কোন যুগে এমন অবস্থা কখনো দেখা দেয়নি যে, কোন জনপদ ক্রমাগত শুধু পুরুষ অথবা শুধু নারীই জন্ম লাভ করেছে এবং ভবিষ্যতে তাদের বংশধারা টিকে থাকার কোন সম্ভবনাই থাকেনি। তাদের কাছে এরূপ না হওয়ার কি যুক্তি ও ব্যাখ্যা আছে? এ কাজটিও কি আকস্মিকভাবেই হয়ে চলেছে? এত বড় দাবী করার জন্য কোন মানুষকে অন্তত এতটা নির্লজ্জ ও বেশরম হওয়া চাই যাতে সে একদিন এ দাবীও করে বসতে পারে

যে, লণ্ডন, নিউইয়র্ক, মস্কো এবং পিকিং–এর মত শহর আকস্মিকভাবে আপনা আপনি অস্তিত্ব লাভ করেছে। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আর রূম, টীকা ২৭ থেকে ৩০; আশ্ শূরা, টীকা ৭৭)

বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এ আয়াতটি পড়তেন তখন আল্লাহ তা'আলার এ প্রশ্নের জবাবে কখনো بَلٰى (কেন সক্ষম নন), কখনো سُبْحٰنَكَ اَللّٰهُمَّ فَبَلٰى (তোমার সত্তা অতি পবিত্র, হে আল্লাহ, কেন সক্ষম নয়) এবং কখনো سُبْحٰنَكَ فَبَلٰى অথবা سُبْحٰنَكَ وَبَلٰى বলতেন।(ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও আবু দাউদ) আবু দাউদে হযরত আবু হুরাইরা থেকে এ মর্মে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমরা সূরা ত্বীনের আয়াত اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ (আল্লাহ কি সব বিচারকের চেয়ে বড় বিচারক নন?) পড়বে তখন বলবে بَلٰى وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ (কেন নয়, আমি নিজেও এর একজন সাক্ষদাতা), সূরা কিয়ামাহর এ আয়াতটি যখন পড়বে তখন বলবে এবং যখন সূরা মুরসালাতের আয়াত فَبِاَىِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ (এ কুরআন ছাড়া আর কোন্ জিনিসের প্রতি তারা বিশ্বাস পোষণ করবে?) পড়বে তখন বলবে ঃ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ (আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি)। ইমাম আহমাদ, তিরমিযী, ইবনুল মুনযির, ইবনে মারদুইয়া, বায়হাকী এবং হাকেমও অনুরূপ বিষয় সম্বলিত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আদ্ দাহ্র

৭৬

নামকরণ

সূরার একটি নাম আদ্ দাহ্র এবং আরেকটি নাম আল ইনসান। দু’টি নামই এর প্রথম আয়াতের هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ এবং حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ আয়াতাংশ থেকে গৃহীত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

তাফসীরকারদের অধিকাংশই বলেছেন যে, এটি মক্কায় অবতীর্ণ সূরা। আল্লামা যামাখশারী (র), ইমাম রাযী, কাজী বায়যাবী, আল্লামা নিজামুদ্দীন নীশাপুরী, হাফেয ইবনে কাসীর এবং আরো অনেক তাফসীরকার এটিকে মক্কী সূরা বলেই উল্লেখ করেছেন। আল্লামা আলুসীর মতে এটিই অধিকাংশ মুফাস্সিরের মত। কিন্তু অপর কিছু সংখ্যক তাফসীরকারের মতে পুরা সূরাটিই মাদানী। আবার কারো কারো মতে এটি মক্কী সূরা হলেও এর ৮ থেকে ১০ পর্যন্ত আয়াতগুলো মদীনায় নাযিল হয়েছে।

অবশ্য এ সূরার বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গি মাদানী সূরাসমূহের বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বরং এ বিষয়ে চিন্তা–ভাবনা করলে স্পষ্ট বুঝা যায়। এটি যে মক্কায় অবতীর্ণ শুধু তাই নয়, বরং মক্কী যুগেরও সূরা মুদ্দাস্সিরের প্রথম সাতটি আয়াত নাযিল হওয়ার পর যে পর্যায়টি আসে সে সময় নাযিল হয়েছিল। ৮ থেকে ১০ (ويطعمون الطعام থেকে يوما عبوسا قمطريرا) পর্যন্ত আয়াতগুলো গোটা সূরার বর্ণনাক্রমের সাথে এমনভাবে গাঁথা যে, যদি কেউ পূর্বাপর মিলিয়ে তা পাঠ করে তাহলে তার মনেই হবে না যে, এর আগের এবং পরের বিষয়বস্তু ১৫–১৬ বছর পূর্বে নাযিল হয়েছিল এবং এর কয়েক বছর পর নাযিল হওয়া এ তিনটি আয়াত এখানে এনে জুড়ে দেয়া হয়েছে।

আসলে যে কারণে এ সূরা অথবা এর কয়েকটি আয়াতের মদীনায় অবতীর্ণ হওয়ার ধারণা সৃষ্টি হয়েছে তা হলো, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে আতা বর্ণিত একটি হাদীস। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, একবার হযরত হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমা অসুস্থ হয়ে পড়েন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং বহু সংখ্যক সাহাবী (রা) তাদের দেখতে ও রোগ সংক্রান্ত খোঁজ–খবর নিতে যান। কোন কোন সাহাবী (রা) হযরত আলীকে (রা) পরামর্শ দেন যে, তিনি যেন শিশু দু’টির রোগমুক্তির জন্যে আল্লাহর উদ্দেশ্যে কোন মানত করেন। অতএব হযরত আলী (রা), হযরত ফাতেমা (রা) এবং তাঁদের কাজের মেয়ে ফিদ্দা (রা) মানত করলেন যে, আল্লাহ তা’আলা যদি শিশু দু’টিকে রোগমুক্ত করেন তাহলে শুকরিয়া হিসেবে তাঁরা সবাই তিন দিন রোযা রাখবেন। আল্লাহর

মেহেরবানীতে উভয়ে সুস্থ হয়ে উঠলেন এবং তাঁরা তিন জনে মানতের রোযা রাখতে শুরু করলেন। হযরত আলীর (রা) ঘরে খাবার কিছুই ছিল না। তিনি তিন সা' পরিমাণ যব ধার–কর্জ করে আনলেন (একটি বর্ণনা অনুসারে মেহনত মজদুরী করে নিয়ে আসলেন)। প্রথম রোযার দিন ইফতারী করে যখন খাওয়ার জন্য বসেছেন সেসময় একজন মিসকীন এসে খাবার চাইলো। তারা সব খাবার সে মিসকীনকে দিয়ে দিলেন এবং নিজেরা শুধু পানি পান করে রাত্রি কাটালেন। দ্বিতীয় দিনও ইফতারীর পর যে সময় খেতে বসেছেন সে সময় একজন ইয়াতীম এসে কিছু চাইলো। সেদিনও তাঁরা সব খাবার তাকে দিয়ে দিলেন এবং নিজেরা শুধু পানি পান করে রাত কাটিয়ে দিলেন। তৃতীয় দিন ইফতার করে খাবার জন্য সবেমাত্র বসেছেন সে সময় একজন বন্দী এসে একইভাবে খাদ্য চাইলো। সেদিনের সব খাবারও তাকে দিয়ে দেয়া হলো। চতুর্থ দিন হযরত আলী (রা) বাচ্চা দু'টিকে নিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হলে নবী (সা) দেখতে পেলেন, অসহ্য ক্ষুধার জ্বালায় পিতা ও দুই ছেলে তিনজনের অবস্থাই অত্যন্ত সংগীন। তিনি সেখান থেকে উঠে তাঁদের সাথে ফাতেমার (রা) কাছে বাড়ীতে গিয়ে দেখতে পেলেন তিনিও ঘরের এককোণে ক্ষুধার তীব্র জ্বালায় নিরব নিথর হয়ে পড়ে আছেন। এ অবস্থা দেখে নবীর (সা) হৃদয়–মন আবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। ইতিমধ্যে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এসে হাজির হলেন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আপনার পরিবার পরিজনের ব্যাপারে আপনাকে মোবারকবাদ দিয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ সেটা কি? জবাবে তিনি গোটা সূরাটা পাঠ করে শোনালেন। (ইবনে মিহরানের বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ থেকে সূরার শেষ আয়াত পর্যন্ত শোনালেন। কিন্তু ইবনে মারদুইয়া ইবনে আব্বাস থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাতে শুধু এতটুকু বর্ণনা করা হয়েছে যে, ويطعمون الطعام আয়াতটি হযরত আলী ও হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তাতে এ ঘটনার কোন উল্লেখ নেই)। আলী ইবনে আহমাদ আল ওয়াহেদী তার তাফসীর গ্রন্থ 'আল বাসীতে' এ ঘটনাটি পুরা বর্ণনা করেছেন। যামাখশারী, রাযী, নীশাপুরী এবং অন্যান্য মুফাস্‌সিরগণ সম্ভবত সেখান থেকেই এ ঘটনাটি গ্রহণ করেছেন।

এ রেওয়ায়াতটি সনদের দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বল। তাছাড়া দেরায়াত বা বুদ্ধি–বিবেক ও বিচার–বিশ্লেষণের দিক থেকে দেখলেও এ ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত মনে হয় যে, একজন মিসকীন, একজন ইয়াতীম এবং একজন বন্দী এসে খাদ্য চাচ্ছে আর তাকে বাড়ীর পাঁচ পাঁচজন লোকের খাদ্য সবটাই দিয়ে দেয়া হচ্ছে। এটা কি কোন যুক্তিসংগত ব্যাপার? একজনের খাদ্য তাকে দিয়ে বাড়ীর পাঁচ জন মানুষ চারজনের খাদ্য নিজেদের জন্য যথেষ্ট মনে করতে পারতেন। তাছাড়া একথাও বিশ্বাস করা কঠিন যে, দু' দু'টি বাচ্চা যারা সবে মাত্র রোগ থেকে নিরাময় লাভ করেছিল এবং দুর্বল ছিল তাঁদেরকেও তিন দিন যাবত অভুক্ত রাখা হযরত আলী ও হযরত ফাতেমার (রা) মত দীন সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিদ্বয়ও নেকীর কাজ মনে করে থাকবেন! তাছাড়াও ইসলামী শাসন যুগে কয়েদীদের ব্যাপারে কখনো এ নীতি ছিল না যে, তাদেরকে ভিক্ষা করার জন্য ছেড়ে দেয়া হবে। তারা সরকারের হাতে বন্দী হয়ে থাকলে তাদের খাদ্য ও বস্ত্রের ব্যবস্থা সরকারই করতেন। আবার কোন ব্যক্তির হাতে সোপর্দ করা হয়ে থাকলে তাদের খাদ্য ও বস্ত্র দান করা সে ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্য হতো। তাই কোন বন্দী ভিক্ষা করতে বের

হবে মদীনায় এটা ছিল অসম্ভব ব্যাপার। তা সত্ত্বেও সমস্ত বর্ণনা ও যুক্তি–তর্কের দুর্বলতাসমূহ উপেক্ষা করে এ কাহিনীকে পুরোপুরি সত্য বলে ধরে নিলেও তা থেকে বড়জোর যা জানা যায় তা শুধু এতটুকু যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারের লোকদের দ্বারা এ নেক কাজটি সম্পাদিত হওয়ার কারণে জিবরাঈল (আ) এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সুখবর শুনিয়েছেন যে, আল্লাহর কাছে আপনার আহলে বায়তের এ কাজটি অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছে। কারণ তারা ঠিক সে পছন্দনীয় কাজটি করেছেন আল্লাহ তা'আলা যার প্রশংসা সূরা দাহ্রের এ আয়াতগুলোতে করেছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, আয়াত কয়টি এ উপলক্ষেই নাযিল হয়েছিল। শানে নুযুলের ব্যাপারে বিপুল সংখ্যক রেওয়ায়াতের অবস্থা হলো, কোন আয়াত সম্পর্কে যখন বলা হয় যে, এ আয়াতটি অমুক উপলক্ষে নাযিল হয়েছিল তখন প্রকৃতপক্ষে তার এ অর্থ দাঁড়ায় না যে, যখন এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল ঠিক তখনই এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল। বরং এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আয়াতটি এ ঘটনার ক্ষেত্রে যথাযথভাবে প্রযোজ্য। ইমাম সুয়ূতী তাঁর 'ইতকান' গ্রন্থে হাফেয ইবনে তাইমিয়ার এ বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন যে, "রাবী যখন বলেন, এ আয়াতটি অমুক ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, তখন কোন কোন ক্ষেত্রে তার অর্থ হয়, ঐ ব্যাপারটিই তার নাযিল হওয়ার কারণ। আবার কোন কোন সময় তার অর্থ হয়, ঐ ব্যাপারটি এ আয়াতের নির্দেশের অন্তরভুক্ত, যদিও তা তার নাযিল হওয়ার কারণ নয়।" এরপর তিনি ইমাম বদরুদ্দীন যারকাশীর গ্রন্থ 'আল বুরহান ফী উলুমিল কুরআন' থেকে তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। বক্তব্যটি হলো, "সাহাবা ও তাবেয়ীদের ব্যাপারে এ নীতি সাধারণ ও সর্বজনবিদিত যে, তাঁদের কেউ যখন বলেন, এ আয়াতটি অমুক ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল তখন তার অর্থ হয়, এ আয়াতের নির্দেশ ঐ ব্যাপারে প্রযোজ্য। তার এ অর্থ কখনো হয় না যে, উক্ত ঘটনাই এ আয়াতটির নাযিলের কারণ। প্রকৃতপক্ষে এ ক্ষেত্রে আয়াতটি থেকে দলীল পেশ করা হয় মাত্র। তা দ্বারা ঘটনা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হয় না।" (আল ইতকান ফী উলুমিল কুরআন, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১, মুদ্রণ ১৯২৯ ইং)

বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য

এ সূরার বিষয়বস্তু হলো দুনিয়ায় মানুষকে তার প্রকৃত মর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করা। তাকে একথা জানিয়ে দেয়া যে, সে যদি তার এ মর্যাদা ও অবস্থানকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করে শোকর বা কৃতজ্ঞতামূলক আচরণ করে তাহলে তার পরিণতি কি হবে এবং তা না করে যদি কুফরীর পথ অবলম্বন করে তাহলেই বা কি ধরনের পরিণতির সম্মুখীন হবে। কুরআনের বড় বড় সূরাগুলোতে এ বিষয়টি সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু মক্কী যুগের প্রথম পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাগুলোর একটি বিশেষ বর্ণনাভঙ্গি হলো পরবর্তী সময়ে যেসব বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে এ যুগে সে বিষয়গুলোই অতি সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী পন্থায় মন–মগজে গেঁথে দেয়া হয়েছে। এ জন্য সুন্দর ও ছোট ছোট এমন বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে যা আপনা আপনি শ্রোতার মুখস্ত হয়ে যায়।

এতে সর্বপ্রথম মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এক সময় এমন ছিল, যখন সে কিছুই ছিল না। তারপর সংমিশ্রিত বীর্য দ্বারা এত সূক্ষ্মভাবে তার সৃষ্টির সূচনা করা

হয়েছে যে, তার মা পর্যন্তও বুঝতে পারেনি যে, তার অস্তিত্বের সূচনা হয়েছে। অন্য কেউও তার এ অণুবীক্ষণিক সত্তা দেখে একথা বলতে সক্ষম ছিল না যে, এটাও আবার কোন মানুষ, যে পরবর্তী সময়ে এ পৃথিবীতে সৃষ্টির সেরা হিসেবে গণ্য হবে। এরপর মানুষকে এ বলে সাবধান করা হয়েছে যে, এভাবে তোমাকে সৃষ্টি করে এ পর্যায়ে তোমাকে পৌছানোর কারণ হলো তোমাকে দুনিয়াতে রেখে আমি পরীক্ষা করতে চাই। তাই অন্যান্য সৃষ্টির সম্পূর্ণ বিপরীত তোমাকে বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন করে সৃষ্টি করেছি এবং তোমার সামনে শোকর ও কুফরের দু'টি পথ স্পষ্ট করে রেখে দেয়া হয়েছে। এখানে কাজ করার জন্য তোমাকে কিছু সময়ও দেয়া হয়েছে। এখন আমি দেখতে চাই এ সময়ের মধ্যে কাজ করে অর্থাৎ এভাবে গৃহীত পরীক্ষার মাধ্যমে তুমি নিজেকে শোকরগোজার বান্দা হিসেবে প্রমাণ করো না কাফের বান্দা হিসেবে প্রমাণ করো।

অতপর যারা এ পরীক্ষায় কাফের বলে প্রমাণিত হবে আখেরাতে তাদের কি ধরনের পরিণতির সন্মুখীন হতে হবে তা শুধু একটি আয়াতের মাধ্যমেই পরিষ্কার ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে।

তারপর আয়াত নং ৫ থেকে ২২ পর্যন্ত একাদিক্রমে সেসব পুরস্কার ও প্রতিদানের কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যা দিয়ে সেসব লোকদের তাদের রবের কাছে অভিষিক্ত করা হবে, যারা এখানে যথাযথভাবে বন্দেগী করেছে। এ আয়াতগুলোতে শুধুমাত্র তাদের সর্বোত্তম প্রতিদান দেয়ার কথা বর্ণনা করাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়নি। বরং সংক্ষেপে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, কি কি কাজের জন্য তারা এ প্রতিদান লাভ করবে। মক্কী যুগে অবতীর্ণ সূরাসমূহের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট হলো, তাতে ইসলামের মৌলিক আকীদা–বিশ্বাস ও ধ্যান–ধারণার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়ার সাথে সাথে কোন কোন ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিতে অতি মূল্যবান নৈতিক গুণাবলী এবং নেক কাজের কথাও বর্ণনা করা হয়েছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এমন সব কাজ–কর্ম ও এমন সব মন্দ নৈতিক দিকের উল্লেখ করা হয়েছে যা থেকে ইসলাম মানুষকে পবিত্র করতে চায়। আর দুনিয়ার এ অস্থায়ী জীবনে ভাল অথবা মন্দ কি ধরনের ফলাফল প্রকাশ পায় সেদিক বিবেচনা করে এ দু'টি জিনিস বর্ণনা করা হয়নি। বরং আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবেন তার স্থায়ী ফলাফল কি দাঁড়াবে কেবল সে দিকটি বিবেচনা করেই তা বর্ণনা করা হয়েছে। দুনিয়ার এ জীবনে কোন খারাপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট কল্যাণকর প্রমাণিত হোক বা কোন ভাল চারিত্রিক গুণ ক্ষতিকর প্রমাণিত হোক তা এখানে বিবেচ্য নয়।

এ পর্যন্ত প্রথম রুকূ'র বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হলো। এরপর দ্বিতীয় রুকূ'তে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে তিনটি কথা বলা হয়েছে। এক, এ কুরআনকে অল্প অল্প করে তোমার ওপরে আমিই নাযিল করছি। এর উদ্দেশ্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাবধান করে দেয়া নয়, বরং কাফেরদের সাবধান করে দেয়া। কাফেরদের সাবধান করা হয়েছে এই বলে যে, কুরআন মজীদ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনগড়া বা স্বরচিত গ্রন্থ নয়, বরং তার নাযিলকর্তা আমি নিজে। আমার জ্ঞান ও কর্মকৌশলের দাবী হলো, আমি যেন তা একবারে নাযিল না করি বরং অল্প অল্প করে বারে বারে নাযিল করি। দ্বিতীয় যে কথাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছে তাহলো, তোমার রবের ফায়সালা আসতে যত

দেরীই হোক না কেন এবং এ সময়ের মধ্যে তোমার ওপর দিয়ে যত কঠিন ঝড়–ঝঞ্চাই বয়ে যাক না কেন তুমি সর্বাবস্থায় ধৈর্যের সাথে তোমার রিসালাতের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে থাকো। কখনো এসব দুষ্কর্মশীল ও সত্য অস্বীকারকারী লোকদের কারো চাপে পড়ে নতি স্বীকার করবে না। তৃতীয় যে কথাটি তাঁকে বলা হয়েছে তা হলো, রাত দিন সবসময় আল্লাহকে স্মরণ করো, নামায পড় এবং আল্লাহর ইবাদাতে রাত কাটিয়ে দাও। কারণ কুফরের বিধ্বংসী প্লাবনের মুখে এ জিনিসটিই আল্লাহর পথে আহবানকারীদের পা–কে দৃঢ় ও মজবুত করে।

এরপর আরেকটি ছোট বাক্যে কাফেরদের ভ্রান্ত আচরণের মূল কারণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, তারা আখেরাতকে ভুলে দুনিয়ার জন্য পাগল হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় আরেকটি বাক্যে তাদের এ মর্মে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা নিজে নিজেই জন্ম লাভ করোনি । আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি, বুকের এ চওড়া ছাতি এবং মজবুত ও সবল হাত–পা তুমি নিজেই নিজের জন্য বানিয়ে নাও নি। ওগুলোও আমিই তৈরী করেছি। আমি তোমাদের যা ইচ্ছা তাই করতে পারি। সবসময়ের জন্য সে ক্ষমতা আমার করায়ত্ব। আমি তোমাদের চেহারা ও আকৃতি বিকৃত করে দিতে পারি। তোমাদের ধ্বংস করে অন্য কোন জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারি। তোমাদের মেরে ফেলার পর যে চেহারা ও আকৃতিতে ইচ্ছা পুনরায় তোমাদের সৃষ্টি করতে পারি।

সবশেষে এ বলে বক্তব্য শেষ করা হয়েছে যে, এ কুরআন একটি উপদেশপূর্ণ বাণী। যার ইচ্ছা সে গ্রহণ করে তার প্রভুর পথ অবলম্বন করতে পারে। তবে দুনিয়াতে মানুষের ইচ্ছা সব কিছু নয়। আল্লাহর ইচ্ছা না হওয়া পর্যন্ত কারো ইচ্ছাই পূরণ হতে পারে না। তবে আল্লাহর ইচ্ছা অযৌক্তিকভাবে হয় না। তিনি যা–ই ইচ্ছা করুন না কেন তা হয় নিজের জ্ঞান ও কর্মকৌশলের আলোকে। এ জ্ঞান ও কর্মকৌশলের ভিত্তিতে তিনি যাকে তাঁর রহমতলাভের উপযুক্ত মনে করেন তাকে নিজের রহমতের অন্তরভূক্ত করে নেন। আর তাঁর কাছে যে জালেম বলে প্রমাণিত হয় তার জন্য তিনি অত্যন্ত কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْـًٔا مَّذْكُوْرًا ۝ اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ۝

মানুষের ওপরে কি অন্তহীন মহাকালের এমন একটি সময়ও অতিবাহিত হয়েছে যখন সে উল্লেখযোগ্য কোন জিনিসই ছিল না[১]? আমি মানুষকে এক সংমিশ্রিত বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি[২] যাতে তার পরীক্ষা নিতে পারি।[৩] এ উদ্দেশ্যে আমি তাকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির অধিকারী করেছি।[৪]

১. আয়াতের প্রথমাংশ হলো هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ । এখানে অধিকাংশ মুফাস্‌সির ও অনুবাদক هَلْ শব্দটিকে قَدْ শব্দের অর্থে গ্রহণ করেছেন এবং এর অর্থ করেছেন নিঃসন্দেহে মানুষের ওপরে এরূপ একটি সময় এসেছিল। তবে هل আরবী ভাষায় মূলত ঃ 'কি'র অর্থেই ব্যবহৃত হয়। সর্বাবস্থায় এর দ্বারা প্রশ্ন করা বুঝায় না। বরং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাহ্যিক ভাবে প্রশ্নবোধক এ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে বলা হয়ে থাকে। যেমন, কখনো আমরা জানতে চাই যে, অমুক ঘটনা ঘটেছিল না ঘটেনি আর সে জন্য কাউকে জিজ্ঞেস করি, এ ধরনের ঘটনা কি ঘটেছিল? কোন কোন সময় আবার প্রশ্ন করা আমাদের উদ্দেশ্য হয় না, বরং উদ্দেশ্য হয় কোন বিষয় অস্বীকার করা। তখন যে বাচনভংগি ব্যবহার করে আমরা তা অস্বীকার করি তাহলো অন্য কেউও কি এ কাজ করতে পারে? কোন সময় আমরা কারো থেকে কোন বিষয়ে স্বীকৃতি পেতে চাই এবং এ উদ্দেশ্যে তাকে জিজ্ঞেস করি, আমি কি তোমার টাকা পরিশোধ করেছি? কোন সময় আবার শুধু স্বীকৃতি আদায় করাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য হয় না। বরং তখন আমরা প্রশ্ন করি শ্রোতার মন মগজকে আরো একটি বিষয় ভাবতে বাধ্য করার জন্য যা তার স্বীকৃতির অনিবার্য ফল স্বরূপ দেখা দেয়। যেমন আমরা কাউকে জিজ্ঞেস করি ঃ আমি কি তোমার সাথে কোন খারাপ আচরণ করেছি? এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য শুধু এতটুকুই নয় যে, সে স্বীকার করুক, আপনি তার সাথে সত্যিই কোন খারাপ আচরণ করেননি। বরং এর উদ্দেশ্য তাকে একথাও চিন্তা করতে বাধ্য করা যে, যে ব্যক্তি আমার সাথে কোন খারাপ আচরণ করেনি তার সাথে আমার খারাপ আচরণ করা কতটুকু ন্যায় সংগত? আলোচ্য আয়াতের

প্রশ্নবোধক অংশটুকু প্রকৃতপক্ষে এ শেষ অর্থেই বলা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য মানুষকে শুধু এতটুকু স্বীকার করানো নয় যে, তার ওপরে এমন একটি সময় সত্যিই অতিবাহিত হয়েছে। বরং এর দ্বারা তাকে এ বিষয়ও চিন্তা করতে বাধ্য করা উদ্দেশ্য যে, যে আল্লাহ এমন নগণ্য অবস্থা থেকে সৃষ্টির সূচনা করে তাকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন তিনি তাকে পুনরায় সৃষ্টি করতে অক্ষম হবেন কেন?

আয়াতের দ্বিতীয় অংশ হলো حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ । دهر অর্থ– অন্তহীন মহাকাল যার আদি–অন্ত কিছুই মানুষের জানা নেই। আর حِيْنٌ অর্থ অন্তহীন এ মহাকালের বিশেষ একটি সময়, মহাকাল প্রবাহের কোন এক পর্যায়ে যার আগমন ঘটেছিল। বক্তব্যের সারমর্ম হলো, এ অন্তহীন মহাকালের মধ্যে একটি দীর্ঘ সময় তো এমন অতিবাহিত হয়েছে যখন মানব প্রজাতির আদৌ কোন অস্তিত্ব ছিল না। তারপর এ মহাকাল প্রবাহে এমন একটি সময় আসলো যখন মানুষ নামের একটি প্রজাতির সূচনা করা হলো। এ সময়–কালে প্রত্যেক মানুষের জন্য এমন একটি সময় এসেছে যখন তাকে শূন্য মাত্রা বা অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বদানের সূচনা করা হয়েছে।

আয়াতের তৃতীয় অংশ হলো لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا অর্থাৎ তখন সে কোন উল্লেখযোগ্য বস্তু ছিল না। তার একটি অংশ বাপের শুক্রের মধ্যে অণুবীক্ষণিক জীবাণু আকারে এবং আরেকটি অংশ মায়ের বীর্যে একটি অণুবীক্ষণিক ডিম্বের আকারে বর্তমান ছিল। দীর্ঘকাল পর্যন্ত মানুষ এ বিষয়ও জানতো না যে, একটি শুক্রকীট এবং একটি ডিম্বকোষের মিলনের ফলেই সে অস্তিত্ব লাভ করে। বর্তমানে অত্যন্ত শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সে এ দু'টিকে দেখতে সক্ষম হয়েছে বটে, কিন্তু এখনো কেউ বলতে পারে না যে, পিতার এ শুক্রকীটে এবং মায়ের ডিম্বকোষে কত সংখ্যক মানুষের অস্তিত্ব থাকে। গর্ভসঞ্চারকালে এ দু'টি জিনিসের মিলনে যে প্রাথমিক কোষ (Cell) সৃষ্ট হয় তা পরিমাণহীন এমন একটি পরমাণু যা কেবল অত্যন্ত শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেই দেখা যেতে পারে। আর তা দেখার পরেও আপাত দৃষ্টিতে কেউ একথা বলতে পারে না যে, এভাবে কোন মানুষ জন্মলাভ করছে কিংবা এ নগণ্য সূচনা বিন্দু থেকে বৃদ্ধি ও বিকাশ লাভ করে কোন মানুষ যদি সৃষ্টি হয়ও তাহলে সে কেমন দৈহিক উচ্চতা ও কাঠামো, কেমন আকার–আকৃতি এবং কেমন যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্বধারী মানুষ হবে তাও বলতে পারে না। সে সময় সে কোন উল্লেখযোগ্য বস্তুই ছিল না, এ বাণীর তাৎপর্য এটাই। যদিও মানুষ হিসেবে সে সময় তার অস্তিত্বের সূচনা হয়ে গিয়েছিল।

২. এক সংমিশ্রিত বীর্য দ্বারা অর্থ হলো, মানুষের সৃষ্টি পুরুষ ও নারীর দু'টি আলাদা বীর্য দ্বারা হয়নি। বরং দু'টি বীর্য সংমিশ্রিত হয়ে যখন একটি হয়ে গিয়েছে তখন সে সংমিশ্রিত বীর্য থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে।

৩. এটাই হলো দুনিয়ায় মানুষের এবং মানুষের জন্য দুনিয়ার প্রকৃত অবস্থান ও মর্যাদা। মানুষ নিছক গাছপালা বা জীব–জন্তুর মত নয় যে, তার সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য এখানেই পূরণ হয়ে যাবে এবং প্রকৃতির নিয়মানুসারে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তার নিজের অংশের করণীয় কাজ সম্পাদন করার পর এখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তাছাড়া এ দুনিয়া তার জন্য আযাব বা শাস্তির স্থান নয় যেমনটা খৃষ্টান পাদ্রীরা মনে করে, প্রতিদানের ক্ষেত্রও নয় যেমনটা জন্মান্তরবাদীরা মনে করে, চারণ ক্ষেত্র বা

বিনোদন কেন্দ্র নয় যেমনটা বস্তুবাদীরা মনে করে আবার দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম ক্ষেত্রও নয় যেমনটা ডারউইন ও মার্কসের অনুসারীরা মনে করে থাকে। বরং দুনিয়া মূলত তার জন্য একটা পরীক্ষাগার। যে জিনিসকে সে বয়স বা আয়ুষ্কাল বলে মনে করে আসলে তা পরীক্ষার সময় যা তাকে এ দুনিয়ায় দেয়া হয়েছে। দুনিয়ায় যে ক্ষমতা ও যোগ্যতা তাকে দেয়া হয়েছে, যেসব বস্তুকে কাজে লাগানোর সুযোগ তাকে দেয়া হয়েছে, যে মর্যাদা নিয়ে বা অবস্থানে থেকে সে এখানে কাজ করছে এবং তার ও অন্যান্য মানুষের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান তার সবই মূলত অসংখ্য পরীক্ষা পত্র। জীবনের সর্বশেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্নভাবে এ পরীক্ষা চলবে। এ পরীক্ষার ফলাফল দুনিয়ায় প্রকাশ পাবে না। বরং আখেরাতে তার সমস্ত পরীক্ষা পত্র পরীক্ষা ও যাঁচাই বাছাই করে ফায়সালা দেয়া হবে। সে সফল না বিফল। তার সফলতা ও বিফলতার সবটাই নির্ভর করবে এ বিষয়ের ওপর যে, সে তার নিজের সম্পর্কে কি ধারণা নিয়ে এখানে কাজ করেছে এবং তাকে দেয়া পরীক্ষার পত্রসমূহে সে কিভাবে জবাব লিখেছে। নিজের সম্পর্কে সে যদি মনে করে থাকে যে, তার কোন আল্লাহ নেই অথবা নিজেকে সে বহু সংখ্যক ইলাহর বান্দা মনে করে থাকে এবং পরীক্ষার সবগুলো পত্রে এ বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে জবাব লিখে থাকে যে, আখেরাতে তাকে তার স্রষ্টার সামনে কোন জবাবদিহি করতে হবে না তাহলে তার জীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ড ভুল হয়ে গিয়েছে। আর যদি সে নিজেকে একমাত্র আল্লাহর বান্দা মনে করে আল্লাহর মনোনীত পথ ও পন্থা অনুসারে কাজ করে থাকে এবং আখেরাতে জবাবদিহির চেতনা বিবেচনায় রেখে তা করে থাকে তাহলে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেলো। (এ বিষয়টি কুরআন মজীদে এত অধিক জায়গায় ও এত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এখানে স্থানগুলোর নাম উল্লেখ করা বেশ কঠিন। যারা এ বিষয়টি আরো ভালভাবে বুঝতে চান তারা তাফহীমুল কুরআনের প্রত্যেক খণ্ডের শেষে সংযুক্ত বিষয়সূচীর মধ্যে 'পরীক্ষা' শব্দটি বের করে সেসব স্থান দেখুন যেখানে কুরআন মজীদে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টির ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কুরআন ছাড়া পৃথিবীতে এমন আর কোন গ্রন্থ নেই যার মধ্যে এ সত্যটি এত বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

৪. আসলে বলা হয়েছে আমি তাকে سميع ও بصير বানিয়েছি। বিবেকবুদ্ধির অধিকারী করেছি বললে এর সঠিক অর্থ প্রকাশ পায়। কিন্তু অনুবাদে আমি سميع শব্দের অর্থ "শ্রবণশক্তির অধিকারী" এবং بصير শব্দের অর্থ 'দৃষ্টিশক্তির অধিকারী' করেছি। যদিও এটিই আরবী ভাষার এ দু'টি শব্দের শাব্দিক অনুবাদ কিন্তু আরবী ভাষায় অভিজ্ঞ প্রত্যেক ব্যক্তিই জানেন যে, জন্তু-জানোয়ারের জন্য কখনো سميع ও بصير শব্দ ব্যবহৃত হয় না। অথচ জন্তু-জানোয়ারও দেখতে এবং শুনতে পায়। অতএব এখানে শোনা এবং দেখার অর্থ শোনার ও দেখার সে শক্তি নয় যা জন্তু-জানোয়ারকেও দেয়া হয়েছে। এখানে এর অর্থ হলো, শোনা ও দেখার সেসব উপায়-উপকরণ যার সাহায্যে মানুষ জ্ঞান অর্জন করে এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। তাছাড়া শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি যেহেতু মানুষের জ্ঞানার্জনের উপায়-উপকরণের মধ্যে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ তাই সংক্ষেপে এগুলোরই উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষ যেসব ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞান অর্জন করে থাকে আসলে এসব ইন্দ্রিয়ের সবগুলোকেই এখানে বুঝানো হয়েছে। তাছাড়া মানুষকে যেসব ইন্দ্রিয় ও অনুভূতি শক্তি দেয়া হয়েছে তা ধরন ও প্রকৃতিগত দিক দিয়ে পশুদের ইন্দ্রিয় ও অনুভূতি শক্তি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারণ মানুষের প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের পেছনে একটি চিন্তাশীল মন-মগজ

إِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۝ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ سَلَسِلَا۟ وَأَغْلَلًا وَسَعِيرًا ۝④

আমি তাকে রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছি। এরপর হয় সে শোকরগোজার হবে নয়তো হবে কুফরের পথ অনুসরণকারী।[৫] *আমি কাফেরদের জন্য শিকল, বেড়ি এবং জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি।*

বর্তমান যা ইন্দ্রিয়সমূহের মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান ও তথ্যসমূহকে একত্রিত ও বিন্যস্ত করে তা থেকে ফলাফল বের করে, মতামত স্থির করে এবং এমন কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যার ওপরে তার কার্যকলাপ ও আচরণের ভিত্তি স্থাপিত হয়। তাই মানুষকে সৃষ্টি করে আমি তাকে পরীক্ষা করতে চাচ্ছিলাম একথাটি বলার পর আমি এ উদ্দেশ্যেই তাকে سميع ও بصير অর্থাৎ 'শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির অধিকারী করেছি' কথাটি বলার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জ্ঞান ও বিবেক–বুদ্ধির শক্তি দিয়েছেন যাতে সে পরীক্ষা দেয়ার উপর্যুক্ত হতে পারে। বাক্যটির অর্থ যদি এটা না হয় এবং سميع ও بصير বানানোর অর্থ যদি শুধু শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির অধিকারী বানানো হয় তাহলে অন্ধ ও বধির ব্যক্তিরা এ পরীক্ষা থেকে বাদ পড়ে যায় অথচ জ্ঞান ও বিবেক–বুদ্ধি থেকে যদি কেউ পুরোপুরি বঞ্চিত না হয় তাহলে তার এ পরীক্ষা থেকে বাদ পড়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

৫. অর্থাৎ আমি তাকে শুধু জ্ঞান ও বিবেক–বুদ্ধি দিয়েই ছেড়ে দেইনি। বরং এগুলো দেয়ার সাথে সাথে তাকে পথও দেখিয়েছি যাতে সে জানতে পারে শোকরিয়ার পথ কোন্‌টি এবং কুফরীর পথ কোন্‌টি। এরপর যে পথই সে অবলম্বন করুক না কেন তার জন্য সে নিজেই দায়ী। এ বিষয়টিই সূরা বালাদে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে وَهَدَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ "আমি তাকে দু'টি পথ (অর্থাৎ ভাল ও মন্দ পথ) স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছি।" সূরা শামসে বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে এভাবেঃ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا "শপথ (মানুষের) প্রবৃত্তির আর সে সত্তার যিনি তাকে (সব রকম বাহ্যিক) ও আভ্যন্তরীণ শক্তি দিয়ে শক্তিশালী করেছেন। আর পাপাচার ও তাকওয়া–পরহেজগারীর অনুভূতি দু'টোই তার ওপর ইলহাম করেছেন।" এসব ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ সামনে রেখে বিচার করলে এবং পৃথিবীতে মানুষের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তা'আলা যেসব ব্যবস্থার কথা কুরআন মজীদে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন তাও সামনে রাখলে বুঝা যায় যে, এ আয়াতে পথ দেখানোর যে কথা বলা হয়েছে তার দ্বারা পথপ্রদর্শনের কোন একটি মাত্র পন্থা ও উপায় বুঝানো হয়নি। বরং এর দ্বারা অনেক পন্থা ও উপায়ের কথা বলা হয়েছে যার কোন সীমা পরিসীমা নেই। যেমন ঃ

এক ঃ প্রত্যেক মানুষকে জ্ঞান ও বিবেক–বুদ্ধির যোগ্যতা দেয়ার সাথে সাথে তাকে একটি নৈতিক বোধ ও অনুভূতি দেয়া হয়েছে যার সাহায্যে সে প্রকৃতিগতভাবেই ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করে, কিছু কাজ–কর্ম ও বৈশিষ্টকে খারাপ বলে জানে যদিও সে

নিজেই তাতে লিপ্ত। আবার কিছু কাজ–কর্ম ও গুণাবলীকে ভাল বলে মনে করে যদিও সে নিজে তা থেকে দূরে অবস্থান করে। এমন কি যেসব লোক তাদের স্বার্থ ও লোভ–লালসার কারণে এমন সব দর্শন রচনা করেছে যার ভিত্তিতে তারা অনেক খারাপ ও পাপকার্যকেও নিজেদের জন্য বৈধ করে নিয়েছে তাদের অবস্থাও এমন যে, সে একই মন্দ কাজ করার অভিযোগ যদি কেউ তাদের ওপর আরোপ করে, তাহলে তারা প্রতিবাদে চিৎকার করে উঠবে এবং তখনই জানা যায় যে, নিজেদের মিথ্যা ও অলীক দর্শন সত্ত্বেও বাস্তবে তারা নিজেরাও সেসব কাজকে খারাপই মনে করে থাকে। অনুরূপ ভাল কাজ ও গুণাবলীকে কেউ মূর্খতা, নির্বুদ্ধিতা এবং সেকেলে ঠাওরিয়ে রাখলেও কোন মানুষের কাছ থেকে তারা যখন নিজেরাই নিজেদের সদাচরণের সুফল বা উপকার লাভ করে তখন তারা সেটিকে মূল্যবান মনে করতে বাধ্য হয়ে যায়।

দুই ঃ প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আল্লাহ তা'আলা বিবেক (তিরস্কারকারী নফস) বলে একটি জিনিস রেখে দিয়েছেন। যখন সে কোন মন্দ কাজ করতে উদ্যত হয় অথবা করতে থাকে অথবা করে ফেলে তখন এ বিবেকই তাকে দংশন করে। যতই হাত বুলিয়ে বা আদর–সোহাগ দিয়ে মানুষ এ বিবেককে ঘুম পাড়িয়ে দিক, তাকে অনুভূতিহীন বানানোর যত চেষ্টাই সে করুক সে তাকে একদম নিশ্চিহ্ন করতে সক্ষম নয়। হঠকারী হয়ে দুনিয়ায় সে নিজেকে চরম বিবেকহীন প্রমাণ করতে পারে, সে সুন্দর সুন্দর অজুহাত খাড়া করে দুনিয়াকে ধোঁকা দেয়ার সব রকম প্রচেষ্টা চালাতে পারে, সে নিজের বিবেককে প্রতারিত করার জন্য নিজের কর্মকাণ্ডের সপক্ষে অসংখ্য ওজর পেশ করতে পারে; কিন্তু এসব সত্ত্বেও আল্লাহ তার স্বভাব–প্রকৃতিতে যে হিসেব পরীক্ষককে নিয়োজিত রেখেছেন সে এত জীবন্ত ও সজাগ যে, সে নিজে প্রকৃতপক্ষে কি তা কোন অসৎ মানুষের কাছেও গোপন থাকে না। সূরা আল কিয়ামাহতে একথাটিই বলা হয়েছে যে, "মানুষ যত ওজরই পেশ করুক না কেন সে নিজেকে নিজে খুব ভাল করেই জানে।" (আয়াত ১৫)

তিন ঃ মানুষের নিজের সত্তায় এবং তার চারাপাশে যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত গোটা বিশ্ব–জাহানের সর্বত্র এমন অসংখ্য নিদর্শনাদি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যা আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে যে, এতসব জিনিস কোন আল্লাহ ছাড়া হতে পারে না কিংবা বহু সংখ্যক খোদা এ বিশ্ব–জাহানের সৃষ্টিকর্তা বা পরিচালক হতে পারে না। বিশ্ব চরাচরের সর্বত্র এবং মানুষের আপন সত্তার অভ্যন্তরে বিদ্যমান এ নিদর্শনাবলীই কিয়ামত ও আখেরাতের সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করছে। মানুষ যদি এসব থেকে চোখ বন্ধ করে থাকে অথবা বুদ্ধি–বিবেক কাজে লাগিয়ে এসব বিষয়ে চিন্তা–ভাবনা না করে অথবা তা যেসব সত্যের প্রতি ইংগিত করছে তা মেনে নিতে টালবাহানা ও গড়িমসি করে তাহলে তা তার নিজেরই অপরাধ। আল্লাহ তা'আলা নিজের পক্ষ থেকে তার সামনে সত্যের সন্ধান দাতা নিদর্শনাদি পেশ করতে আদৌ কোন অসম্পূর্ণতা রাখেনি।

চার ঃ মানুষের নিজের জীবনে, তার সমসাময়িক পৃথিবীতে এবং তার পূর্বের অতীত ইতিহাসের অভিজ্ঞতায়, এমন অসংখ্য ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং হয়ে থাকে যা প্রমাণ করে যে, একটি সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর শাসন–কর্তৃত্ব তার ওপর এবং সমগ্র বিশ্ব–জাহানের ওপর কর্তৃত্ব চালিয়ে যাচ্ছেন যাঁর সামনে সে নিতান্তই অসহায়। যাঁর ইচ্ছা সবকিছুর ওপর

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿٥﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿٦﴾ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿٧﴾

(বেহেশতে) নেক্‌কার লোকেরা[৬] পানপাত্র থেকে এমন শরাব পান করবে যাতে কর্পূর পানি সংমিশ্রিত থাকবে। এটি হবে একটি বহমান ঝর্ণা[৭] আল্লাহর বান্দারা[৮] যার পানির সাথে শরাব মিশিয়ে পান করবে এবং যেখানেই ইচ্ছা সহজেই তার শাখা–প্রশাখা বের করে নেবে।[৯] এরা হবে সেসব লোক যারা (দুনিয়াতে) মানত পূরণ করে[১০] সে দিনকে ভয় করে যার বিপদ সবখানে ছড়িয়ে থাকবে।

বিজয়ী এবং যাঁর সাহায্যের সে মুখাপেক্ষী। এসব অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ বাহ্যিক ক্ষেত্রসমূহেই শুধু এ সত্যের প্রমাণ পেশ করে না। বরং মানুষের নিজের প্রকৃতির মধ্যেও সে সর্বোচ্চ শাসন–কর্তৃত্বের প্রমাণ বিদ্যমান যার কারণে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার ক্ষেত্রে খারাপ সময়ে নাস্তিকরাও আল্লাহর সামনে প্রার্থনার হাত প্রসারিত করে এবং কট্টর মুশরিকরাও সব মিথ্যা খোদাকে পরিত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহকে ডাকতে শুরু করে।

পাঁচ ঃ মানুষের বিবেক–বুদ্ধি ও প্রকৃতিগত জ্ঞানের অকাট্য ও চূড়ান্ত রায় হলো অপরাধের শাস্তি এবং উত্তম কার্যাবলীর প্রতিদান অবশ্যই পাওয়া উচিত। এ উদ্দেশ্যে দুনিয়ার প্রত্যেক সমাজে কোন না কোন রূপে বিচার–ব্যবস্থা কায়েম করা হয় এবং যেসব কাজ–কর্ম প্রশংসনীয় বলে মনে করা হয় তার জন্য পুরস্কার ও প্রতিদান দেয়ারও কোন না কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, নৈতিকতা এবং প্রতিদান বা ক্ষতিপূরণ আইনের মধ্যে এমন একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান যা অস্বীকার করা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। একথা যদি স্বীকার করা হয় যে, এ পৃথিবীতে এমন অসংখ্য অপরাধ আছে যার যথাযোগ্য শাস্তি তো দূরের কথা আদৌ কোন শাস্তি দেয়া যায় না এবং এমন অসংখ্য সেবামূলক ও কল্যাণকর কাজ আছে যার যথাযোগ্য প্রতিদান তো দূরের কথা কাজ সম্পাদনকারী আদৌ কোন প্রতিদান লাভ করতে পারে না তাহলে আখেরাতকে মেনে নেয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না। তবে কোন নির্বোধ যদি মনে করে অথবা কোন হঠকারী ব্যক্তি যদি সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে থাকে যে, ন্যায় ও ইনসাফের ধারণা পোষণকারী মানুষ এমন এক পৃথিবীতে জন্মলাভ করে ফেলেছে যেখানে ন্যায় ও ইনসাফের ধারণা একেবারেই অনুপস্থিত তবে সেটা আলাদা কথা, এরপর অবশ্য একটি প্রশ্নের জওয়াব দেয়া তার দায়িত্ব ও কর্তব্য হয়ে পড়ে। তাহলো, এমন এক বিশ্বে জন্মলাভকারী মানুষের মধ্যে ইনসাফের এ ধারণা এলো কোথা থেকে?

ছয় ঃ এসব উপায়-উপকরণের সাহায্যে মানুষকে হিদায়াত ও পথপ্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে নবী পাঠিয়েছেন এবং কিতাব নাযিল করেছেন। এসব কিতাবে পরিষ্কার ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে, শোকরের পথ কোন্‌টি ও কুফরের পথ কোন্‌টি এবং এ দু'টি পথে চলার পরিণামই বা কি? নবী-রসূল এবং তাঁদের আনীত কিতাবসমূহের শিক্ষা জানা-অজানা, দৃশ্য-অদৃশ্য অসংখ্য উপায় ও পন্থায় এত ব্যাপকভাবে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে যে, কোন জনপদই আল্লাহ ও আখেরাতের ধারণা, সৎ ও অসৎ কাজের পার্থক্য বোধ এবং তাঁদের পেশকৃত নৈতিক নীতিমালা ও আইন-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ নয়, নবী-রসূলদের আনীত কিতাবসমূহের শিক্ষা থেকেই তারা এ জ্ঞান লাভ করেছে তা তাদের জানা থাক বা না থাক। বর্তমানে যেসব লোক নবী-রসূলগণ এবং আসমানী কিতাবসমূহকে অস্বীকার করে অথবা তাঁদের সম্পর্কে কোন খবরই রাখে না তারাও এমন অনেক জিনিস অনুসরণ করে থাকে যা মূলত ঐ সব শিক্ষা থেকে উৎসারিত ও উৎপন্ন হয়ে তাদের কাছে পৌঁছেছে। অথচ মূল উৎস কি সে সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না।

৬. মূল আয়াতে ابرار শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ এমন সব মানুষ যারা পুরোপুরি তাদের রবের আনুগত্য করেছে, তাঁর পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ পালন করেছে এবং তাঁর পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ কাজসমূহ থেকে বিরত রয়েছে।

৭. অর্থাৎ তা কর্পূর মিশ্রিত পানি হবে না বরং তা হবে এমন একটি প্রাকৃতিক ঝর্ণাধারা যার পানি হবে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন এবং শীতল আর তার খোশবু হবে অনেকটা কর্পূরের মত।

৮. عباد الله (আল্লাহর বান্দারা) কিংবা عباد الرحمن (রাহমানের বান্দারা) শব্দগুলো আভিধানিক অর্থে সমস্ত মানুষের জন্যই ব্যবহৃত হতে পারে। কারণ সবাই আল্লাহর বান্দা। কিন্তু তা সত্ত্বেও কুরআন মজীদে যেখানেই এ ধরনের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তার দ্বারা আল্লাহর নেক্‌কার বান্দাগণকেই বুঝানো হয়েছে। অসৎলোক, যারা নিজেরাই নিজেদেরকে আল্লাহর বন্দেগী তথা দাসত্বের বাইরে রেখেছে, তারা যেন এর যোগ্য-ই নয় যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নিজের মহান নামের সাথে যুক্ত করে عباد الله অথবা عباد الرحمن এর মত সম্মানিত উপাধিতে ভূষিত করবেন।

৯. এর দ্বারা বুঝায় না যে, তারা সেখানে কোদাল ও খন্তা নিয়ে নালা খনন করবে এবং এভাবে উক্ত ঝর্ণার পানি যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যাবে। বরং এর অর্থ হলো, জান্নাতের মধ্যে যেখানেই তারা চাইবে সেখানেই এ ঝর্ণা বইতে থাকবে। এ জন্য তাদের নির্দেশ বা ইংগিতই যথেষ্ট হবে। সহজেই বের করে নেবে কথাটি এ বিষয়টির প্রতিই ইংগিত করে।

১০. 'নযর' বা মানত পূরণ করার একটা অর্থ হলো, মানুষের ওপর যা কিছু ওয়াজিব করা হয়েছে তা তারা পূরণ করবে। দ্বিতীয় অর্থ হলো, মানুষ তার নিজের ওপর যা ওয়াজিব করে নিয়েছে কিংবা অন্য কথায় সে যে কাজ করার সংকল্প বা ওয়াদা করেছে তা পূরণ করবে। তৃতীয় অর্থ হলো, ব্যক্তির ওপরে যা ওয়াজিব তা সে পূরণ করবে। তা তার ওপর ওয়াজিব করা হয়ে থাকুক অথবা সে নিজেই তার ওপর ওয়াজিব করে নিয়ে থাকুক। এ তিনটি অর্থের মধ্যে দ্বিতীয় অর্থটি বেশী পরিচিত এবং 'নযর' শব্দ দ্বারা

সাধারণত এ অর্থটিই বুঝানো হয়ে থাকে। যাই হোক, এখানে ঐ সমস্ত লোকের প্রশংসা হয়তো এ জন্য করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত ওয়াজিবসমূহ পালন করে। অথবা এ জন্য তাদের প্রশংসা করা হয়েছে যে, তারা অত্যন্ত সৎ মানুষ। যেসব ওয়াজিব বা করণীয় আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন সেগুলো পালনের ব্যাপারে কোন রকম ত্রুটি করা তো দূরের কথা যেসব ভাল ও কল্যাণকর কাজ আল্লাহ তাদের জন্য ওয়াজিব বা করণীয় করে দেননি তারা যখন আল্লাহর কাছে সে কাজ করার ওয়াদা করে তখন সে ওয়াদাও পালন করে।

মানতের বিধি-বিধান ও হুকুম-আহকাম তাফহীমুল কুরআনে সূরা বাকারার ৩১০ নং টীকায় আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছি। তবে এখানে তা আরো একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যথার্থ বলে মনে করছি। যাতে এ ব্যাপারে মানুষ যেসব ভুল করে অথবা যেসব ভুল ধারণা মানুষের মধ্যে দেখা যায় তা থেকে আত্মরক্ষা করতে এবং এর সঠিক নিয়ম-কানুন অবহিত হতে পারে।

এক ঃ ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণের মতে 'নযর' বা মানত চার প্রকারের। এক, এক ব্যক্তি আল্লাহর সাথে ওয়াদা করলো যে, সে তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য অমুক নেক কাজ সম্পাদন করবে। দুই, সে মানত করলো যে, আল্লাহ যদি আমার অমুক প্রয়োজন পূরণ করেন তাহলে আমি শোকরিয়া হিসেবে অমুক নেক কাজ করবো। এ দুই প্রকারের মানতকে ফিকাহবিদদের পরিভাষায় 'নযরে তাবাররুর' বা নেক কাজের মানত বলা হয় এবং এ ব্যাপারে তারা একমত যে, এ নযর পূরণ করা ওয়াজিব। তিন, কোন ব্যক্তির কোন নাজায়েজ কাজ করার কিংবা কোন ওয়াজিব কাজ না করার সংকল্প করা। চার, কোন ব্যক্তির কোন মুবাহ কাজ করা নিজের জন্য ওয়াজিব করে নেয়া অথবা কোন অবাঞ্ছিত কাজ করার সংকল্প করা। এ দু' প্রকারের মানতকে ফিকাহবিদদের পরিভাষায় "নযরে লাজাজ" (মূর্খতা, ঝগড়াটেপনা ও হঠকারিতামূলক মানত) বলে। এর মধ্যে তৃতীয় প্রকারের মানত সম্পর্কে সব ফিকাহবিদের ঐকমত্য হলো, তা মানত হিসেবে পরিগণিত হয় না। চতুর্থ প্রকারের মানত সম্পর্কে ফিকাহবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কোন কোন ফিকাহবিদ বলেছেন ঃ এ মানত পূরণ করা কর্তব্য। কেউ কেউ বলেন ঃ শপথ ভংগের কাফ্‌ফারা দিতে হবে। আবার কেউ কেউ বলেন, ব্যক্তি ইচ্ছা করলে মানত পূরণ করতে পারে কিংবা কাফ্‌ফারা দিতে পারে। এ ব্যাপারে তার স্বাধীনতা রয়েছে। শাফেয়ী এবং মালেকীদের মতে এ প্রকারের মানতও আদৌ মানত হিসেবে গণ্য হয় না। আর হানাফীদের মতে এ দু' প্রকারের মানতের জন্য কাফ্‌ফারা দেয়া আবশ্যিক হয়ে যায়। (উমদাতুল কারী)

দুই ঃ কিছু সংখ্যক হাদীস থেকে জানা যায় যে, কেউ যদি মনে করে মানত দ্বারা 'তাকদীর' পরিবর্তিত হয়ে যাবে অথবা যে মানতে কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য শোকরিয়া হিসেবে নেক কাজ করার পরিবর্তে আল্লাহকে বিনিময় হিসেবে কিছু দেয়ার জন্য এভাবে চিন্তা করে যে, তিনি যদি আমার কাজটি করে দেন তাহলে আমি তাঁর জন্য অমুক নেক কাজটি করে দেব। তবে এ ধরনের মান্নত নিষিদ্ধ। হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত হয়েছে যে,

أَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهٰى عَنِ النَّذْرِ وَيَقُوْلُ اِنَّهُ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا وَاِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ –

"একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানত মানতে নিষেধ করতে লাগলেন। তিনি বলছিলেন, মানত কোন কিছু প্রতিরোধ করতে পারে না। তবে এভাবে কৃপণ ব্যক্তির দ্বারা তার কিছু অর্থ ব্যয় করানো হয়। (মুসলিম–আবু দাউদ)

হাদীসের শেষ অংশের অর্থ হলো, কৃপণ ব্যক্তি নিজের ইচ্ছায় আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করার মত বান্দা নয়। মানতের মাধ্যমে সে এ লোভে কিছু খরচ করে যে, এ বিনিময় গ্রহণ করে আল্লাহ তা'আলা হয়তো তার তাকদীর পরিবর্তন করে দেবেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণিত আরেকটি হাদীস হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

اَلنَّذْرُ لاَيُقَدِّمُ شَيْئًا وَلاَ يُؤَخِّرُهُ وَاِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ –

"মানত কোন কাজকে এগিয়ে আনতে কিংবা আশু সংঘটিতব্য কোন কাজকে পিছিয়ে দিতে পারে না। তবে এভাবে কৃপণ ব্যক্তির কিছু অর্থ-সম্পদ খরচ করানো হয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

আরো একটি হাদীসে তিনি বলেছেন ঃ নবী (সা) মানত করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

اِنَّهُ لاَ يَاْتِى بِخَيْرٍ وَاِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ

"এভাবে কোন উপকার বা কল্যাণ হয় না। তবে বখীল কর্তৃক তার অর্থ-সম্পদ থেকে কিছু খরচ করানো হয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম মুসলিম (রা) হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে প্রায় এরূপ বিষয়বস্তু সম্বলিত কিছু সংখ্যক হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। বুখারী ও মুসলিম উভয়ে আরো একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে তারা বলেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

اِنَّ النَّذْرَ لاَ يُقَرِّبُ مِنْ اِبْنِ اٰدَمَ شَيْئًا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ قَدَّرَهُ لَهُ وَلٰكِنَّ النَّذْرَ يُوَافِقُ الْقَدْرَ فَيُخْرِجُ بِذَالِكَ مِنَ الْبَخِيْلِ مَالَمْ يَكُنِ الْبَخِيْلُ يُرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَ –

"আল্লাহ তা'আলা কোন মানুষের তাকদীরে যা নির্ধারিত করেননি, মানত ঐ মানুষকে তার ব্যবস্থা করে দিতে পারে না। তবে মানত তাকদীর অনুসারেই হয়ে থাকে। আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীর এভাবে বখীলের কাছ থেকে সেই বস্তু বের করে নেয় যা সে অন্য কোন কারণে বের করতো না।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আসের (রা) বর্ণিত একটি হাদীস এ বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে তোলে। হাদীসটিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

إِنَّمَا النَّذْرُ مَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللّٰهِ

"যা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য হয় প্রকৃত মানত সেটিই।" (তাহাবী)।

তিন ঃ মানতের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো একটি নিয়ম বা ফর্মূলা বলেছেন। তাহলো, যেসব মানত আল্লাহর আনুগত্যের উদ্দেশ্যে হবে কেবল সে সব মানত পূরণ করতে হবে। আল্লাহর নাফরমানীমূলক কোন মানত কখনো পূরণ করা যাবে না। অনুরূপ কোন ব্যক্তি যে বস্তুর মালিক নয় সে বস্তু দিয়ে কোন মানত করা যায় না। অথবা মানুষের সাধ্যাতীত কোন কাজ দিয়েও মানত করা যায় না। হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

مَنْ نَذَرَ اَنْ يُّطِيْعَ اللّٰهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ اَنْ يَّعْصِ اللّٰهِ فَلاَ يَعْصِهِ

"কেউ যদি মানত করে, সে আল্লাহর আনুগত্য করবে তাহলে যেন সে তাঁর আনুগত্য করে। আর কেউ যদি মানত করে, সে আল্লাহর নাফরমানী করবে তাহলে যেন সে তা না করে।" (বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, তাহাবী)।

সাবেত ইবনে দ্বাহ্হাক বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِيْ مَعْصِيَّةِ اللّٰهِ وَلاَ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ اٰدَمَ

"আল্লাহর অবাধ্যতামূলক কোন বিষয়ে কিংবা যে বস্তু ব্যক্তির মালিকানাধীন নয় এমন বস্তুর ক্ষেত্রে মানত পূরণ করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। (আবু দাউদ)

মুসলিম এ একই বিষয় সম্বলিত হাদীস হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া আবু দাউদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনে আসের (রা) বর্ণিত হাদীসটি এর চেয়েও ব্যাপক ও বিস্তৃত। এ হাদীসে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন এভাবে ঃ

لاَ نَذْرَ وَلاَ يَمِيْنَ فِيْ مَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ اٰدَمَ ، وَلاَ فِيْ مَعْصِيَّةِ اللّٰهِ وَلاَ فِيْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ ـ

"মানুষের আয়ত্বাধীন বা নাগালের মধ্যে নয় এমন কোন কাজে কোন মানত বা শপথ অচল। অনুরূপ আল্লাহর অবাধ্যতামূলক কিংবা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার মত কোন কাজেও মানত বা শপথ কার্যকর হবে না।"

চার ঃ যে কাজে মূলত কোন নেকী নেই এবং ব্যক্তি অযথা কোন অর্থহীন কাজ কিংবা অসহনীয় কঠোর পরিশ্রম অথবা আত্মপীড়নকে নেক কাজ মনে করে তা নিজের জন্য আবশ্যিক করে নিয়েছে তার এরূপ মানত পূরণ না করা উচিত। এ ব্যাপারে নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ অত্যন্ত স্পষ্ট। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন ঃ একবার নবী (সা) খুতবা পেশ করার সময় দেখলেন, এক ব্যক্তি রোদে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, লোকটি কে এবং কেনই বা সে রোদে দাঁড়িয়ে আছে? তাঁকে বলা হলো, লোকটির নাম আবু ইসরাঈল। সে মানত করেছে যে, সে দাঁড়িয়ে থাকবে, বসবে না, ছায়া গ্রহণ করবে না, কারো সাথে কথা বলবে না এবং রোযা রাখবে। একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

مُرُوْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ

"তাকে বলো, সে কথা বলুক, ছায়াতে আশ্রয় গ্রহণ করুক এবং বসুক। তবে রোযা যেন পালন করে।" (বুখারী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মুয়াত্তা)

হযরত উকবা ইবনে আমের জুহানী বলেন আমার বোন খালি পায়ে হেঁটে হজ্জ করার মানত করলো। সে আরো মানত করলো যে, হজ্জের এ সফরে সে মাথায়ও কাপড় দেবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তাকে বলো, সে যেন বাহনে সওয়ার হয়ে হজ্জে যায় এবং মাথায় কাপড় দেয়। (আবু দাউদ ও মুসলিম এ বিষয়ে বেশ কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন তবে তাতে কিছু শাব্দিক তারতম্য আছে) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) উকবা ইবনে আমেরের বোনের এ ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন তার ভাষা হলো,

اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ عَنْ نَذْرِهَا مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ

"তার এ মানতের প্রয়োজন আল্লাহর নেই। তাকে বলো, সে যেন বাহনে সওয়ার হয়ে হজ্জ করতে যায়।" (আবু দাউদ)

আরো একটি হাদীস বর্ণনা প্রসংগে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন ঃ এক ব্যক্তি বললো, আমার বোন পায়ে হেঁটে হজ্জ করার মানত করেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَصْنَعُ بِشَقَاءِ اُخْتِكَ شَيْئًا فَلْتَحُجَّ رَاكِبَةً

"তোমার বোনের কঠোর পরিশ্রমে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। তার উচিত সওয়ারীর পিঠে উঠে হজ্জ করা।" (আবু দাউদ)

হযরত আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (সম্ভবত হজ্জের সফরে) দেখলেন এক বয়োবৃদ্ধ দুর্বল ব্যক্তিকে তার দুই পুত্র ধরাধরি করে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি? বলা হলো, সে পায়ে হেঁটে হজ্জ করার মানত করেছে। একথা শুনে তিনি বললেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ عَنْ تَعْذِيْبِ هٰذَا نَفْسَهُ ، وَاَمَرَهُ اَنْ يَّرْكَبَ

"এ ব্যক্তি নিজে নিজেকে কষ্ট দেবে, তাতে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। এরপর তিনি তাকে বাহনে সওয়ার হতে নির্দেশ দিলেন। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, মুসলিমে হযরত আবু হুরায়রা থেকেও এ একই বিষয়ে হাদীস বর্ণিত হয়েছে)

পাঁচ ঃ কোন মানত পূরণ করা যদি কার্যত অসম্ভব হয় তাহলে তা অন্য কোন ভাবে পূরণ করা যেতে পারে। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেন ঃ মক্কা বিজয়ের দিন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রসূল, আমি এ মর্মে মানত করেছিলাম যে, আল্লাহ যদি আপনার হাতে মক্কা বিজয় দান করেন তাহলে আমি বায়তুল মুকাদ্দাসে দুই রাকআত নামায পড়বো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এখানেই পড়ে নাও। সে আবার জিজ্ঞেস করলো। তিনিও পুনরায় একই জবাব দিলেন। সে আবার জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ شَانَكَ اِذًا তাহলে এখন তোমার মর্জি। অন্য একটি হাদীসে আছে। নবী (সা) বলেছেন ঃ

وَالَّذِىْ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ ، لَوْ صَلَّيْتَ هٰهُنَا لَاَجْزَا عَنْكَ صَلٰوةً فِىْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ –

"সে মহান সত্তার শপথ, যিনি মুহাম্মাদকে ন্যায় ও সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন; তুমি যদি এখানে নামায পড়ে নাও, তাহলে তা বায়তুল মাকদাসে নামায পড়ার বিকল্প হিসেবে যথেষ্ট হবে।" (আবু দাউদ)

ছয় ঃ কেউ যদি তার সমস্ত অর্থ–সম্পদ আল্লাহর পথে খরচ করার জন্য মানত করে তাহলে সে ক্ষেত্রে ফিকাহবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ইমাম মালেক (র) বলেন ঃ এ ক্ষেত্রে তাকে এক–তৃতীয়াংশ সম্পদ দিয়ে দিতে হবে। মালেকীদের মধ্য থেকে 'সাহনূনের' বক্তব্য তাকে এতটা সম্পদ দিয়ে দিতে হবে যতটা দিলে সে কষ্টের মধ্যে পড়বে না। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন ঃ এটা যদি তার 'নযরে তাবাররুর' (নেকীর উদ্দেশ্যে মানত) হয় তাহলে সমস্ত সম্পদ দিয়ে দিতে হবে। আর যদি 'নযরে লাজাজ' (মূর্খতা ও হঠকারিতামূলক মানত) হয় তাহলে সে উক্ত মানত পূরণ করতে পারে কিংবা 'কসম' বা শপথের 'কাফ্ফারা'ও দিতে পারে। এ ব্যাপারে তার স্বাধীনতা রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা বলেন ঃ তাকে যেসব অর্থ–সম্পদের যাকাত দিতে হয় সেসব সম্পদ আল্লাহর পথে দিয়ে দেয়া কর্তব্য। কিন্তু যেসব সম্পদের যাকাত দিতে হয় না, যেমন, বসত বাড়ী এবং অনুরূপ অন্যান্য সম্পদ তার ওপর এ মানত প্রযোজ্য হবে না। হানাফীদের মধ্যে ইমাম যুফারের (র) বক্তব্য হলো, নিজের পরিবার–পরিজনের জন্য দুই মাসের প্রয়োজনীয় খরচ রেখে অবশিষ্ট সমস্ত সম্পদ সাদকা করে দিতে হবে। (উমদাতুল কারী, শাহ ওয়ালী উল্লাহ কৃত মুয়াত্তার শরাহ) এ বিষয়টি সম্পর্কে হাদীসে যা বর্ণিত হয়েছে তাহলো, হযরত কা'ব ইবনে মালেক বলেন, তাবুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করার কারণে যে তিরস্কার ও অসন্তোষের শিকার আমি হয়েছিলাম তা মাফ হয়ে গেলে আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে আরয করলাম যে, আমার তাওবার মধ্যে এ বিষয়টিও অন্তরভুক্ত ছিল যে, আমি আমার সমস্ত সম্পদের মালিকানা স্বত্ব ত্যাগ করে তা আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের পথে দান করে দেব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ না, এরূপ করো না। আমি বললাম, তাহলে অর্ধেক সম্পদ? তিনি বললেন ঃ না, তাও না। আমি আবার বললাম, তাহলে এক–তৃতীয়াংশ? তিনি বললেনঃ হাঁ। (আবু দাউদ) অন্য একটি হাদীসে আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ

তুমি তোমার কিছু সম্পদ যদি নিজের জন্য রেখে দাও তাহলে তা তোমার জন্য সর্বোত্তম হবে। (বুখারী) ইমাম যুহরী বলেন ঃ আমি জানতে পেরেছি যে, হযরত আবু লুবাবা (রা) (তাবুক যুদ্ধের ব্যাপারে তিনিও তিরস্কার ও অসন্তোষের শিকার হয়েছিলেন) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন ঃ আমি আমার সমস্ত সম্পদের মালিকানা ত্যাগ করে তা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পথে সাদকা হিসেবে দিয়ে দিতে চাই। জবাবে নবী (সা) বললেন ঃ সম্পদের এক–তৃতীয়াংশ দিয়ে দেয়াই তোমার জন্য যথেষ্ট। (মুয়াত্তা)

সাত ঃ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কেউ যদি কোন নেক মানত করে তাহলে ইসলাম গ্রহণের পরে কি তা পূরণ করতে হবে? এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফতোয়া হলো, তা পূরণ করতে হবে। বুখারী, আবু দাউদ ও তাহাবীতে হযরত 'উমর সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি জাহেলী যুগে মানত করেছিলেন যে, মসজিদে হারামে এক রাত (কারো কারো বর্ণনায় একদিন) ই'তিকাফ করবেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ফতোয়া জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেনঃ اوف بنذرك 'নিজের মানত পূরণ করো।' কোন কোন ফিকাহবিদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ নির্দেশের অর্থ করেছেন যে, এরূপ করা ওয়াজিব। আবার কেউ কেউ অর্থ করেছেন যে, এরূপ করা মুস্তাহাব।

আট ঃ মৃত ব্যক্তির কোন মানত থাকলে তা পূরণ করা কি ওয়ারিশদের জন্য ওয়াজিব? এ প্রশ্নে ফিকাহবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ইমাম আহামদ, ইসহাক ইবনে রাহাওয়াইয়া, আবু সাওর এবং জাহেরিয়াদের মতে মৃতের দায়িত্বে যদি রোযা বা নামাযের মানত থেকে থাকে তাহলে ওয়ারিশদের জন্য তা পূরণ করা ওয়াজিব। হানাফীদের মতে মৃত ব্যক্তি যদি শারীরিক ইবাদাতের (নামায বা রোযা) মানত করে থাকে তাহলে তা পূরণ করা ওয়ারিশদের জন্য ওয়াজিব নয়। আর যদি আর্থিক ইবাদাতের মানত করে থাকে এবং মৃত ব্যক্তি মৃত্যুর আগে তার ওয়ারিশদের তা পূরণ করার অছিয়ত না করে থাকে তাহলে সে মানতও পূরণ করা ওয়াজিব নয়। কিন্তু সে যদি অছিয়ত করে যায়, তাহলে তা পূরণ করা ওয়াজিব। তবে তার পরিত্যক্ত সম্পদের এক–তৃতীয়াংশের অধিক সম্পদ দিয়ে নয়। এর সাথে মালেকী মাযহাবের মতামতের অনেকটা মিল আছে। শাফেয়ী মাযহাবের মতে, মানত যদি আর্থিক ইবাদাতের না হয়ে অন্য কিছুর হয় কিংবা আর্থিক ইবাদাতেরই হয় আর মৃত ব্যক্তি যদি কোন সম্পদ রেখে না গিয়ে থাকে, তাহলে তার ওয়ারিশদের জন্য আর্থিক ইবাদাতের মানত পূরণ করা ওয়াজিব নয়। তবে মৃত ব্যক্তি যদি সম্পদ রেখে গিয়ে থাকে তাহলে সে অছিয়ত করে থাকুক বা না থাকুক এ ক্ষেত্রে তার ওয়ারিশদের জন্য আর্থিক ইবাদাতের মানত পূরণ করা ওয়াজিব। (শরহে মুসলিম লিন নববী, বাযলুল মাজহুদ–শরহে আবী দাউদ) এ সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস কর্তৃক এ মর্মে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সা'দ ইবনে উবাদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একটি ফতোয়া জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন ঃ আমার মা ইন্তিকাল করেছেন। তিনি একটি মানত করেছিলেন। কিন্তু তা পূরণ করতে পারেননি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তুমি তার সে মানত পূরণ করে দাও। (আবু দাউদ, মুসলিম) ইবনে আব্বাস অন্য একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, এক মহিলা সমুদ্র যাত্রা করার সময় মানত করলো, আমি যদি সহী সালামতে জীবিত

ঘরে ফিরে আসতে পারি তাহলে একমাস রোযা রাখবো। ফিরে আসার পরেই সে মারা গেল। তার বোন ও মেয়ে রসূলুল্লাহর (সা) কাছে এসে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন ঃ তার পক্ষ থেকে তুমি রোযা রাখো। (আবু দাউদ) আবু দাউদ বুরাইদা থেকে অনুরূপ আরো একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, এক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ ধরনের মাসয়ালা জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে সে একই জবাব দিলেন যা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে নির্দেশ রয়েছে তা ওয়াজিব অর্থে না মুস্তাহাব অর্থে তা যেহেতু পরিষ্কার নয় এবং হযরত সা'দ ইবনে উবাদার মায়ের মানত আর্থিক ইবাদাতের মানত ছিল না শারীরিক ইবাদাতের মানত ছিল তাও স্পষ্ট নয় তাই এ মাসয়ালার ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে।

নয় ঃ ভ্রান্ত ও নাজায়েজ প্রকৃতির মানত সম্পর্কে একথা পরিষ্কার যে, তা পূরণ করা ঠিক নয়। তবে এ ধরনের মানতের ক্ষেত্রে কাফ্‌ফারা দিতে হবে কিনা সে বিষয়ে মতভেদ আছে। এ বিষয়ে হাদীসসমূহের বর্ণনাই যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন তাই ফিকাহবিদগণও ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। এক শ্রেণীর বর্ণনায় আছে যে, এ অবস্থায় নবী (সা) কাফ্‌ফারা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ لَا نَذْرَ فِىْ مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ "গোনাহের কাজে কোন মানত করা যায় না। এ ধরনের মানতের কাফফারা হলো শপথ ভঙ্গের কাফ্‌ফারার মত।" (আবু দাউদ) 'উকবা ইবনে আমের জুহানীর বোনের ব্যাপারে (ওপরে ৪নং এ যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, "সে যেন তার মানত ভঙ্গ করে এবং তিন দিন রোযা রাখে।" (মুসলিম, আবু দাউদ) আরেকজন মহিলা যে পায়ে হেঁটে হজ্জ করার মানত করেছিল তার ব্যাপারে নবী (সা) নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, "সে যেন বাহনে সওয়ার হয়ে হজ্জে যায় এবং শপথ ভঙ্গের কাফ্‌ফারা আদায় করে।" (আবু দাউদ) ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِىْ مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيْقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا اَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ -

"কেউ যদি মানত করে এবং কি মানত করলো তা নির্দিষ্ট না করে তাকে শপথ ভঙ্গের কাফ্‌ফারা দিতে হবে। কেউ যদি কোন গোনাহর কাজের মানত করে, তবে তাকে শপথ ভঙ্গের কাফ্‌ফারা দিতে হবে। কেউ যদি এমন বিষয়ের মানত করে যা পূরণ করার সাধ্য তার নেই তাকে শপথ ভঙ্গের কাফ্‌ফারা দিতে হবে। আর কেউ যদি এমন জিনিসের মানত করে যা পূরণ করার সামর্থ তার আছে, তাহলে তাকে সে মানত পূরণ করতে হবে।" (আবু দাউদ)

অন্য দিকে আছে সেসব হাদীস যা থেকে জানা যায় যে, এসব অবস্থায় কাফ্‌ফারা দিতে হবে না। ওপরে ৪নং এ যে ব্যক্তির উল্লেখ করা হয়েছে যে, সে রোদে দাঁড়িয়ে থাকার

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ﴿٩﴾ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴿١٠﴾

আর আল্লাহর মহব্বতে[১১] মিসকীন, ইয়াতীম এবং বন্দীকে[১২] খাবার দান করে[১৩] এবং (তাদেরকে বলে) আমরা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই তোমাদের খেতে দিচ্ছি। আমরা তোমাদের কাছে এর কোন প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা[১৪] পেতে চাই না। আমরা তো আমাদের রবের পক্ষ থেকে সেদিনের আযাবের ভয়ে ভীত, যা হবে কঠিন বিপদ ভরা অতিশয় দীর্ঘ দিন।

এবং কারো সাথে কথা না বলার মানত করেছিল তার কাহিনী উল্লেখ করার পর ইমাম মালেক (র) তাঁর গ্রন্থ মুয়াত্তায় লিখেছেন যে, নবী (সা) তাকে মানত ভঙ্গ করার নির্দেশদানের সাথে সাথে কাফ্‌ফারা আদায় করার নির্দেশও দিয়েছিলেন বলে কোন সূত্র থেকেই আমি জানতে পারিনি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَاَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا فَلْيَدَعْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ فَاِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا -

"কেউ কোন বিষয়ে মানত করার পর যদি দেখে যে, অন্য একটি জিনিস তার চেয়ে উত্তম তাহলে সে যেন তা পরিত্যাগ করে এবং যেটি উত্তম সেটি গ্রহণ করে। আর ঐটি ছেড়ে দেয়াই হবে তার কাফ্‌ফারা।" (আবু দাউদ)

বায়হাকীর মতে এ হাদীসটি এবং হযরত আবু হুরাইরার রেওয়ায়াতের 'যে কাজটি উত্তম সেটি করবে আর এরূপ করাই এর কাফ্‌ফারা' এ অংশটুকু প্রমাণিত নয়। এসব হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম নববী (র) শরহে মুসলিমে লিখছেন; "ইমাম মালেক (র) শাফেয়ী (র), আবু হানীফা (র), দাউদ যাহেরী এবং সংখ্যাগুরু আলেমদের মতে গোনাহর কাজের মানত বাতিল এবং তা পূরণ না করলে কাফ্‌ফারা দিতে হবে না। কিন্তু ইমাম আহমাদের (র) মতে কাফ্‌ফারা দিতে হবে।"

১১. মূল শব্দ হলো على حبه । অধিকাংশ মুফাস্‌সির حُبِّه এর ه শব্দটিকে (طعام) খাদ্যের সর্বনাম হিসেবে নির্ধারিত করেছেন। তাঁরা এর অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, খাদ্য অত্যন্ত প্রিয় ও আকর্ষণীয় হওয়া সত্ত্বেও এবং নিজেরাই খাদ্যের মুখাপেক্ষী হওয়া সত্ত্বেও নেক্‌কার লোকেরা তা অন্যদেরকে খাওয়ান। ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ হলো على حب الاطعام অর্থাৎ গরীব ও দুস্থদের খাওয়ানোর আকাংখা ও উৎসাহের

فَوَقٰهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا ﴿١١﴾ وَجَزٰىهُمْ بِمَا صَبَرُوْا
جَنَّةً وَّحَرِيْرًا ﴿١٢﴾ مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ۚ لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا
زَمْهَرِيْرًا ﴿١٣﴾ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا ﴿١٤﴾ وَيُطَافُ
عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا۠ ﴿١٥﴾ قَوَارِيْرَا۠ مِنْ فِضَّةٍ
قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ﴿١٦﴾ وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا ﴿١٧﴾

আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সেদিনের অকল্যাণ থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে সজীবতা ও আনন্দ দান করবেন।[১৫] আর তাদের সবরের বিনিময়ে[১৬] তাদেরকে জান্নাত ও রেশমী পোশাক দান করবেন। তারা সেখানে উঁচু আসনের ওপরে হেলান দিয়ে বসবে। সেখানে রোদের উত্তাপ কিংবা শীতের তীব্রতা তাদের কষ্ট দেবে না। জান্নাতের বৃক্ষরাজির ছায়া তাদের ওপর ঝুঁকে পড়ে ছায়া দিতে থাকবে। আর তার ফলরাজি সবসময় তাদের নাগালের মধ্যে থাকবে (তারা যেভাবে ইচ্ছা চয়ন করতে পারবে)। তাদের সামনে রৌপ্য পাত্র[১৭] ও স্বচ্ছ কাঁচের পাত্রসমূহ পরিবেশিত হতে থাকবে। কাঁচ পাত্রও হবে রৌপ্য জাতীয় ধাতুর[১৮] যা (জান্নাতের ব্যবস্থাপকরা) যথাযথ পরিমাণে পূর্ণ করে রাখবে।[১৯] সেখানে তাদের এমন সূরা পাত্র পান করানো হবে যাতে শুকনো আদার সংমিশ্রণ থাকবে।

কারণে তারা এ কাজ করে থাকে। হযরত ফুদাইল ইবনে আয়াদ্ব ও আবু সুলায়মান আদ–দারানী বলেন, তারা আল্লাহ তা'আলার মহব্বতে এরূপ করে। আমাদের মতে পরবর্তী আয়াতাংশ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ (আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যেই তোমাদের খাওয়াচ্ছি) এ অর্থকেই সমর্থন করে।

১২. প্রাচীনকালে রীতি ছিল বন্দীদের হাতকড়া ও বেড়ী পরিয়ে প্রতিদিন বাইরে বের করে আনা হতো। তারপর তারা রাস্তায় রাস্তায় ও মহল্লায় মহল্লায় ভিক্ষা করে ক্ষুধা নিবারণ করতো। পরবর্তীকালে ইসলামী সরকার এ কুপ্রথাকে উচ্ছেদ করে। (কিতাবুল খারাজ, ইমাম আবু ইউসুফ, পৃষ্ঠা ১৫০, মুদ্রণ ১৩৮২ হিঃ) এ আয়াতে বন্দী বলতে কাফের হোক বা মুসলমান, যুদ্ধবন্দী হোক বা অপরাধের কারণে বন্দী হোক সব রকম বন্দীকে বুঝানো হয়েছে। বন্দী অবস্থায় তাদেরকে খাদ্য দেয়া হোক বা ভিক্ষা করানো হোক, সর্বাবস্থায় একজন অসহায় মানুষকে—যে তার খাবার সংগ্রহের জন্য নিজে কোন চেষ্টা করতে পারে না—খাবার দেয়া অতি বড় নেকী ও সওয়াবের কাজ।

১৩. কোন গরীবকে খেতে দেয়া যদিও বড় নেকীর কাজ, কিন্তু কোন অভাবী মানুষের অন্যান্য অভাব পূরণ করাও একজন ক্ষুধার্ত মানুষকে খেতে দেয়ার মতই নেক কাজ। যেমন কেউ কাপড়ের মুখাপেক্ষী, কেউ অসুস্থ তাই চিকিৎসার মুখাপেক্ষী অথবা কেউ ঋণগ্রস্ত, পাওনাদার তাকে অস্থির ও অতিষ্ঠ করে তুলছে। এসব লোককে সাহায্য করা খাবার খাওয়ানোর চেয়ে কম নেকীর কাজ নয়। তাই এ আয়াতটিতে নেকীর একটি বিশেষ অবস্থা ও ক্ষেত্রকে তার গুরুত্বের কারণে উদাহরণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে মাত্র। অন্যথায় এর মূল উদ্দেশ্য অভাবীদের সাহায্য করা।

১৪. গরীবদের খাবার দেয়ার সময় মুখে একথা বলতে হবে এমনটা জরুরী নয়। মনে মনেও একথা বলা যেতে পারে। আল্লাহর কাছে মুখে বলার যে মর্যাদা এভাবে বলারও সে একই মর্যাদা। তবে একথা মুখে বলার উল্লেখ করা হয়েছে এ জন্য যে, যাকে সাহায্য করা হবে তাকে যেন নিশ্চিত করা যায় যে, আমরা তার কাছে কোন প্রকার কৃতজ্ঞতা অথবা বিনিময় চাই না, যাতে সে চিন্তামুক্ত হয়ে খাবার গ্রহণ করতে পারে।

১৫. অর্থাৎ চেহারার সজীবতা ও মনের আনন্দ। অন্য কথায় কিয়ামতের দিনের সমস্ত কঠোরতা ও ভয়াবহতা শুধু কাফেরদের জন্যই নির্দিষ্ট হবে। নেক্‌কার লোকেরা সেদিন কিয়ামতের সব রকম দুঃখ-কষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে এবং আনন্দিত ও উৎফুল্ল হবে। একথাটিই সূরা আম্বিয়াতে এভাবে বলা হয়েছে; "চরম হতবুদ্ধিকর সে অবস্থা তাদেরকে অস্থির ও বিহ্বল করবে না। ফেরেশতারা অগ্রসর হয়ে অত্যন্ত সম্মানের সাথে তাদের গ্রহণ করবে এবং বলবে এটা তোমাদের সেদিন যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হতো।" (আয়াত, ১০৩) এ বিষয়টিই সূরা নাম্‌লে আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে এভাবে ঃ "যে ব্যক্তি সৎকাজ নিয়ে আসবে সে তার তুলনায় অধিক উত্তম প্রতিদান লাভ করবে। এসব লোক সেদিনের ভয়াবহতা থেকেও নিরাপদ থাকবে।" (আয়াত, ৮৯)

১৬. এখানে 'সবর' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বরং প্রকৃতপক্ষে সৎকর্মশীল ঈমানদারদের গোটা পার্থিব জীবনকেই 'সবর' বা ধৈর্যের জীবন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। জ্ঞান হওয়ার বা ঈমান আনার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোন ব্যক্তির নিজের অবৈধ আশা আকাংখাকে অবদমিত করা, আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমাসমূহ মেনে চলা, আল্লাহর নির্ধারিত ফরযসমূহ পালন করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজের সময়, নিজের অর্থ-সম্পদ, নিজের শ্রম, নিজের শক্তি ও যোগ্যতা এমনকি প্রয়োজনের মুহূর্তে প্রাণ পর্যন্ত কুরবানী করা, আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এরূপ সমস্ত লোভ-লালসা ও আকর্ষণকে পদাঘাত করা, সত্য ও সঠিক পথে চলতে যেসব বিপদ ও দুঃখ-কষ্ট আসে তা সহ্য করা, হারাম পন্থায় লাভ করা যায় এরূপ প্রতিটি স্বার্থ ও ভোগের উপকরণ পরিত্যাগ করা, ন্যায় ও সত্যপ্রীতির কারণে যে ক্ষতি, মর্মবেদনা ও দুঃখ-কষ্ট এসে ঘিরে ধরে তা বরদাশত করা—এসবই আল্লাহর এ ওয়াদার ওপর আস্থা রেখে করা যে, এ সদাচরণের সুফল এ পৃথিবীতে নয় বরং মৃত্যুর পরে আরেকটি জীবনে পাওয়া যাবে। এটা এমন একটা কর্মপন্থা যা মু'মিনের গোটা জীবনকেই সবরের জীবনে রূপান্তরিত করে। এটা সার্বক্ষণিক সবর, স্থায়ী সবর, সর্বাত্মক সবর এবং জীবনব্যাপী সবর। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারা, টীকা ৬০; আলে ইমরান, টীকা ১৩, ১০৭, ১৩১; আল আন'আম, টীকা ২৩; আল আনফাল, টীকা ৩৭, ৪৭; ইউনুস, টীকা ৯; হূদ,

عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ﴿١٨﴾ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ۚ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا ﴿١٩﴾ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿٢٠﴾ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ ۖ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ ۚ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿٢١﴾ إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا ﴿٢٢﴾

এটি জান্নাতের একটি ঝর্ণা যা সালসাবীল নামে অভিহিত।[২০] তাদের সেবার জন্য এমন সব কিশোর বালক সদা তৎপর থাকবে যারা চিরদিনই কিশোর থাকবে। তুমি তাদের দেখলে মনে করবে যেন ছড়ানো ছিটানো মুক্তা।[২১] তুমি সেখানে যে দিকেই তাকাবে সেদিকেই শুধু নিয়ামত আর ভোগের উপকরণের সমাহার দেখতে পাবে এবং বিশাল সাম্রাজ্যের সাজ-সরঞ্জাম তোমাদের দৃষ্টিগোচর হবে।[২২] তাদের পরিধানে থাকবে মিহি রেশমের সবুজ পোশাক এবং মখমল ও সোনালী কিংখাবের বস্ত্ররাজি।[২৩] আর তাদেরকে রৌপ্যের কঙ্কন পরানো হবে।[২৪] আর তাদের রব তাদেরকে অতি পবিত্র শরাব পান করাবেন।[২৫] এ হচ্ছে তোমাদের জন্য প্রতিদান। কারণ, তোমাদের কাজ কর্ম মূল্যবান প্রমাণিত হয়েছে।[২৬]

টীকা ১১; আর রা'দ, টীকা ৩৯; আন নাহ্ল, টীকা ৯৮; মারয়াম, টীকা ৪০; আল ফুরকান, টীকা ৯৪; আল কাসাস, টীকা ৭৫, ১০০; আল আনকাবুত, টীকা ৯৭; লোকমান, টীকা ২৯, ৫৬; আস সাজদা, টীকা ৩৭; আল আহযাব, টীকা ৫৮; আয্ যুমার, টীকা ৩২; হা-মীম আস সাজদা, টীকা ৩৮; আশ শুরা, টীকা ৫৩।)

১৭. সূরা যুখরুফের ৭১ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাদের সামনে সবসময় স্বর্ণপাত্রসমূহ পরিবেশিত হতে থাকবে। এ থেকে জানা গেল যে, সেখানে কোন সময় স্বর্ণপাত্র এবং কোন সময় রৌপ্য পাত্র ব্যবহার করা হবে।

১৮. অর্থাৎ তা হবে রৌপ্যের তৈরী কিন্তু কাঁচের মত স্বচ্ছ। এ ধরনের রৌপ্য এ পৃথিবীতে নেই। এটা জান্নাতের একটা বৈশিষ্ট যে, সেখানে কাঁচের মত স্বচ্ছ রৌপ্যপাত্র জান্নাতবাসীদের দস্তরখানে পরিবেশন করা হবে।

১৯. অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার চাহিদা অনুপাতে পানপাত্র ভরে ভরে দেয়া হবে। তা তাদের চাহিদার চেয়ে কমও হবে না আবার বেশীও হবে না। অন্য কথায়, জান্নাতের খাদেমরা এত সতর্ক এবং সুবিবেচক হবে যে, যাকে তারা পানপাত্র পরিবেশন করবে সে কি পরিমাণ শরাব পান করতে চায় সে সম্পর্কে তারা পুরোপুরি আন্দাজ করতে পারবে।

(জান্নাতের শরাবের বৈশিষ্ট সম্পর্কে জানতে হলে দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আস্ সাফফাত, ৪৫ থেকে ৪৭ আয়াত, টীকা ২৪ থেকে ২৭; সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত ১৫, টীকা ২২; আত্ তূর, আয়াত ২৩, টীকা ১৮; আল ওয়াকিয়া, আয়াত ১৯, টীকা ১০।)

২০. আরবরা শরাবের সাথে শুকনো আদা মেশানো পানির সংমিশ্রণ খুব পছন্দ করতো। তাই বলা হয়েছে, সেখানেও তাদের এমন শরাব পরিবেশন করা হবে যাতে শুকনো আদার সংমিশ্রণ থাকবে। কিন্তু তা এমন সংমিশ্রণ হবে না যে, তার মধ্যে শুকনো আদা মিশিয়ে তারপর পানি দেয়া হবে। বরং তা হবে একটা প্রাকৃতিক ঝর্ণাধারা যার মধ্যে আদার খোশবু থাকবে কিন্তু তিক্ততা থাকবে না। সে জন্য তার নাম হবে 'সালসাবীল'। 'সালবাসীল' অর্থ এমন পানি যা মিঠা, মৃদু ও সুস্বাদু হওয়ার কারণে সহজেই গলার নীচে নেমে যায়। অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে 'সালসাবীল' শব্দটি এখানে উক্ত ঝর্ণাধারার বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, বিশেষ্য হিসেবে নয়।

২১. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আস সাফ্ফাত, টীকা ২৬; আত তূর, টীকা ১৯; আল ওয়াকিয়া, টীকা ৯।

২২. অর্থাৎ দুনিয়াতে কোন ব্যক্তি যত দরিদ্র ও নিসম্বলই হোক না কেন সে যখন তার নেক্ কাজের কারণে জান্নাতে যাবে তখন সেখানে এমন শানশওকত ও মর্যাদার সাথে থাকবে যেন সে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি।

২৩. এই একই বিষয় সূরা আল কাহ্ফের ৩১ আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَيَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَّ اِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِـئِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ –

"তারা (অর্থাৎ জান্নাতবাসীরা) মিহি রেশম এবং মখমল ও কিংখাবের সবুজ পোশাক পরিধান করবে। সুউচ্চ আসনে হেলান দিয়ে বসবে।"

এ কারণে সেসব মুফাস্সিরদের মতামত সঠিক বলে মনে হয় না যারা বলেন, এর অর্থ এমন কাপড় যা তাদের আসন ও পালংকের ওপর ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে অথবা সেসব কিশোর বালকদের পোশাক-পরিচ্ছদ যারা তাদের সেবা ও খেদমতের জন্য সদা তৎপর থাকবে।

২৪. সূরা আল কাহফের ৩১ আয়াতে বলা হয়েছে, يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ "তাদের সেখানে স্বর্ণের কংকন বা চুড়ি দ্বারা সজ্জিত ও শোভিত করা হবে।" এ একই বিষয় সূরা হজ্জের ২৩ আয়াত এবং সূরা ফাতেরের ৩৩ আয়াতেও বলা হয়েছে। এসব আয়াত একত্রে মিলিয়ে দেখলে তিনটি অবস্থা হওয়া সম্ভব বলে মনে হয়। এক, তারা ইচ্ছা করলে কোন সময় সোনার কংকন পরবে আবার ইচ্ছা করলে কোন সময় রূপার কংকন পরবে। তাদের ইচ্ছা অনুসারে দু'টি জিনিসই প্রস্তুত থাকবে। দুই, তারা সোনা ও রূপার কংকন এক সাথে পরবে। কারণ দু'টি একত্র করলে সৌন্দর্য অনেক বৃদ্ধি পায়। তিন, যার ইচ্ছা সোনার কংকন পরিধান করবে এবং যার ইচ্ছা রূপার কংকন ব্যবহার করবে। এখানে প্রশ্ন হলো, অলংকার পরিধান করে মেয়েরা, কিন্তু পুরুষদের অলংকার পরানোর অর্থ ও তাৎপর্য কি হতে পারে? এর জবাব হলো, প্রাচীনকালে রাজা-বাদশাহ এবং নেতা

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ﴿٢٣﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿٢٤﴾ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٢٥﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿٢٧﴾ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ۚ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿٢٨﴾ إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٢٩﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٠﴾ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣١﴾

২ রুকূ'

হে নবী, আমিই তোমার ওপরে এ কুরআন অল্প অল্প করে নাযিল করেছি।[২৭] তাই তুমি ধৈর্যের সাথে তোমার রবের হুকুম পালন করতে থাকো[২৮] এবং এদের মধ্যকার কোন দুষ্কর্মশীল এবং সত্য অমান্যকারীর কথা শুনবে না।[২৯] সকাল সন্ধ্যায় তোমার রবের নাম স্মরণ করো। রাতের বেলায়ও তার সামনে সিজ্‌দায় অবনত হও। রাতের দীর্ঘ সময় তাঁর তাসবীহ অর্থাৎ পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকো।[৩০] এসব লোক তো দ্রুত লাভ করা যায় এমন জিনিসকে (দুনিয়াকে) ভালবাসে এবং ভবিষ্যতে যে কঠিন দিন আসছে তাকে উপেক্ষা করে চলছে।[৩১] আমিই এদের সৃষ্টি করেছি এবং এদের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও সন্ধিস্থল মজবুত করেছি। আর যখনই চাইবো তাদের আকার-আকৃতি পরিবর্তন করে দেব।[৩২] এটি একটি উপদেশ বাণী। এখন কেউ চাইলে তার রবের দিকে যাওয়ার পথ অবলম্বন করতে পারে। তোমাদের চাওয়ায় কিছুই হয় না যদি আল্লাহ না চান।[৩৩] আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সুবিজ্ঞ। যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে তাঁর রহমতের মধ্যে শামিল করেন। আর জালেমদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কঠিন শাস্তি।[৩৪]

ও সমাজপতিদের রীতি ছিল তারা হাত, গলা ও মাথার মুকুটে নানা রকমের অলংকার ব্যবহার করতো। আমাদের এ যুগেও বৃটিশ ভারতের রাজা ও নবাবদের মধ্যে পর্যন্ত এ

রীতি প্রচলিত ছিল। সূরা যুখরুফে বলা হয়েছে, হযরত মূসা (আ) যখন সাদাসিধে পোশাকে শুধু একখানা লাঠি হাতে নিয়ে ফেরাউনের রাজ দরবারে উপস্থিত হয়ে তাকে বললেন যে, তিনি বিশ্ব–জাহানের রব আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত রসূল তখন ফেরাউন তার সভাসদদের বললো ঃ সে এ অবস্থায় আমার সামনে এসেছে। দূত বটে।

فَلَوْلَآ اُلْقِىَ عَلَيْهِ اَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْ جَآءَ مَعَهُ الْمَلٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ

"সে যদি যমীন ও আসমানের বাদশাহর পক্ষ থেকেই প্রেরিত হয়ে থাকতো তাহলে তার সোনার কংকন নাই কেন? কিংবা ফেরেশতাদের একটি বাহিনী অন্তত তার আরদালী হয়ে আসতো।" (আয যুখরুফ, ৫৩ আয়াত)

২৫. ইতিপূর্বে দু' প্রকার শরাবের কথা বলা হয়েছে। এর এক প্রকার শরাবের মধ্যে কর্পূরের সুগন্ধি যুক্ত ঝর্ণার পানির সংমিশ্রণ থাকবে। অন্য প্রকারের শরাবের মধ্যে 'যানজাবীল' ঝর্ণার পানির সংমিশ্রণ থাকবে। এ দু' প্রকার শরাবের কথা বলার পর এখানে আবার আর একটি শরাবের উল্লেখ করা এবং সাথে সাথে একথা বলা যে, তাদের রব তাদেরকে অত্যন্ত পবিত্র শরাব পান করাবেন এর অর্থ এই যে, এটা অন্য কোন প্রকার উৎকৃষ্টতর শরাব হবে যা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ হিসেবে তাদের পান করানো হবে।

২৬. মূল বাক্য হলো, كَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا অর্থাৎ তোমাদের কাজ-কর্ম মূল্যবান প্রমাণিত হয়েছে। سعى অর্থ বান্দা সারা জীবন দুনিয়াতে যেসব কাজ–কর্ম আঞ্জাম দিয়েছে বা দেয় তা সবই। যেসব কাজে সে তার শ্রম দিয়েছে এবং যেসব লক্ষে সে চেষ্টা–সাধনা করেছে তার সমষ্টি হলো তার سعى আর তা মূল্যবান প্রমাণিত হওয়ার অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলার কাছে তা মূল্যবান বলে স্বীকৃত হয়েছে। শোকরিয়া কথাটি যখন বান্দার পক্ষ থেকে আল্লাহর জন্য হয় তখন অর্থ হয় তাঁর নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা। আর যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য হয় তখন তার অর্থ হয় আল্লাহ তা'আলা তার কাজ–কর্মের মূল্য দিয়েছেন। এটি মনিব বা প্রভুর একটি বড় মেহেরবানী যে, বান্দা যখন তাঁর মর্জি অনুসারে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য আঞ্জাম দেয় মনিব তখন তার মূল্য দেন বা স্বীকৃতি দেন।

২৭. এখানে বাহ্যত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হলেও বক্তব্যের মূল লক্ষ কাফেররা। মক্কার কাফেররা বলতো, এ কুরআন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে চিন্তা–ভাবনা করে রচনা করছেন। অন্যথায়, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন ফরমান এলে তা একবারেই এসে যেতো। কুরআনে কোন কোন যায়গায় তাদের এ অভিযোগ উদ্ধৃত করে তার জবাব দেয়া হয়েছে। (উদাহরণস্বরূপ দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আন নাহল, টীকা ১০২, ১০৪, ১০৫, ১০৬; বনী ইসরাঈল, টীকা ১১৯।) এখানে তাদের অভিযোগ উদ্ধৃত না করেই আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা করেছেন যে, কুরআনের নাযিলকারী আমি নিজেই। অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রচয়িতা নন। আমি নিজেই তা ক্রমান্বয়ে নাযিল করছি। অর্থাৎ আমার প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার দাবী হলো, আমার বাণীকে একই সাথে একটি গ্রন্থের আকারে নাযিল না করে অল্প অল্প করে নাযিল করা।

২৮. অর্থাৎ তোমার 'রব' তোমাকে যে বিরাট কাজ আঞ্জাম দেয়ার আদেশ দিয়েছেন তা আঞ্জাম দেয়ার পথে যে দুঃখ–যাতনা ও বিপদ–মুসিবত আসবে তার জন্য 'সবর' করো। যাই ঘটুক না কেন সাহস ও দৃঢ়তার সাথে তা বরদাশত করতে থাকো এবং এ দৃঢ়তা ও সাহসিকতায় যেন কোন বিচ্যুতি আসতে না পারে।

২৯. অর্থাৎ তাদের কারো চাপে পড়ে দীনে হকের প্রচার ও প্রসারের কাজ থেকে বিরত হয়ো না এবং কোন দুষ্কর্মশীলের কারণে দীনের নৈতিক শিক্ষায় কিংবা সত্য অস্বীকারকারীর কারণে দীনের আকীদা–বিশ্বাসে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করতেও প্রস্তুত হয়ো না। যা হারাম ও নাজায়েয তাকে খোলাখুলি হারাম ও নাজায়েয বলো, এর সমালোচনার ব্যাপারে কিছুটা নমনীয় হওয়ার জন্য কোন দুষ্কর্মশীল যতই চাপ দিক না কেন। যেসব আকীদা–বিশ্বাস বাতিল তাকে খোলাখুলি বাতিল বলে ঘোষণা করো। আর যা হক তাকে প্রকাশ্যে হক বলে ঘোষণা করো, এ ক্ষেত্রে কাফেররা তোমার মুখ বন্ধ করার জন্য কিংবা এ ব্যাপারে কিছুটা নমনীয়তা দেখানোর জন্য তোমার ওপর যত চাপই প্রয়োগ করুক না কেন।

৩০. কুরআনের প্রতিষ্ঠিত রীতি হলো যেখানেই কাফেরদের মোকাবিলায় ধৈর্য ও দৃঢ়তা দেখানোর উপদেশ দেয়া হয়েছে সেখানে এর পরপরই আল্লাহকে স্মরণ করার ও নামাযের হুকুম দেয়া হয়েছে। এ থেকে আপনা আপনি প্রকাশ পায় যে, সত্য দীনের পথে সত্যের দুশমনদের বাধার মোকাবিলা করার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন তা এভাবেই অর্জিত হয়। সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহকে স্মরণ করার অর্থ সবসময় আল্লাহকে স্মরণ করাও হতে পারে। তবে সময় নির্দিষ্ট করে যখন আল্লাহকে স্মরণ করার হুকুম দেয়া হয় তখন তার অর্থ হয় নামায। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম বলেছেন ঃ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا আরবী ভাষায় بكرة শব্দের অর্থ সকাল। আর أصيل শব্দটি সূর্য মাথার ওপর থেকে হেলে পড়ার সময় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় বুঝাতে ব্যবহার করা হয় যার মধ্যে যোহর এবং আসরের সময়ও শামিল। এরপরে বলেছেন ঃ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ । রাত শুরু হয় সূর্যাস্তের পরে। তাই রাতের বেলা সিজ্‌দা করার নির্দেশের মধ্যে মাগরিব এবং 'ঈশার দু' ওয়াক্তের নামাযই অন্তরভুক্ত হয়ে যায়। এর পরের কথাটি "রাতে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাঁর তাসবীহ বা পবিত্রতা বর্ণনা কর" তাহাজ্জুদ নামাযের প্রতি স্পষ্টভাবে ইংগিত করে। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, বনী ইসরাঈল, টীকা ৯২ থেকে ৯৭; আল মুয্‌যাম্মিল, টীকা ২।) এ থেকে একথাও জানা গেল যে, ইসলামে প্রথম থেকে এগুলোই ছিল নামাযের সময়। তবে সময় ও রাক'আত নির্দিষ্ট করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে মে'রাজের সময়।

৩১. অর্থাৎ কুরাইশ গোত্রের এসব কাফেররা যে কারণে আখলাক ও আকীদা–বিশ্বাসের ক্ষেত্রে গোমরাহীকে আঁকড়ে ধরে থাকতে আগ্রহী এবং তাদের কান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 'দাওয়াতে হক' বা সত্যের আহবানের প্রতি অমনযোগী, প্রকৃতপক্ষে সে কারণ হলো, তাদের দুনিয়া পূজা, আখেরাত সম্পর্কে নিরুদ্বিগ্নতা, উদাসীনতা ও বেপরোয়া ভাব। তাই একজন সত্যিকার আল্লাহভীরু মানুষের পথ এবং এদের পথ এতটা ভিন্ন যে, এ দু'টি পথের মধ্যে সমঝোতার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

৩২. মূল বাক্য হলো, إِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلاً । এ আয়াতাংশের কয়েকটি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হতে পারে, যখনই ইচ্ছা আমি তাদের ধ্বংস করে তাদের স্থলে অন্য মানুষদের নিয়ে আসতে পারি, যারা তাদের কাজ–কর্ম ও আচার –আচরণে এদের থেকে ভিন্ন প্রকৃতির হবে। এর দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, যখনই ইচ্ছা আমি এদের আকার–আকৃতি পরিবর্তন করে দিতে পারি। অর্থাৎ আমি যেমন কাউকে সুস্থ ও নিখুঁত অংগ–প্রত্যংগের অধিকারী করে সৃষ্টি করতে সক্ষম তেমনি কাউকে পুরোপরি পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে দিতে এবং কাউকে আংশিক পক্ষাঘাতের দ্বারা মুখ বাঁকা করে দিতে আবার কাউকে কোন রোগ বা দুর্ঘটনার শিকার বানিয়ে পংগু করে দিতেও সক্ষম। তৃতীয় অর্থ হলো, যখনই ইচ্ছা মৃত্যুর পর আমি এদেরকে পুনরায় অন্য কোন আকার আকৃতিতে সৃষ্টি করতে পারি।

৩৩. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল মুদ্দাস্‌সির, টীকা ৪১ (তাছাড়াও দেখুন, সূরা আদ দাহরের ১ নং পরিশিষ্ট)।

৩৪. এ সূরার ভূমিকাতে আমরা এর ব্যাখ্যা করেছি। (তাছাড়াও সূরা আদ দাহরের ২ নং পরিশিষ্ট দেখুন।)

পরিশিষ্ট—১

৩৩নং টীকার সাথে সংশ্লিষ্ট

এ আয়াতগুলোতে তিনটি কথা বলা হয়েছে। এক, কেউ চাইলে তার রবের দিকে যাওয়ার পথ অবলম্বন করতে পারে। দুই, যদি আল্লাহ না চান তাহলে শুধু তোমাদের চাওয়ায় কিছুই হয় না। তিন, আল্লাহ অত্যন্ত কুশলী, সূক্ষ্মদর্শী ও মহাজ্ঞানী। এ তিনটি কথা সম্পর্কে যদি ভালভাবে চিন্তা করা যায় তাহলে মানুষের বাছাই বা পছন্দ করার স্বাধীনতা এবং আল্লাহর ইচ্ছার মধ্যকার সম্পর্ক খুব ভালভাবেই বুঝা যায় এবং তাকদীর সম্পর্কে মানুষের মনে যেসব জটিলতা দেখা যায় তা পরিষ্কার হয়ে যায়।

প্রথম আয়াত থেকে জানা যায় যে, এ পৃথিবীতে মানুষকে যে ইখতিয়ার বা স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে তা শুধু এতটুকু যে, এখানে জীবন যাপনের জন্য যেসব ভিন্ন ভিন্ন পথ তার সামনে আসে সে তার মধ্য থেকে কোন একটি পথ অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত নেবে। গ্রহণ বা বাছাই করার এরূপ অনেক স্বাধীনতা (Freedom of Choice) আল্লাহ তা'আলা তাকে দিয়েছেন। যেমন, এক ব্যক্তির সামনে যখন তার জীবিকা উপার্জনের প্রশ্ন দেখা দেয় তখন তার সামনে অনেকগুলো পথ থাকে। এসব পথের মধ্যে কিছু সংখ্যক থাকে হালাল পথ। যেমন, সবরকম বৈধ শ্রমকর্ম, চাকুরি–বাকুরি, ব্যবসায়–বাণিজ্য, অথবা শিল্প ও কারিগরী কিংবা কৃষি। আবার কিছু সংখ্যক থাকে হারাম পথ। যেমন, চুরি–ডাকাতি, রাহাজানি, পকেট মারা, ব্যভিচার, সুদখোরী, জুয়া, ঘুষ এবং হারাম প্রকৃতির সবরকম চাকুরি–বাকুরি ও ব্যবসায়–বাণিজ্য ইত্যাদি। এসব পথের মধ্য থেকে কোন্ পথটি সে বেছে নেবে এবং কিভাবে সে তার জীবিকা উপার্জন করতে চায় সে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইখতিয়ার মানুষকেই দেয়া হয়েছে। অনুরূপ নৈতিক চরিত্রেরও বিভিন্ন ঢং বা প্রকৃতি

আছে। এক দিকে আছে দীনদারী, আমানতদারী, ভদ্রতা, শিষ্টাচার, ইনসাফ, দয়ামায়া, সমবেদনা এবং সতীত্ব ও পবিত্রতার মত উন্নত স্বভাব ও গুণাবলী। অন্যদিকে আছে বদমাইশী, নীচতা, জুলুম–অত্যাচার, বেঈমানী, বখাটেপনা, বেহুদাপনা ও অভদ্রতার মত হীন স্বভাবসমূহ। এর মধ্য থেকে যে ঢং ও প্রকৃতির নৈতিক চরিত্রের পথ বা দোষ–গুণ সে অবলম্বন করতে চায় তা করার পূর্ণ স্বাধীনতা তার আছে। আদর্শ ও ধর্মের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। এ ক্ষেত্রেও মানুষের সামনে বহু পথ খোলা আছে। নাস্তিকতা তথা আল্লাহকে অস্বীকার করা, শিরক ও মূর্তিপূজা, শিরক ও তাওহীদের বিভিন্ন সংমিশ্রণ এবং আল্লাহর আনুগত্যের একমাত্র নিখাদ ধর্ম কুরআন যার শিক্ষা দেয়। এর মধ্যেও মানুষ কোন্‌টিকে গ্রহণ করতে চায় সে সিদ্ধান্ত নেয়ার ইখতিয়ারও মানুষের হাতেই ছেড়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা জোর করে তার ওপরে কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেন না যে, সে নিজে হালাল রুজি খেতে চায় কিন্তু আল্লাহ তাকে হারামখোর হতে বাধ্য করছেন অথবা সে কুরআনের অনুসরণ করতে চায় কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাকে জোরপূর্বক নাস্তিক, মুশরিক অথবা কাফের বানিয়ে দিচ্ছেন। অথবা সে চায় সৎ মানুষ হতে কিন্তু আল্লাহ খামকা তাকে অসৎ বানিয়ে দিচ্ছেন।

কিন্তু পছন্দ ও নির্বাচনের এ স্বাধীনতার পরেও মানুষের যা ইচ্ছা তাই করতে পারা আল্লাহর ইচ্ছা, তার অনুমোদন ও তাওফীক দানের ওপর নির্ভর করে। মানুষ যে কাজ করার আকাংখা, ইচ্ছা বা সংকল্প করেছে তা মানুষকে করতে দেয়ার ইচ্ছা যদি আল্লাহর থাকে তবেই সে তা করতে পারে। অন্যথায় সে যত চেষ্টাই করুক না কেন আল্লাহর অনুমোদন ও তার ইচ্ছা ছাড়া সে কিছুই করতে সক্ষম নয়। দ্বিতীয় আয়াতে একথাটিই বলা হয়েছে। এ ব্যাপারটিকে এভাবে বুঝতে চেষ্টা করুন যে, দুনিয়ার সব মানুষকে যদি সব ক্ষমতা ও ইখতিয়ার দিয়ে দেয়া হতো আর এ বিষয়টিও তার ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেয়া হতো যে, সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে তাহলে সারা দুনিয়ার সব ব্যবস্থাপনা ও নিয়ম–শৃংখলা ধ্বংস এবং ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতো। যাকে ইচ্ছা হত্যা করার অবাধ স্বাধীনতা পেলে একজন হত্যাকারীই সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে হত্যা করার জন্য যথেষ্ট ছিল। একজন পকেটমারের যদি এ ক্ষমতা থাকতো যে, যার পকেট ইচ্ছা সে মারতে পারবে তাহলের পৃথিবীর কোন মানুষের পকেটই তার হাত থেকে রক্ষা পেতো না। কোন চোরের হাত থেকে কারো সম্পদ রক্ষা পেতো না, কোন ব্যভিচারীর হাত থেকে কোন নারীর সতীত্ব ও সম্ভ্রম রক্ষা পেতো না এবং কোন ডাকাতের হাত থেকে কারো বাড়ী–ঘর রক্ষা পেতো না, যদি এদের সবারই যথেচ্ছাচারের পূর্ণ ইখতিয়ার বা ক্ষমতা থাকতো। তাই মানুষ ন্যায় বা অন্যায় যে পথেই চলতে ইচ্ছা করুক না কেন সে পথে চলতে দেয়া না দেয়ার বিষয়টি আল্লাহ নিজের হাতেই রেখে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি গোমরাহীর পথ বর্জন করে সত্যের পথ অবলম্বন করতে চায় আল্লাহর ইচ্ছা এবং তাওফীক লাভ করেই কেবল সে সত্য পথে চলার সৌভাগ্য লাভ করতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো, গোমরাহীকে বর্জন করে হিদায়াতকে বাছাই ও গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত খোদ মানুষকেই নিতে হবে। তা না হলে আল্লাহ তা'আলা জোরপূর্বক যেমন কাউকে চোর, খুনী, নাস্তিক বা মুশরিক বানান না তেমনি জোরপূর্বক তাকে ঈমানদারও বানান না।

অতপর তৃতীয় আয়াতে এ ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার এ ইচ্ছা আবার নিয়ম–বিধি মুক্ত স্বেচ্ছাচারমূলক (Arbitrary) ব্যাপার কিনা এ ভ্রান্ত ধারণা

দূর করার জন্য বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা عليم এবং حكيم অর্থাৎ তিনি যেমন সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী, তেমনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী কুশলী ও প্রজ্ঞাময়। তিনি যা কিছু করেন জ্ঞান ও বিজ্ঞতার সাথেই করেন। তাই তাঁর সিদ্ধান্তে ভুল-ত্রুটি হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। কাকে কি 'তাওফীক' দিতে হবে এবং কি দিতে হবে না, কাকে কি কাজ করতে দেয়া উচিত আর কাকে দেয়া উচিত নয় সে সিদ্ধান্ত তিনি পূর্ণ জ্ঞান এবং যুক্তি ও কৌশলের ভিত্তিতে গ্রহণ করেন। মানুষকে তিনি যতটা অবকাশ দেন এবং উপায়-উপকরণকেও যতটা তার অনুকূল করে দেন ভাল হোক বা মন্দ হোক মানুষ নিজের ইচ্ছানুসারে ঠিক ততটা কাজই করতে পারে। হিদায়াতলাভের ব্যাপারটাও এ নিয়মের বাইরে নয়। কে হিদায়াতের উপযুক্ত আর কে নয় নিজের জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহ তা'আলাই তা জানেন এবং নিজের যুক্তি ও কৌশলের ভিত্তিতে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণও তিনিই করে থাকেন।

পরিশিষ্ট—২

৩৪নং টীকার সাথে সম্পর্কিত

এ আয়াতে জালেম বলে সেসব লোককে বুঝানো হয়েছে যাদের কাছে আল্লাহর বাণী এবং তাঁর নবীর শিক্ষা আসার পর তারা অনেক চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বিবেচনার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, তার আনুগত্য তারা করবে না। এর মধ্যে সেসব জালেমও আছে যারা পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছে আমরা এ বাণীকে আল্লাহর বাণী এবং এ নবীকে আল্লাহর নবী বলে মানি না। অথবা আল্লাহকেই আদৌ মানি না। আবার সেসব জালেমও আছে যারা আল্লাহ, নবী ও কুরআনকে মানতে অস্বীকার করে না বটে কিন্তু সিদ্ধান্ত তাদের এটাই থাকে যে, তাঁরা তার আনুগত্য করবে না। প্রকৃতপক্ষে এ দু'টি গোষ্ঠীই জালেম। প্রথম গোষ্ঠীর ব্যাপারটা তো স্পষ্ট। কিন্তু দ্বিতীয় গোষ্ঠীও তাদের চেয়ে কোন অংশে কম জালেম নয়। বরং জালেম হওয়ার সাথে সাথে তারা মুনাফিক এবং প্রতারকও। তারা মুখে বলে, আমরা আল্লাহকে মানি, কুরআনকে মানি। কিন্তু তাদের মন ও মগজের ফায়সালা হলো, তার অনুসরণ তারা করবে না। আর তারা কাজও করে এর পরিপন্থী। এ দু' শ্রেণীর মানুষ সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা হলো, আমি তাদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। দুনিয়াতে তারা যতই নির্ভীক ও বেপরোয়া চলুক, আরামআয়েশে বিভোর থাকুক এবং নিজের বাহাদুরীর ডংকা বাজাক না কেন অবশেষে তাদের পরিণাম কঠোর শাস্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহর রহমতের মধ্যে প্রবেশ করা তাদের ভাগ্যলিপিতেই নেই।

আল মুরসালাত

৭৭

নামকরণ

প্রথম আয়াতের والمرسلت শব্দটিকেই এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরার পুরো বিষয়বস্তু থেকে প্রকাশ পায় যে, এটি মক্কী যুগের প্রথম দিকে নাযিল হয়েছিল। এর আগের দু'টি সূরা অর্থাৎ সূরা কিয়ামাহ ও সূরা দাহ্‌র এবং পরের দু'টি সূরা অর্থাৎ সূরা আন্‌নাবা ও নাযি'আত যদি এর সাথে মিলিয়ে পড়া যায় তাহলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এ সূরাগুলো সব একই যুগে অবতীর্ণ। আর এর বিষয়বস্তুও একই যা বিভিন্ন ভংগিতে উপস্থাপন করে মক্কাবাসীদের মন–মগজে বদ্ধমূল করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য

এর বিষয়বস্তু কিয়ামত ও আখেরাতকে প্রমাণ করা এবং এ সত্যকে অস্বীকার করলে কিংবা মেনে নিলে পরিণামে যেসব ফলাফল প্রকাশ পাবে সে বিষয়ে মক্কাবাসীদের সচেতন করে দেয়া।

কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার যে খবর দিচ্ছেন তা যে অবশ্যই হবে প্রথম সাতটি আয়াতে বাতাসের ব্যবস্থাপনাকে তার সত্যতা ও বাস্তবতার সপক্ষে সাক্ষী হিসেবে পেশ করা হয়েছে। এতে প্রমাণ পেশ করা হয়েছে যে, যে অসীম ক্ষমতাশালী সত্তা পৃথিবীতে এ বিস্ময়কর ব্যবস্থাপনা কায়েম করেছেন তাঁর শক্তি কিয়ামত সংঘটিত করতে অক্ষম হতে পারে না। আর যে স্পষ্ট যুক্তি ও কৌশল এ ব্যবস্থাপনার পেছনে কাজ করছে তাও প্রমাণ করে যে, আখেরাত অবশ্যই সংঘটিত হওয়া উচিত। কারণ পরম কুশলী স্রষ্টার কোন কাজই নিরর্থক ও উদ্দেশ্যহীন হতে পারে না। আখেরাত যদি না থাকে তাহলে এর অর্থ হলো, এ গোটা বিশ্ব–জাহান একেবারেই উদ্দেশ্যহীন।

মক্কাবাসীরা বারবার বলতো যে, তুমি আমাদের যে কিয়ামতের ভয় দেখাচ্ছো তা এনে দেখাও। তাহলে আমরা তা মেনে নেব। ৮ থেকে ১৫ আয়াতে তাদের এ দাবীর উল্লেখ না করে এ বলে তার জবাব দেয়া হয়েছে যে, তা কোন খেলা বা তামাশার বস্তু নয় যে, যখনই কোন ঠাট্টাবাজ বা ভাঁড় তা দেখানোর দাবী করবে তখনই তা দেখিয়ে দেয়া হবে। সেটা তো মানব জাতি ও তার প্রতিটি সদস্যের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফায়সালার দিন। সে জন্য

আল্লাহ তা'আলা একটা বিশেষ সময় ঠিক করে রেখেছেন। ঠিক সে সময়ই তা সংঘটিত হবে। আর যখন তা আসবে তখন এমন ভয়ানক রূপ নিয়ে আসবে যে, আজ যারা ঠাট্টা–বিদ্রূপের ভংগিতে তার দাবী করছে সে সময় তারা দিশেহারা ও অস্থির হয়ে পড়বে। তখন ঐসব রসূলগণের সাক্ষ অনুসারেই এদের মোকদ্দমার ফায়সালা হবে, যাদের দেয়া খবরকে এসব আল্লাহদ্রোহী আজ অত্যন্ত নিঃশঙ্কচিত্তে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিচ্ছে। অতপর তারা নিজেরাই জানতে পারবে যে, কিভাবে তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংসের আয়োজন করেছে।

১৬ থেকে ১৮ আয়াত পর্যন্ত ক্রমাগতভাবে কিয়ামত ও আখেরাত সংঘটিত হওয়া এবং তার অনিবার্যতার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। এসব আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষের নিজের ইতিহাস, তার জন্ম এবং যে পৃথিবীতে সে জীবন যাপন করছে তার গঠন, আকৃতি ও বিন্যাস সাক্ষ পেশ করছে যে, কিয়ামতের আসা এবং আখেরাত অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব এবং আল্লাহ তা'আলার প্রাজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার দাবীও বটে। মানুষের ইতিহাস বলছে, যেসব জাতিই আখেরাত অস্বীকার করেছে পরিণামে তারা বিপথগামী হয়েছে এবং ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এর অর্থ হলো, আখেরাত এমন একটি সত্য যে, যে জাতিরই আচার–আচরণ ও রীতি–নীতি এর বিপরীত হবে তার পরিণাম হবে সেই অন্ধের মত যে সামনের দিক থেকে দ্রুত এগিয়ে আসা গাড়ীর দিকে বল্গাহারার মত এগিয়ে যাচ্ছে। এর আরো একটি অর্থ হলো, বিশ্ব–সাম্রাজ্যের মধ্যে শুধু প্রাকৃতিক আইন (Physical Law) কার্যকর নয়, বরং একটি নৈতিক আইনও (Moral Law) এখানে কার্যকর রয়েছে। আর এ বিধান অনুসারে এ পৃথিবীতেও কাজের প্রতিদান দেয়ার সিলসিলা বা ধারা চালু আছে। কিন্তু দুনিয়ার এ জীবনে প্রতিদানের এ বিধান যেহেতু পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হতে পারছে না, তাই বিশ্ব–জাহানের নৈতিক বিধান অনিবার্যভাবেই দাবী করে যে, এমন একটি সময় আসা উচিত যখন তা পুরোপুরি বাস্তবায়িত হবে এবং সেসব ভাল ও মন্দের যথোপযুক্ত প্রতিদান বা শাস্তি দেয়া হবে যা এখানে উপযুক্ত প্রতিদান বা পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হয়েছিল বা শাস্তি থেকে বেঁচে গিয়েছিল। এর জন্য মৃত্যুর পরে আরেকটি জীবন হওয়া অপরিহার্য। মানুষ দুনিয়ায় যেভাবে জন্মলাভ করে সে বিষয়ে যদি সে চিন্তা–ভাবনা করে তাহলে তার বিবেক–বুদ্ধি— অবশ্য যদি সুস্থ বিবেক–বুদ্ধি থাকে—এ বিষয়টি অস্বীকার করতে পারে না যে, যে আল্লাহ নগণ্য বীর্য দ্বারা মানুষ সৃষ্টির সূচনা করে তাকে পূর্ণাঙ্গ মানুষে রূপান্তরিত করেছেন সে আল্লাহর পক্ষে মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করা নিশ্চিতভাবেই সম্ভব। মানুষ সারা জীবন যে পৃথিবীতে বাস করে মৃত্যুর পর তার শরীরের বিভিন্ন অংশ সেখান থেকে উধাও হয়ে যায় না। বরং তার দেহের এক একটি অণু পরমাণু এ পৃথিবীতেই বিদ্যমান থাকে। পৃথিবীর এ মাটির ভাণ্ডার থেকেই সে সৃষ্টি হয়, বেড়ে ওঠে ও লালিত–পালিত হয় এবং পুনরায় সে পৃথিবীর মাটির ভাণ্ডারেই গচ্ছিত হয়। যে আল্লাহ মাটির এ ভাণ্ডার থেকে প্রথমবার তাকে বের করেছিলেন তাতে মিশে যাওয়ার পর তিনি তাকে পুনরায় বের করে আনতে সক্ষম। তাঁর যুক্তি ও কৌশল সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করলে তোমরা এ বিষয়টিও অস্বীকার করতে পারবে না যে, পৃথিবীতে যে ক্ষমতা ও ইখতিয়ার তিনি তোমাদের দিয়েছেন তার সঠিক ও ভুল প্রয়োগের হিসেব–নিকেশ নেয়াও নিশ্চিতভাবেই তাঁর বিচক্ষণতা ও বিজ্ঞতার দাবী এবং বিনা হিসেবে ছেড়ে দেয়াও তার যুক্তি ও কৌশলের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এরপর ২৮ থেকে ৪০ পর্যন্ত আয়াতে আখেরাত

অস্বীকারকারীদের পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে। ৪১ থেকে ৪৫ আয়াত পর্যন্ত সেসব লোকের পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে, যারা আখেরাতের ওপর ঈমান এনে দুনিয়ায় থেকেই নিজেদের পরিণাম গুছিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছে। তারা আকীদা-বিশ্বাস ও ধ্যান–ধারণা, নৈতিক চরিত্র ও কাজ-কর্ম এবং নিজের জীবন ও কর্মের সমস্ত মন্দ দিক থেকে দূরে অবস্থান করেছে যা মানুষের দুনিয়ার আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করলেও পরিণামকে ধ্বংস করে।

সবশেষে যারা আখেরাতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর বন্দেগী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদের সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে যত আমোদ–ফূর্তি করতে চাও, করে নাও। শেষ অবধি তোমাদের পরিণাম হবে অত্যন্ত ধ্বংসকর। বক্তব্যের সমাপ্তি টানা হয়েছে এই বলে যে, এ কুরআনের মাধ্যমেও যে ব্যক্তি হিদায়াত লাভ করতে পারে না তাকে দুনিয়ার কোনো জিনিসই হিদায়াত দান করতে সক্ষম নয়।

وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا ﴿١﴾ فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا ﴿٢﴾ وَّالنّٰشِرٰتِ نَشْرًا ﴿٣﴾ فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا ﴿٤﴾ فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا ﴿٥﴾ عُذْرًا اَوْ نُذْرًا ﴿٦﴾ اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ ﴿٧﴾

শপথ সে (বাতাসের) যা একের পর এক প্রেরিত হয়। তারপর ঝড়ের গতিতে প্রবাহিত হয় এবং (মেঘমালাকে) বহন করে নিয়ে ছড়িয়ে দেয়। তারপর তাকে ফেঁড়ে বিচ্ছিন্ন করে। অতপর (মনে আল্লাহর) স্মরণ জাগিয়ে দেয়, ওজর হিসেবে অথবা ভীতি হিসেবে।[১] যে জিনিসের প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হচ্ছে[২] তা অবশ্যই সংঘটিত হবে।[৩]

১. অর্থাৎ কখনো বাতাস বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং দুর্ভিক্ষের আশংকা দেখা দেয়ায় মন নরম হয়ে যায় এবং মানুষ তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। কখনো রহমত স্বরূপ বৃষ্টি বয়ে আনার কারণে মানুষ আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করে। আবার কখনো ঝড়–ঝঞ্ঝার প্রচণ্ডতা মানুষের মনে ভীতি সঞ্চার করে এবং ধ্বংসের ভয়ে মানুষ আল্লাহর দিকে রুজু করে। (আরো দেখুন, পরিশিষ্ট–৩, ১৭৯ পৃষ্ঠায়)

২. এর আরেকটি অর্থ এও হতে পারে যে, তোমাদেরকে যে জিনিসের ভয় দেখানো হচ্ছে। অর্থাৎ কিয়ামত এবং আখেরাত।

৩. কিয়ামত যে অবশ্যই সংঘটিত হবে তা বুঝানোর জন্য এখানে পাঁচটি জিনিসের শপথ করা হয়েছে। এক, اَلْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا "একের পর এক বা কল্যাণ হিসেবে প্রেরিতসমূহ। দুই, اَلْعٰصِفٰتِ عَصْفًا অত্যন্ত দ্রুত এবং প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিতসমূহ। তিন, اَلنّٰشِرٰتِ نَشْرًا ভালভাবে বিক্ষিপ্তকারী বা ছড়িয়ে দেনেওয়ালাসমূহ। চার, اَلْفٰرِقٰتِ فَرْقًا 'বিচ্ছিন্নকারীসমূহ' পাঁচ, اَلْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا 'স্মরণকে জাগ্রতকারীসমূহ।' এ শব্দসমূহে শুধু গুণ বা বিশেষণ বর্ণনা করা হয়েছে, এগুলো কিসের বিশেষণ বা গুণ তা উল্লেখ করা হয়নি। তাই এগুলো একই বস্তুর বিশেষণ না ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর বিশেষণ এ বিষয়ে মুফাস্সিরগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। একদল বলেন, এ পাঁচটি বিশেষণ দ্বারা বাতাসকে বুঝানো হয়েছে। অপর এক দল বলেন যে, এ পাঁচটি বিশেষণ দ্বারা

ফেরেশতাদের বুঝানো হয়েছে। তৃতীয় দল বলেন ঃ প্রথম তিনটি দ্বারা বাতাস এবং পরের দু'টি দ্বারা ফেরেশতা বুঝানো হয়েছে। চতুর্থ দল বলেন ঃ প্রথম দু'টি দ্বারা বাতাস এবং পরের তিনটি দ্বারা ফেরেশতা বুঝানো হয়েছে। একদল এরূপ মতও পোষণ করেছেন যে, প্রথমটি দ্বারা রহমতের ফেরেশতা, দ্বিতীয়টি দ্বারা আযাবের ফেরেশতা এবং অবশিষ্ট তিনটি দ্বারা কুরআন মজীদের আয়াতসমূহ বুঝানো হয়েছে।

আমাদের কাছে প্রথম বিবেচ্য বিষয় হলো, যখন একই কথার মধ্যে একের পর এক পাঁচটি বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর মধ্যে এমন কোন ইংগিতও পাওয়া যাচ্ছে না যা দিয়ে বুঝা যেতে পারে যে, কোন্ পর্যন্ত একটি জিনিসের গুণ–পরিচয়ের উল্লেখ করা হয়েছে এবং কোথায় থেকে আরেকটি জিনিসের গুণ পরিচয়ের বর্ণনা শুরু হয়েছে তখন অযৌক্তিকভাবে শুধু অনুমানের ওপর ভিত্তি করে একথা বলা কতটা সঠিক ও যুক্তিযুক্ত হতে পারে যে, এখানে শুধু দু'টি বা তিনটি জিনিসের শপথ করা হয়েছে? বরং এ ক্ষেত্রে বক্তব্যের ধারাবাহিকতা দাবী করে যে, সম্পূর্ণ বাক্যকে কোন একটি জিনিসের গুণ বা পরিচিতির সাথে সম্পর্কিত বলে মেনে নেয়া উচিত। দ্বিতীয় কথা হলো, কুরআন মজীদে যেখানেই সন্দেহ পোষণকারী বা অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীকে কোন অতীন্দ্রিয় বা গায়েবী সত্যকে বিশ্বাস করানোর জন্য কোন জিনিস বা বস্তু বিশেষের শপথ করা হয়েছে, সেখানেই শপথ প্রমাণ উপস্থাপনের সমার্থক হয়েছে অর্থাৎ তার উদ্দেশ্য হয় একথা বুঝানো যে, এ বস্তুটি বা বস্তু সকল সে সত্যটির যথার্থতা প্রমাণ করছে। এটা তো স্পষ্ট যে, এ উদ্দেশ্যে একটি অতীন্দ্রিয় বা গায়েবী বস্তুর পক্ষে আরেকটি অতীন্দ্রিয় বা গায়েবী বস্তুকে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা ঠিক নয়। বরং অতীন্দ্রিয় বস্তুর প্রমাণ হিসেবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর প্রমাণ পেশ করাই যথার্থ এবং যথোপযুক্ত হতে পারে। সুতরাং আমাদের মতে এর সঠিক তাফসীর হলো এই যে, এর অর্থ বাতাস। যারা বলেছেন যে, এ পাঁচটি জিনিসের অর্থ ফেরেশতা, আমার মতে তাদের ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ফেরেশতাও কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার মতই অতীন্দ্রিয় বিষয়।

এবার চিন্তা করে দেখুন, বাতাসের এ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা কিয়ামতের বাস্তবতা কিভাবে প্রমাণ করছে। যেসব উপকরণের জন্য পৃথিবীর ওপর জীব–জন্তু ও উদ্ভিদের জীবন সম্ভব হয়েছে তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো বাতাস। সব প্রজাতির জীবনের সাথে বাতাসের বর্ণিত গুণাবলীর যে সম্পর্ক আছে তা এ কথারই সাক্ষ দিচ্ছে যে, কোন একজন মহা শক্তিমান সুনিপুণ স্রষ্টা আছেন যিনি মাটির এ গ্রহে জীবন সৃষ্টির ইচ্ছা করেছেন এবং এ উদ্দেশ্যে এখানে এমন একটি জিনিস সৃষ্টি করলেন যার গুণাবলী ও বৈশিষ্ট জীবন্ত মাখলুকাতের বেঁচে থাকার জন্য যা প্রয়োজন তার সাথে হুবহু সামঞ্জস্যশীল। তা সত্ত্বেও তিনি শুধু এতটুকুই করেননি যে, পৃথিবীটার গায়ে বাতাসের একটি চাদর জড়িয়ে রেখে দিয়েছেন। বরং নিজের কুদরত ও জ্ঞান দ্বারা তিনি এ বাতাসের মধ্যে বৈচিত্রপূর্ণ অসংখ্য অবস্থার সৃষ্টি করেছেন। লক্ষ কোটি বছর ধরে তার ব্যবস্থাপনা এভাবে হয়ে আসছে যে, সে বৈচিত্রপূর্ণ অবস্থার কারণে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুর সৃষ্টি হচ্ছে। কখনো বাতাস বন্ধ হয়ে গুমট অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। আবার কখনো স্নিগ্ধ শীতল বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে। কখনো গরম পড়ে আবার কখনো ঠাণ্ডা পড়ে। কখনো মেঘের ঘনঘটায় চারদিক আচ্ছন্ন হয়ে যায় আবার কখনো বাতাসে মেঘ ভেসে যায়। কখনো আরামদায়ক বাতাস বয়ে যায় আবার কখনো

فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ﴿٨﴾ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ﴿٩﴾ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ﴿١٠﴾ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ ﴿١١﴾ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ﴿١٢﴾ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ﴿١٣﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴿١٤﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٥﴾ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ ﴿١٧﴾ كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿١٨﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٩﴾

অতপর তারকাসমূহ যখন নিষ্প্রভ হয়ে যাবে[৪] এবং আসমান ফেঁড়ে দেয়া হবে[৫] আর পাহাড় ধুনিত করা হবে এবং রসূলদের হাজির হওয়ার সময় এসে পড়বে।[৬] (সেদিন ঐ ঘটনাটি সংঘটিত হবে)। কোন্ দিনের জন্য একাজ বিলম্বিত করা হয়েছে? ফায়সালার দিনের জন্য। তুমি কি জান সে ফায়সালার দিনটি কি? সেদিন ধ্বংস অপেক্ষা করছে মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।[৭]

আমি কি পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করিনি?[৮] আবার পরবর্তী লোকদের তাদের অনুগামী করে দেব[৯]। অপরাধীদের সাথে আমরা এরূপই করে থাকি। সেদিন ধ্বংস অপেক্ষা করছে মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।[১০]

প্রলয়ংকরী ঝড়–ঝঞ্ঝার আবির্ভাব ঘটে। কখনো অত্যন্ত উপকারী বৃষ্টিপাত হয় আবার কখনো বৃষ্টির অভাবে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। মোট কথা এক রকম বাতাস নয়, বরং বিভিন্ন সময়ে নানা রকমের বাতাস প্রবাহিত হয় এবং প্রত্যেক প্রকারের বাতাস কোন না কোন উদ্দেশ্য পূরণ করে। এ ব্যবস্থা একটি অজেয় ও পরাক্রমশালী শক্তির প্রমাণ, যার পক্ষে জীবন সৃষ্টি করা যেমন অসম্ভব নয় তেমনি তাকে ধ্বংস করে পুনরায় সৃষ্টি করাও অসম্ভব নয়। অনুরূপভাবে এ ব্যবস্থাপনা পূর্ণমাত্রার জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তারও প্রমাণ। কোন অজ্ঞ ও নির্বোধ লোকই কেবল একথা মনে করতে পারে যে, এসব কাজ–কারবার শুধু খেলাচ্ছলে করা হচ্ছে। এর পেছনে কোন মহান লক্ষ ও উদ্দেশ্য নেই। এ বিস্ময়কর ব্যবস্থার সামনে মানুষ এত অসহায় যে, সে নিজের প্রয়োজনেও কোন সময় উপকারী বাতাস প্রবাহিত করতে পারে না। আবার ধ্বংসাত্মক তুফানের আগমনকে ঠেকাতেও পারে না। সে যতই ঔদ্ধত্য, অসচেতনতা এক গুঁয়েমি ও হঠকারিতা দেখাক না কেন কোন না কোন সময় এ বাতাসই তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সর্বোপরি এক মহাশক্তি তৎপর আছেন যিনি জীবনের এ সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় উপকরণকে যখন ইচ্ছা তার জন্য রহমত এবং যখন ইচ্ছা তার জন্য ধ্বংসের কারণ বানিয়ে দিতে পারেন। মানুষ তার কোন সিদ্ধান্তকেই রোধ করার ক্ষমতা রাখে না। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল জাসিয়া, টীকা ৭, আয্ যারিয়াত, টীকা ১ থেকে ৪।)

৪. অর্থাৎ নিষ্প্রভ হয়ে যাবে এবং তার আলো নিঃশেষ হয়ে যাবে।

৫. অর্থাৎ যে সুদৃঢ় ব্যবস্থার কারণে উর্ধজগতের সমস্ত গ্রহ উপগ্রহ তার কক্ষপথে প্রতিষ্ঠিত আছে এবং যে কারণে মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু নিজ নিজ সীমার মধ্যেই আবদ্ধ আছে সে ব্যবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটানো হবে এবং তার সমস্ত বন্ধন শিথিল করে দেয়া হবে।

৬. কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে একথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, হাশরের ময়দানে যখন মানব জাতির মামলা আল্লাহর দরবারে পেশ করা হবে তখন প্রত্যেক জাতির রসূলকে সাক্ষদানের জন্য হাজির করা হবে। উদ্দেশ্য, তাঁরা যে মানুষের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন তার সাক্ষ্য দেবেন। বিপথগামী ও অপরাধীদের বিরুদ্ধে এটা হবে আল্লাহ তা'আলার সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এর দ্বারা প্রমাণ করা হবে যে, তার ভ্রান্ত আচরণের জন্য সে নিজেই দায়ী। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাকে সাবধান করার ব্যাপারে কোন ত্রুটি করা হয়নি। এ বিষয়ে জানতে হলে নিম্নবর্ণিত স্থানসমূহ দেখুন। তাফহীমুল কুরআন, আল আ'রাফ, আয়াত ১৭২, ১৭৩, টীকা ১৩৪, ১৩৫; আয্ যুমার, আয়াত ৬৯, টীকা ৮০; আল মুলক, আয়াত ৮, টীকা ১৪।

৭. অর্থাৎ সেসব লোকের জন্য যারা সেদিনের আগমনের খবরকে মিথ্যা বলে মনে করেছিল এবং এ ভেবে পৃথিবীতে জীবন যাপন করে চলেছিল যে, এমন সময় কখনো আসবে না যখন প্রভুর সামনে হাজির হয়ে নিজের কাজ–কর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

৮. এটা আখেরাতের সপক্ষে ঐতিহাসিক প্রমাণ। এর অর্থ হলো, এ দুনিয়াতেই তোমরা নিজেদের ইতিহাসের প্রতি একবার তাকিয়ে দেখো। যেসব জাতি আখেরাতকে অস্বীকার করে এ দুনিয়ার জীবনকেই প্রকৃত জীবন মনে করেছে এবং এ দুনিয়াতে প্রকাশিত ফলাফলকে ভাল ও মন্দের মাপকাঠি ধরে নিয়ে সে অনুসারে নিজেদের নৈতিক আচরণ নিরূপণ করেছে স্থান–কাল নির্বিশেষে তারা সবাই শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়েছে। এটা প্রমাণ করে যে, প্রকৃতপক্ষে আখেরাত এক বাস্তব সত্য। যারা একে উপেক্ষা করে কাজ করে তারা ঠিক তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হয় যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় সে ব্যক্তি যে চোখ বন্ধ করে বাস্তবকে অস্বীকার করে চলে। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইউনুস, টীকা ১২; আন নামল, টীকা ৮৬; আর রুম, টীকা ৮; সাবা, টীকা ২৫।)

৯. অর্থাৎ এটা আমার স্থায়ী নীতি ও বিধান। আখেরাতের অস্বীকৃতি অতীত জাতিগুলোর জন্য যেভাবে ধ্বংসাত্মক প্রমাণিত হয়েছে অনুরূপ অনাগত জাতিগুলোর জন্যও তা ধ্বংসাত্মক প্রমাণিত হবে। পূর্বেও কোন জাতি এ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়নি, ভবিষ্যতেও পাবে না।

১০. এখানে এ আয়াতটির অর্থ হলো, দুনিয়াতে তাদের যে পরিণতি হয়েছে কিংবা ভবিষ্যতে হবে তা তাদের আসল শাস্তি নয়। তাদের ওপর আসল ধ্বংস নেমে আসবে চূড়ান্ত ফায়সালার দিনে। এ পৃথিবীতে যে শাস্তি দেয়া হয় তার অবস্থা হলো, যখন কোন ব্যক্তি একের পর এক অপরাধ করতে থাকে এবং কোন ভাবেই সে তার ভ্রষ্ট ও বিকৃত আচরণ থেকে বিরত হয় না তখন শেষ অবধি তাকে গ্রেফতার করা হয়। যে আদালতে তার

আমি কি তোমাদেরকে এক নগণ্য পানি থেকে সৃষ্টি করিনি এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য[১১] একটি নির্দিষ্ট জায়গায় তা স্থাপন করেছিলাম না?[১২] তাহলে দেখো, আমি তা করতে পেরেছি। অতএব আমি অত্যন্ত নিপুণ ক্ষমতাধর।[১৩] সেদিন ধ্বংস রয়েছে মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।[১৪]

আমি কি যমীনকে ধারণ ক্ষমতার অধিকারী বানাইনি, জীবিত ও মৃত উভয়ের জন্য? আর আমি তাতে স্থাপন করেছি সুদৃঢ় উচ্চ পর্বতমালা আর পান করিয়েছি তোমাদেরকে সুপেয় পানি।[১৫] সেদিন ধ্বংস রয়েছে মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।[১৬]

মামলার চূড়ান্ত ফায়সালা হবে এবং তার সমস্ত কৃতকর্মের শাস্তি দেয়া হবে তা এ দুনিয়ায় না আখেরাতে কায়েম হবে এবং সেটাই হবে তার ধ্বংসের আসল দিন। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আ'রাফ, টীকা ৫–৬; হূদ, টীকা ১০৫।)

১১. মূল আয়াতের বাক্যাংশ হলো قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ । এর অর্থ শুধু নির্দিষ্ট সময় নয়। বরং এর সময়–কাল একমাত্র আল্লাহই জানেন এ অর্থও এর মধ্যে শামিল। কোন বাচ্চা সম্পর্কে কোন উপায়েই মানুষ একথা জানতে পারে না যে, সে কত মাস, কত দিন, কত ঘন্টা, কত মিনিট এবং কত সেকেণ্ড মায়ের পেটে অবস্থান করবে এবং তার ভূমিষ্ঠ হওয়ার নির্ভুল সময়টি কি? প্রত্যেক শিশুর জন্য আল্লাহ একটা বিশেষ সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছেন আর সে সময়টি কেবল তিনিই জানেন।

১২. অর্থাৎ মায়ের গর্ভ থলি। গর্ভ সূচনা হওয়ার সাথে সাথে ভ্রূণকে এর মধ্যে এত দৃঢ়ভাবে স্থাপন করা হয় এবং তার হিফাযত, প্রতিপালন এবং বৃদ্ধিসাধন এমন নিখুঁত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে করা হয় যে, কোন মারাত্মক দুর্ঘটনা ছাড়া গর্ভপাত হতে পারে না। কৃত্রিম গর্ভপাতের জন্য অস্বাভাবিক ধরনের কৌশল ও ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয় যা চিকিৎসা বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক উন্নতি সত্ত্বেও ক্ষতি ও আশংকা মুক্ত নয়।

১৩. এটা মৃত্যুর পরের জীবনের সম্ভাব্যতার স্পষ্ট প্রমাণ। আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর অর্থ হলো, যখন আমি নগণ্য এক ফোটা বীর্য থেকে সূচনা করে তোমাকে পূর্ণাঙ্গ একজন মানুষ বানাতে সক্ষম হয়েছি তখন পুনরায় তোমাদের অন্য কোনভাবে সৃষ্টি করতে সক্ষম

হবো না কেন? আমার যে সৃষ্টি কর্মের ফলশ্রুতিতে তুমি আজ জীবিত ও বর্তমান তা একথা প্রমাণ করে যে, আমি অসীম ক্ষমতার অধিকারী। আমি এমন অক্ষম নই যে, একবার সৃষ্টি করার পর তোমাদেরকে পুনরায় আর সৃষ্টি করতে পারবো না।

১৪. এখানে এ আয়াতাংশ যে অর্থ প্রকাশ করছে তাহলো, মৃত্যুর পরের জীবনের সম্ভাব্যতার এ স্পষ্ট প্রমাণ সামনে থাকা সত্ত্বেও যারা তা অস্বীকার করছে তারা এ নিয়ে যত ইচ্ছা হাসি–তামাসা ও ঠাট্টা–বিদ্রূপ করুক এবং এর ওপর বিশ্বাস স্থাপনকারী লোকদের তারা যত ইচ্ছা 'সেকেলে' অন্ধবিশ্বাসী এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলতে থাক। যে দিনকে এরা মিথ্যা বলছে যখন সেদিনটি আসবে তখন তারা জানতে পারবে, সেটিই তাদের জন্য ধ্বংসের দিন।

১৫. এটা আখেরাতের সম্ভাব্যতা ও যুক্তিসংগত হওয়ার আরো একটি প্রমাণ। পৃথিবী নামক এ একটি গ্রহ যা শত শত কোটি বছর ধরে অসংখ্য মাখলুকাতকে তার কোলে স্থান দিয়ে রেখেছে। নানা প্রকারের উদ্ভিদরাজি, নানা রকমের জীবজন্তু এবং মানুষ এর ওপরে জীবন ধারণ করছে। আর সবার প্রয়োজন পূরণ করার জন্য এর অভ্যন্তর থেকে নানা প্রকার জিনিসের অফুরন্ত ভাণ্ডার বেরিয়ে আসছে। তাছাড়া এ পৃথিবীতে, যেখানে এসব জীবজন্তুর বিপুল সংখ্যক প্রতিনিয়ত মৃত্যুবরণ করছে—এমন নজীর বিহীন ব্যবস্থাপনা রাখা হয়েছে যে, সবার মৃতদেহ এ মাটির মধ্যেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে। তারপর প্রত্যেকটি সৃষ্টির নবীন সদস্যদের বেঁচে থাকার ও বসবাসের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাচ্ছে এ পৃথিবীকে বলের মত সমতল করেও সৃষ্টি করা হয়নি। বরং এর স্থানে স্থানে পর্বতশ্রেণী এবং আকাশচুম্বী পাহাড় তৈরী করে রাখা হয়েছে ঋতুসমূহের পরিবর্তনে, বৃষ্টিপাত ঘটানোতে, নদ–নদীর উৎপত্তির ক্ষেত্রে, উর্বর উপত্যকা সৃষ্টিতে, কড়িকাঠ নির্মাণের মত বড় বড় বৃক্ষ উৎপাদনে, নানা রকমের খনিজ দ্রব্য এবং বিভিন্ন প্রকার পাথর সরবরাহের ক্ষেত্রে যার বিরাট ভূমিকা রয়েছে। তাছাড়া এ পৃথিবীর অভ্যন্তরে সুপেয় পানি সৃষ্টি করা হয়েছে। এর পৃষ্ঠদেশের ওপরেও সুপেয় পানির নদী ও খাল প্রবাহিত করা হয়েছে এবং সমুদ্রের লবণাক্ত পানি থেকে পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন বাষ্প উত্থিত করে আসমান থেকে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসব কি একথা প্রমাণ করে না যে, সর্বশক্তিমান এক সত্তাই এসব তৈরী করেছেন। আর তিনি শুধু সর্বশক্তিমানই নন বরং জ্ঞানী এবং মহাবিজ্ঞানীও বটে? অতএব, তাঁর শক্তিমত্তা ও জ্ঞানের সাহায্যেই যদি এ পৃথিবী এতসব সাজ–সরঞ্জামসহ এ জ্ঞান ও কৌশলের সাথে তৈরী হয়ে থাকে তাহলে একজন জ্ঞান–বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের জন্য একথাটা বুঝা এত কঠিন হবে কেন যে, এ দুনিয়ার বিলোপ ঘটিয়ে পুনরায় নতুনভাবে আরেকটি দুনিয়া তিনি বানাতে সক্ষম আর তাঁর কর্মকৌশলের দাবীও এটাই যে, তিনি আরেকটি দুনিয়া বানাবেন যাতে মানুষ এ দুনিয়ায় যেসব কাজ–কর্ম করেছে তার হিসেব নেয়া যায়।

১৬. এখানে এ আয়াতাংশ এ অর্থে বলা হয়েছে যে, যেসব লোক আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও কর্মকৌশলের এ বিস্ময়কর নমুনা দেখেও আখেরাতের সম্ভাব্যতা ও যৌক্তিকতা অস্বীকার করছে এবং এ দুনিয়ার ধ্বংসের পর আল্লাহ তা'আলা আরো একটি দুনিয়া সৃষ্টি করবেন এবং সেখানে মানুষের কাছ থেকে তার কাজের হিসেব গ্রহণ করবেন এ বিষয়টিকেও যারা মিথ্যা মনে করছে, তারা তাদের এ খামখেয়ালীতে মগ্ন থাকতে চাইলে

চলো[১৭] এখন সে জিনিসের কাছে যাকে তোমরা মিথ্যা বলে মনে করতে। চলো সে ছায়ার কাছে যার আছে তিনটি শাখা।[১৮] যে ছায়া ঠাণ্ডা নয় আবার আগুনের শিখা থেকে রক্ষাও করে না। সে আগুন প্রাসাদের মত বড় বড় স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করবে। (উৎক্ষেপণের সময় যা দেখে মনে হবে) তা যেন হলুদ বর্ণের উট।[১৯] সেদিন ধ্বংস রয়েছে মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য। এটি সেদিন যেদিন তারা না কিছু বলবে এবং না তাদেরকে ওজর পেশ করার সুযোগ দেয়া হবে।[২০] সেদিন ধ্বংস রয়েছে মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।

এটা চূড়ান্ত ফায়সালার দিন। আমি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের একত্রিত করেছি। তোমাদের যদি কোন অপকৌশল থেকে থাকে তাহলে আমার বিরুদ্ধে তা প্রয়োগ করে দেখো।[২১] সেদিন ধ্বংস রয়েছে মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।

থাকুক। তাদের ধারণা ও বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত এসব কিছু যেদিন বাস্তব হয়ে দেখা দেবে, সেদিন তারা বুঝতে পারবে যে, এ বোকামির মাধ্যমে তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংসের ব্যবস্থা করেছে মাত্র।

১৭. আখেরাতের সপক্ষে প্রমাণাদি পেশ করার পর যখন তা বাস্তবে সংঘটিত হবে তখন সেখানে এসব অস্বীকারকারীদের পরিণাম কি হবে তা বলা হচ্ছে।

১৮. এখানে ছায়া অর্থ ধোঁয়ার ছায়া। তিনটি শাখার অর্থ হলো, যখন অনেক বেশী ধোঁয়া উত্থিত হয় তখন তা ওপরে গিয়ে কয়েকটি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়।

১৯. অর্থাৎ প্রত্যেকটি স্ফুলিঙ্গ প্রাসাদের মত বড় হবে। আর যখন এসব বড় বড় স্ফুলিঙ্গ উত্থিত হয়ে ছড়িয়ে পড়বে এবং চারদিকে উড়তে থাকবে তখন মনে হবে যেন হলুদ বর্ণের উটসমূহ লক্ষ ঝক্ষ করছে।

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ ﴿٤١﴾ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٤٢﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٤٤﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٥﴾ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ ﴿٤٦﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴿٤٨﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٠﴾

২য় রুকূ'

মুত্তাকীরা[২২] আজ সুশীতল ছায়া ও ঝর্ণাধারার মধ্যে অবস্থান করছে। আর যে ফল তারা কামনা করে (তা তাদের জন্য প্রস্তুত)। যে কাজ তোমরা করে এসেছো তার পুরস্কার স্বরূপ আজ তোমরা মজা করে খাও এবং পান করো। আমি নেক্‌কার লোকদের এরূপ পুরস্কারই দিয়ে থাকি। সেদিন ধ্বংস রয়েছে মিথ্যা আরোপ কারীদের জন্য।[২৩]

খেয়ে নাও[২৪] এবং ফূর্তি কর। কিছুদিনের জন্য[২৫] আসলে তো তোমরা অপরাধী। সেদিন ধ্বংস রয়েছে মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য। যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহর সামনে অবনত হও, তখন তারা অবনত হয় না।[২৬] সেদিন ধ্বংস রয়েছে মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য। এখন এ কুরআন ছাড়া আর কোন্‌ বাণী এমন হতে পারে যার ওপর এরা ঈমান আনবে?[২৭]

২০. এটা হবে তাদের শেষ অবস্থা। এ অবস্থা হবে জাহান্নামে প্রবেশ করার সময়। এর আগে হাশরের ময়দানে তারা অনেক কিছুই বলবে। অনেক ওজর আপত্তি পেশ করবে, একজন আরেকজনের ওপর নিজের কৃত অপরাধের দোষ চাপিয়ে নিজে নিরপরাধ হওয়ার চেষ্টা করবে। যেসব নেতারা তাদেরকে বিপথে পরিচালনা করেছে তাদের গালি দেবে। এমনকি কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানের বক্তব্য অনুসারে, অনেকে ঔদ্ধত্যের সাথে নিজের অপরাধ অস্বীকার পর্যন্ত করবে। কিন্তু সব রকম সাক্ষ–প্রমাণের দ্বারা তাদের অপরাধী হওয়া অকাট্যভাবে প্রমাণ করে দেয়া হবে এবং তাদের নিজেদের হাত, পা এবং সব অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ দেবে ঃ এভাবে অপরাধ প্রমাণে যখন কোন ত্রুটি থাকবে না এবং অত্যন্ত সংগত ও যুক্তিযুক্ত পন্থায় ন্যায় ও ইনসাফের সমস্ত দাবী পূরণ করে তাদেরকে শাস্তির সিদ্ধান্ত শুনানো হবে তখন তারা একেবারে নিশ্চুপ হয়ে যাবে এবং

আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ওজর হিসেবে কোন কিছু বলার সুযোগও তাদের জন্য থাকবে না। ওজর পেশ করার সুযোগ না দেয়া কিংবা তার অনুমতি না দেয়ার অর্থ এই নয় যে, সাফাই পেশ করার সুযোগ না দিয়েই তাদের বিরুদ্ধে রায় দিয়ে দেয়া হবে। বরং এর অর্থ হলো, এমন অকাট্য ও অনস্বীকার্যভাবে তাদের অপরাধ প্রমাণ করে দেয়া হবে যে, তারা নিজেদের পক্ষ থেকে ওজর হিসেবে কিছু বলতেই পারবে না। এটা ঠিক তেমনি যেমন আমরা বলে থাকি যে, আমি তাকে বলতে দিইনি, কিংবা আমি তার মুখ বন্ধ করে দিয়েছি। একথার অর্থ এই যে, আমি এমনভাবে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করেছি যে, তার মুখ খোলার বা কিছু বলার কোন সুযোগ থাকেনি এবং সে লা-জবাব হয়ে গেছে।

২১. অর্থাৎ দুনিয়ায় তো তোমরা অনেক কৌশল ও চাতুর্যের আশ্রয় নিতে। এখন এখানে কোন কৌশল বা আশ্রয় নিয়ে আমার পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারলে তা একটু করে দেখাও।

২২. এখানে এ শব্দটি যেহেতু مُكَذِّبِيْنَ (মিথ্যা আরোপকারীদের) বিপরীতে ব্যবহৃত হয়েছে তাই মুত্তাকী শব্দ বলে এখানে সেসব লোকদের বুঝানো হয়েছে যারা আখেরাতকে মিথ্যা বলে অস্বীকার করা থেকে বিরত থেকেছে এবং আখেরাতকে মেনে নিয়ে এ বিশ্বাসে জীবন যাপন করেছে যে, আখেরাতে আমাদেরকে নিজেদের কথাবার্তা, কাজ-কর্ম এবং স্বভাব চরিত্র ও কর্মকাণ্ডের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

২৩. এখানে যে অর্থে এ আয়াতাংশ বলা হয়েছে তাহলো, তাদের জন্য একটি বিপদ হবে তাই যা ওপরে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা হাশরের ময়দানে অপরাধী হিসেবে উঠবে। তাদের অপরাধ প্রকাশ্যে এভাবে প্রমাণ করা হবে যে, তাদের জন্য মুখ খোলার সুযোগ পর্যন্ত থাকবে না এবং পরিণামে তারা জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত হবে। দ্বিতীয়ত, তাদের জন্য মসিবতের ওপর মসিবত হবে এই যে, যেসব ঈমানদারদের সাথে তাদের সারা জীবন দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও লড়াই হয়েছে, যাদের তারা নির্বোধ, সংকীর্ণমনা ও প্রতিক্রিয়াশীল বলে আখ্যায়িত করতো, যাদের নিয়ে তারা হাসি-তামাসা ও বিদ্রূপ করতো এবং যাদের তারা নিজেদের দৃষ্টিতে হীন, নীচ ও লাঞ্ছিত মনে করতো তাদেরকেই তারা জান্নাতের মধ্যে আরাম আয়েশের জীবন যাপন করে আমোদ ফূর্তি করতে দেখবে।

২৪. এখন বক্তব্যের সমাপ্তি টানতে গিয়ে শুধু মক্কার কাফের নয় বরং সারা পৃথিবীর কাফেরদের সম্বোধন করে একথাগুলো বলা হয়েছে।

২৫. অর্থাৎ দুনিয়ার এ স্বল্পকাল স্থায়ী জীবনে।

২৬. আল্লাহর সামনে আনত হওয়ার অর্থ শুধু তাঁর ইবাদাত বন্দেগী করাই নয়, বরং তাঁর প্রেরিত রসূল এবং নাযিলকৃত কিতাবকে স্বীকার করা এবং তার বিধি-বিধানের আনুগত্যও এর মধ্যে অন্তরভুক্ত।

২৭. অর্থাৎ মানুষকে হক ও বাতিলের পার্থক্য বুঝিয়ে দেয়ার এবং হিদায়াতের পথ দেখানোর জন্য সবচেয়ে বড় জিনিস যা হতে পারতো তা কুরআন আকারে নাযিল করা হয়েছে। এ কুরআন পড়ে বা শুনেও যদি কেউ ঈমান না আনে তাহলে একে বাদ দিয়ে আর কোন্ জিনিস এমন হতে পারে যা তাকে সত্য পথে আনতে সক্ষম?

পরিশিষ্ট—৩

১নং টীকার সাথে সম্পর্কিত

এ আয়াতগুলোতে প্রথমত বৃষ্টি বহনকারী বাতাসসমূহের পরম্পরা বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে যে, প্রথমে ক্রমাগত বাতাস চলতে থাকে। পরে তা ঝঞ্ঝার রূপ ধারণ করে। তারপর মেঘমালাকে বহন করে নিয়ে ছড়িয়ে দেয়। অতপর তাকে বিদীর্ণ করে ভাগ ভাগ করে। এরপর বৃষ্টি নামার কথা উল্লেখ করার পরিবর্তে বলা হয়েছে যে, তা মনের মধ্যে আল্লাহর স্মরণকে জাগ্রত করে, ওজর হিসেবে কিংবা ভীতি হিসেবে। অর্থাৎ সেটি এমন এক সময়ে ঘটে, যখন মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার হয়, তাই সে আল্লাহকে স্মরণ করতে বাধ্য হয়। কিংবা মানুষ তার দোষ–ত্রুটি ও অপরাধসমূহ স্বীকার করে দোয়া করতে থাকে, যেন আল্লাহ তাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন, তার প্রতি দয়া করে যেন রহমত স্বরূপ বৃষ্টি বর্ষণ করেন। যদি দীর্ঘদিন পর্যন্ত বৃষ্টি না হয়ে থাকে এবং এক ফোঁটা পানির জন্য মানুষ কাতরাতে থাকে তাহলে সে অবস্থায় ঝঞ্ঝা প্রবাহিত হতে এবং বৃষ্টির মেঘ আসতে দেখে অনেক সময় কট্টর কাফেরও আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকে। তবে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ তীব্র বা হাল্কা হলে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সাধারণ মানুষ যারা তারা সাধারণত আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকে, তাই স্বাভাবিক দুর্ভিক্ষ হলেও তারা তাঁকে স্মরণ করবে। কিন্তু অন্যরা তখনও সাইন্সের বুলি কপচাতে থাকবে এবং বলবে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। অমুক অমুক কারণে বৃষ্টি হচ্ছে না। এতটুকু ব্যাপার নিয়ে দোয়া করতে শুরু করা দুর্বল আকীদা–বিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই না। তবে যদি দীর্ঘদিন পর্যন্ত দুর্ভিক্ষ লেগে থাকে এবং গোটা দেশ ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় তাহলে বড় বড় কাফেরদেরও তখন আল্লাহকে মনে পড়তে থাকে। মুখে বলতে লজ্জাবোধ করলেও তারা নিজের গোনাহ ও পাপ এবং অকৃতজ্ঞতার জন্য লজ্জা অনুভব করে এবং আল্লাহর কাছে এই বলে দোয়া করে যে, বাতাস বৃষ্টির যে মেঘ বহন করে আনছে তা থেকে যেন গোটা দেশে বৃষ্টিপাত হয়। এটাই হলো ওজর হিসেবে মনের মধ্যে আল্লাহর স্মরণ জাগিয়ে তোলা। এরপর نذرا (ভীতি) হিসেবে মনের মধ্যে আল্লাহর স্মরণ জাগ্রত হওয়ার ব্যাপারটা সংঘটিত হয় তখন যখন ঝড়ের বেগ বৃদ্ধি পেতে পেতে প্রচণ্ড বিভীষিকাময় রূপ ধারণ করে এবং জনপদের পর জনপদ বিধ্বস্ত করে ফেলে কিংবা মুষলধারে এমন বৃষ্টি হতে থাকে যে, তা বিপদ সংকুল প্লাবনের রূপ ধারণ করে। এরূপ পরিস্থিতিতে অত্যন্ত দৃঢ় মনোবলের কাফেরও আতংকগ্রস্ত হয়ে আল্লাহর দরবারে বিনীতভাবে প্রার্থনা করতে থাকে। তখন তার মস্তিষ্কের গোপন প্রদেশ থেকে ঝড় ও প্লাবনের সমস্ত বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও ব্যাখ্যা উবে যায়। বাতাস প্রবাহিত হওয়ার এ অনুক্রম বা পারম্পর্য বর্ণনা করার পর বলা হচ্ছে, এসব বাতাস ওজর কিংবা ভীতি হিসেবে মনের মধ্যে আল্লাহর স্মরণ জাগিয়ে দেয়। অন্য কথায় যেন বলা হচ্ছে, দুনিয়ায় যেসব ব্যবস্থা চলছে তা মানুষকে এ সত্যটিই জানিয়ে দিচ্ছে যে, এ পৃথিবীর সবকিছু তার ইখতিয়ারে ছেড়ে দেয়া হয়নি। বরং সবকিছুর ওপরে এক মহাশক্তি আছেন যিনি মানুষের ভাগ্যের ওপর কর্তৃত্ব চালাচ্ছেন। তাঁর ক্ষমতা এমন অপরাজেয় যে, যখন ইচ্ছা তিনি সমস্ত উপাদানকে মানুষের লালন ও প্রতিপালনের জন্য

ব্যবহার করতে পারেন। আবার যখন ইচ্ছা ঐ সব উপাদানকেই তার ধ্বংসের কাজে নিয়োজিত করতে পারেন।

এরপর বাতাসের এ ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তকে এ বিষয়ের প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে যে, যে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হচ্ছে তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। এখন দেখার বিষয় হলো, বাতাসের এ ব্যবস্থাপনা এ ব্যাপারে কি সাক্ষ–প্রমাণ আমাদের সামনে উপস্থাপিত করছে।

কিয়ামত ও আখেরাতের ব্যাপারে মানুষ সাধারণত দু'টি প্রশ্নে সংশয়–সন্দেহে নিপতিত হয় এবং বিব্রত বোধ করে। এক, কিয়ামত হওয়া সম্ভব কিনা? দুই, এর প্রয়োজনই বা কি? এ প্রশ্নের জটা জালে জড়িয়েই তার মধ্যে এ সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি হয় যে, কিয়ামত কি আদৌ সংঘটিত হবে? নাকি এটা একটা কাহিনী মাত্র? এ বিষয়ে কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় বিশ্ব–জাহানের ব্যবস্থাপনা থেকে প্রমাণ পেশ করে তার সম্ভাব্যতা, অনিবার্যতা এবং সংঘটিত হওয়া প্রমাণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কোন কোন জায়গায় প্রমাণ পেশ করার যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে তাহলো, আল্লাহ আ'আলার বিশাল সাম্রাজ্যের অসংখ্য নিদর্শনের মধ্যে কোন কোনটার শপথ করে বলা হয়েছে যে, তা সংঘটিত হবে। এ পন্থায় প্রমাণ পেশ করতে গিয়ে তার সম্ভাব্যতা, অনিবার্যতা এবং সংঘটিত হওয়ার প্রমাণাদিও এসে যায়।

এখানেও প্রমাণ পেশের এ পন্থাই গ্রহণ করা হয়েছে। এতে বায়ু প্রবাহের আবর্তন এবং বৃষ্টিপাতের ব্যবস্থাপনাকে এ বিষয়ে নিদর্শন হিসেবে পেশ করা হয়েছে যে, এটা একটা নিয়মিত ও স্থায়ী ব্যবস্থা যা একজন মহাজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান সত্তার ব্যবস্থাপনায় কায়েম হয়েছে। এটা আকস্মিকভাবে সংঘটিত কোন ঘটনা নয় যে, তার প্রভাবে পৃথিবীর পরিমণ্ডলে আপনা থেকেই এ পন্থা–পদ্ধতি চালু হয়ে গিয়েছে এবং আপনা আপনি সমুদ্র থেকে বাষ্প উত্থিত হয়েছে, বাতাস তা বহন করে নিয়ে গিয়েছে এবং তা একত্র করে বৃষ্টির মেঘ সৃষ্টি করেছে। অতপর সে মেঘকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে পৌছে দিয়েছে এবং আপনা আপনি তা থেকে বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টিপাত হচ্ছে। কোন বিচার-বিবেচনা ও বুদ্ধি–বিবেকহীন প্রকৃতি কোন নিয়ম–নীতি ও আইন–কানুন বিহীন রাজত্বে আকস্মিকভাবে এ ব্যবস্থাটি চালু করেনি। বরং এটা একটা সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা যা একটি বিধান মোতাবেক যথারীতি চলছে। সুতরাং সূর্যের তাপে সমুদ্রের পানি থেকে বাষ্প উত্থিত হওয়ার পরিবর্তে তা জমে বরফে পরিণত হচ্ছে এমনটা কখনো দেখা যায় না। বরং সূর্যরশ্মির উত্তাপে সমুদ্রের পানি থেকে সবসময় বাষ্পই উত্থিত হয়। মৌসুমী বায়ু প্রবাহ এমন উল্টো আচরণ কখনো করে না যে, বাষ্পীভূত পানিকে স্থলভাগের দিকে বহন করে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে সমুদ্রেই তাকে নিঃশেষ করে দিল। বরং তা বাষ্পকে সবসময় ওপরে উঠিয়ে নেয়। এমনও কখনো ঘটতে দেখা যায় না যে, মেঘমালা সৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, বাতাস এসব মেঘ বহন করে শুষ্ক ভূ–ভাগের দিকে প্রবাহিত হওয়া বন্ধ করেছে এবং শুষ্ক ভূ–ভাগের ওপরে বৃষ্টিপাত একদম বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কোটি কোটি বছর থেকে একই নিয়মে এ ব্যবস্থা লাগাতার চলে আসছে। এমনটি যদি না হতো, এ পৃথিবীর বুকে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর অস্তিত্বলাভ করা ও বেঁচে থাকা সম্ভব হতো না।

এ ব্যবস্থার মধ্যে আপনি একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যমুখিতা এবং সুশৃঙ্খল বিধান কার্যকর দেখতে পাচ্ছেন। আপনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন যে, এ বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাতের সাথে পৃথিবীর মানুষ, জীবজন্তু ও উদ্ভিদরাজির জীবনের একটা অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। এ ব্যবস্থাপনা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, পানির এ সরবরাহ প্রাণীকূলকে সৃষ্টি করা ও বাঁচিয়ে রাখার জন্য ঠিক তার প্রয়োজন অনুসারে একটি নিয়ম বিধান মোতাবেক করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যমুখিতা ও নিয়মতান্ত্রিকতা শুধু এ একটি ব্যাপারে নয়, বরং সমগ্র বিশ্ব–জাহানের গোটা ব্যবস্থাপনায়ই তা দেখা যায় এবং মানুষের সমস্ত বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও অগ্রগতি এর ওপরই নির্ভরশীল। আপনি একেকটি জিনিস সম্পর্কে জেনে নেন যে, তা কি কাজে লাগে এবং কোন্ নিয়ম অনুসারে কাজ করে। তারপর যে জিনিসগুলো সম্পর্কে আপনি যতটা জানতে পারেন তা কোন্ কাজে লাগে এবং কোন্ নিয়ম–বিধি অনুসারে কাজ করে তাকে কাজে লাগানোর ততটাই নতুন নতুন পন্থা–পদ্ধতি আপনি উদ্ভাবন করতে থাকেন এবং নতুন নতুন আবিষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে নিজের তামাদ্দুন ও সভ্যতার অগ্রগতি সাধন করতে থাকেন। এ পৃথিবীর একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আছে আর এখানকার প্রতিটি জিনিসই একটি অলংঘনীয় নিয়ম–বিধান ও শৃংখলা অনুসারে কাজ করছে এ মর্মে একটি স্বতস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক ধারণা যদি আপনার মন–মস্তিষ্কে না থাকতো তাহলে আপনার মগজে কোন জিনিস সম্পর্কে এ প্রশ্ন আদৌ জাগতো না যে, তা কি উদ্দেশ্যে কাজ করছে এবং তাকে কিভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে।

এখন এ পৃথিবী এবং এর প্রতিটি জিনিস যদি উদ্দেশ্যমূলক হয়ে থাকে, যদি এ পৃথিবী এবং এর প্রতিটি জিনিসের মধ্যে একটি নিয়ম ও শৃঙ্খলা কার্যকর থেকে থাকে আর যদি তা শত শত কোটি বছর ধরে একাদিক্রমে এ উদ্দেশ্য এবং নিয়ম–বিধি ও শৃংখলা অনুসারে চলে থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রে একজন একগুঁয়ে ও হঠকারী মানুষই কেবল একথা অস্বীকার করতে পারে যে, একজন মহাজ্ঞানী, মহাকৌশলী এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা সৃষ্টি করেছেন। সে আল্লাহ সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করা নিতান্তই আহমকী যে, এ পৃথিবীকে তিনি বানাতে এবং পরিচালনা করতে পারেন ঠিকই, কিন্তু তা ধ্বংস করতে পারেন না এবং ধ্বংস করার পর ইচ্ছা করলে তা অন্য কোন আকৃতিতে পুনরায় বানাতেও পারেন না। প্রাচীনকালের অজ্ঞ নাস্তিকদের একটা বড় হাতিয়ার ছিল বস্তুর অবিনশ্বর ও অবিনাশী হওয়ার ধারণা। কিন্তু জ্ঞান–বিজ্ঞানের অগ্রগতি তাকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করেছে। এখন এটা জ্ঞানগতভাবে স্বীকৃত সত্য যে, বস্তু শক্তিতে (Energy) রূপান্তরিত হতে পারে এবং শক্তিও বস্তুতে রূপান্তরিত হতে পারে। তাই একথা সম্পূর্ণরূপে বিবেক–বুদ্ধিসম্মত যে, চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী আল্লাহ তা'আলা এ বস্তুজগতকে যতদিন পর্যন্ত কায়েম রাখবেন ততদিন পর্যন্ত তা কায়েম থাকবে। কিন্তু যখনিই তিনি একে শক্তিতে রূপান্তরিত করতে চাইবেন শুধু একটি ইংগিতেই তা করতে পারবেন। তাছাড়া এ শক্তিকে আবার অন্য একটি বস্তুর আকৃতিতে সৃষ্টি করার জন্যও তাঁর একটি ইশারাই যথেষ্ট।

এ হলো কিয়ামতের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে কথা। কোন তাত্বিক বা যৌক্তিক প্রমাণ দিয়ে এটাকে আর প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব নয়। এখন যে প্রশ্নটি থেকে যায় তাহলো, কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হওয়া দরকার যাতে মানুষকে তার ভাল কাজের পুরস্কার এবং মন্দ কাজের শাস্তি দেয়া যায়। যে ব্যক্তি মানুষের নৈতিক দায় দায়িত্ব স্বীকার করে এবং

একথাও স্বীকার করে যে, উত্তম কাজের পুরস্কার লাভ এবং অপরাধের শাস্তি ভোগ এ নৈতিক দায় দায়িত্বের অনিবার্য দাবী সে ব্যক্তির পক্ষে আখেরাতের অনিবার্যতা মেনে নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। পৃথিবীতে এমন কোন সমাজ বা রাষ্ট্র ব্যবস্থা নেই যা প্রতিটি অপরাধ ও দুষ্কর্মের শাস্তি এবং প্রতিটি ভাল কাজের পুরস্কার দিতে পারে। অপরাধীর জন্য তার বিবেকের দংশন ও তিরস্কার এবং উপকার ও সুকৃতিকারীর জন্য তার মনের তৃপ্তি ও হৃদয়ের প্রশান্তি যথোপযুক্ত শাস্তি বা পুরস্কার, একথা বলা একটি নিরর্থক দর্শন কপচানো ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রশ্ন হলো, যে ব্যক্তি কোন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করার পর কোন দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে তাকে তিরস্কার করার জন্য তার বিবেক এত সময় কোথায় পেল? আর সত্য ও ন্যায়ের জন্য লড়াই করতে গিয়ে অকস্মাত একটি বোমার আঘাতে যার গোটা দেহ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল সে যে একটি মহত উদ্দেশ্যের জন্য নিজের জীবন কুরবানী করলো তার বিবেক এ তৃপ্তি ও প্রশান্তিলাভের সুযোগ পেল কখন? আসল কথা হলো, আখেরাত বিশ্বাসকে এড়িয়ে চলার জন্য যত বাহানা ও ছল চাতুরীর আশ্রয় নেয়া হয় তা সবই অর্থহীন। মানুষের বিবেক–বুদ্ধি ও স্বভাব-প্রকৃতি ইনসাফ কামনা করে। কিন্তু দুনিয়ার এ জীবনে ইনসাফ পাওয়া তাও আবার যথাযথ এবং পূর্ণাঙ্গরূপে কখনো সম্ভব নয়। এরূপ ইনসাফ হলে তা আখেরাতেই হওয়া সম্ভব এবং সমস্ত জ্ঞানের আধার ও সবকিছু সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবহিত আল্লাহ্ আ'আলার নির্দেশ ও ব্যবস্থাপনায়ই সম্ভব। আখেরাতের প্রয়োজনকে অস্বীকার করা প্রকৃতপক্ষে ন্যায় ও ইনসাফের প্রয়োজনকে অস্বীকার করারই নামান্তর।

জ্ঞান ও যুক্তি–বুদ্ধি মানুষকে এতদূর পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে যে, আখেরাত সম্ভব এবং তা হওয়া উচিত। কিন্তু তা অবশ্যই সংঘটিত হবে এ জ্ঞান কেবল অহীর মাধ্যমেই লাভ করা যেতে পারে। আর অহী একথা বলে দিয়েছে যে, "যে বিষয়ের প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হচ্ছে তা অবশ্যই সংঘটিত হবে।" যৌক্তিক প্রমাণের মাধ্যমে আমরা এ জ্ঞানের নাগাল পেতে পারি না। তবে তা সত্য ও ন্যায়ানুগ হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস আমরা এভাবে লাভ করতে পারি যে, অহী আমাদের যে বিষয়ের খবর দিচ্ছে তা হওয়া যেমন সম্ভব, তেমনি বাঞ্ছনীয়ও বটে।